কাজাখ লোককাহিনী

কাজাখ লোককাহিনী

কাজাখ লোককাহিনী

কাজাখ লোককাহিনী

'রাদ্‌গা' প্রকাশন
তাশখন্দ

সূচী

অপূর্ব বাগান

মাকুন্দ ভাঁড় আলদার কোসের মজার কীর্তিকাণ্ড

অপূর্ব বাগান

অপূর্ব বাগান

কোনো এক সময়ে দুই বন্ধু ছিল — আসান আর হাসেন, তারা দু'জনেই খুব গরীব। আসানের ছিল ছোট্ট এক টুকরো চাষের জমি আর হাসেনের ছিল সামান্য কয়েকটি ভেড়া। দুই বন্ধুরই বহুদিন হল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। আছে কেবল আসানের এক সুন্দরী স্নেহময়ী কন্যা — তার সান্ত্বনা, আর হাসেনের শক্তিমান আর বাধ্য ছেলে — তার ভরসা।

এক বসন্তে আসান মাঠে যাবার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত ওদিকে হাসেনের চরম বিপদ দেখা দিল: মড়কে বেচারার সব ভেড়াগুলোই মারা পড়ল।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে হাসেন বন্ধুর কাছে এসে বলল:

'তোর কাছে বিদায় নিতে এলুম রে আসান। ভেড়াগুলো আমার মরে গেল, খিদের জ্বালায় মরা ছাড়া আমার আর গতি নেই।'

একথা শুনে আসান বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল:

'বন্ধু রে, আমার হৃদয়ের অর্ধেকটা যখন তোমার অধিকারে তখন আমার চাষের জমির অর্ধেকটা নিতে অরাজী হয়ো না। শান্ত হও, কোদাল হাতে নিয়ে কাজে নেমে পড় গান গাইতে গাইতে।'

এইভাবে হাসেনও চাষের কাজ আরম্ভ করল।

দিন যায়, রাত যায়, মাস কেটে, বছর পার হয়। একদিন নিজের জমিতে কোদাল চালাতে চালাতে হাসেন কোদালের কাছ থেকে কেমন এক ঢং করে আওয়াজ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি করে সে মাটি খুঁড়তে লাগল, একটু খোঁড়ার পরেই দেখতে পেল সোনার মোহরভর্তি একটা পুরান ধাতুর পাত্র।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাসেন পাত্রটা নিয়ে বন্ধুর কুটীরের দিকে দৌড় দিল। যেতে যেতেই চীৎকার করতে লাগল:

'আসান, আনন্দ কর, এবার তুই সুখের মুখ দেখলি! তোর জমি খুঁড়ে সোনার মোহরভর্তি এই পাত্রটা পেয়েছি আমি। এবার তোর অভাব ঘুচে গেল চিরদিনের জন্য।'

আসান মিষ্টি হেসে তাকে উত্তর দিল:

'তুই যে নিস্বার্থ তা আমি ভাল করেই জানি, হাসেন, কিন্তু এ সোনা হল তোর, আমার নয়। তোর নিজের জমি খুঁড়ে তুই পেয়েছিস।'

'আমি তোর মহত্ত্বদয়ের কথা জানি,' প্রতিবাদ করল হাসেন। 'জমিটা তুই আমায় দান করেছিস কিন্তু জমির নীচে যা লুকান আছে তা দিস নি আমাকে।'

আসান বলল, 'ওরে ভাই! যে জন মাটিতে ঘাম ঝরায় মাটির সমস্ত সম্পত্তিতেই তার অধিকার।'

অনেকক্ষণ ধরে তর্কাতর্কি চলতে লাগল তাদের মধ্যে এবং কেউই মোহরগুলি নিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। শেষে আসান বলল:

'আচ্ছা, ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। তোমার ছেলে আর আমার মেয়ে দু'জনেরই বিয়ের বয়স হয়েছে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। আমরা ওদের বিয়ে দিয়ে এই সোনা ওদের দিয়ে দিই। আমাদের সন্তানরা অভাব ভুলে যাক।'

তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে তাদের ছেলেমেয়েরা তো খুবই খুশি হল। তখুনি তাদের বিয়ের উৎসব আরম্ভ করে দেওয়া হল। অনেক রাতে শেষ হল বিয়ের ভোজউৎসব।

পরের দিন সবে ভোর হয়েছে, নবদম্পতি হাতে সেই সোনাভরা পাত্রটি নিয়ে হাজির হল আসান-হাসেনের কাছে।

'কি হল, বাছারা?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল আসান-হাসেন, 'এত সকালে ঘুম ভাঙল কেন?'

'আমরা আপনাদের বলতে এলাম,' জানাল নবদম্পতি, 'যে যা আমাদের পিতারা নিতে অস্বীকার করেছেন, তা আমাদেরও নেওয়া উচিত নয়। এ সোনা নিয়ে কি হবে আমাদের? আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর যে কোন সম্পদের চেয়েও মূল্যবান।'

বলে তারা পাত্রটি রেখে দিল ঘরের মাঝখানে।

তখন আবার তর্ক আরম্ভ হল, কি হবে ধনসম্পত্তি নিয়ে, তারপরে তারা ঠিক করল চারজনে মিলে পরামর্শ করতে যাবে এক জ্ঞানী মওলবীর সঙ্গে, যাঁর ন্যায়, সততার কথা বহুপরিচিত।

অনেকদিন ধরে পথ চলে তারা এসে পেঁছিল ঐ জ্ঞানীর তাঁবুতে। খোলা শুকনো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটামাত্র তাঁবু, কালো জরাজীর্ণ অবস্থা।

তারা অনুমতি নিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মওলবী বসেছিলেন একটা পুরনো ছেঁড়া কম্বলের টুকরোর ওপর। তাঁর কাছেই দুদিকে দু'জন করে তার চারজন শিষ্য বসে আছে।

'আমার কাছে আসার কারণ কি গো, ভালমানুষের ছেলেরা?' আগন্তুকদের জিজ্ঞাসা করলেন মওলবী।

তারা বলল তাদের বিতর্কের কথা। তাদের কথা সব শুনে মওলবী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

'তোমার ওপর যদি এই সমস্যার সমাধানের ভার দেওয়া হত তাহলে তুমি কি করতে?'

শিষ্যটি উত্তর দিল:

'আমি হুকুম দিতাম ঐ সোনা বাদশাহকে দিয়ে আসতে কারণ দেশের যত ধনসম্পত্তির মালিক তো তিনিই।'

ভুরু কোঁচকালেন মওলবী, দ্বিতীয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তুমি আমার জায়গায় হলে কি সিদ্ধান্ত নিতে?'

দ্বিতীয় শিষ্য উত্তর দিল:

'আমি নিজেই ঐ সোনা নিয়ে নিতাম কারণ যখন বাদী-প্রতিবাদী দু'জনেই কোন কিছু নিতে অস্বীকার করে, তখন তা আইন অনুযায়ী বিচারকেরই প্রাপ্য হয়।'

মওলবীর ভুরু আরো বেশী কুঁচকে গেল, কিন্তু তেমনি ধীরভাবেই তিনি তৃতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন:

'তুমি কেমন করে এই সমস্যার সমাধান করতে বল?'

তৃতীয় শিষ্য বলল:

'এ সোনা যখন কারুরই নয় আর কেউই তা নিতে চাচ্ছে না তখন সে সোনা আবার মাটিতে পুঁতে ফেলতে আদেশ দিতাম।'

মওলবীর মুখ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আর তোমার কি বলার আছে, বাছা?'

'গুরু,' কনিষ্ঠ শিষ্যটি বলল, 'দোষ নেবেন না, আমার মূর্খতা মাফ করে দেবেন, কিন্তু আমার মন যা ঠিক করেছে তা হল এই: আমি ঐ ধন দিয়ে এই শূন্য খাঁ খাঁ স্তেপে বিরাট ছায়াভরা বাগান তৈরী করতাম যাতে সমস্ত গরীব দুঃখীরা ক্লান্ত হয়ে সেখানে বিশ্রাম করতে পারে, তার গাছের ফল খেয়ে তৃপ্ত হতে পারে।'

এবারে মওলবী উঠে এসে চোখভরা জল নিয়ে ছেলেটিকে আলিঙ্গন করলেন:

' 'যুবক যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তাকে বৃদ্ধের মতই সম্মান কর।' একথা যারা বলে ঠিকই বলে। তোমার বিচারই ঠিক, বাছা। ঐ সোনা নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দাও তুমি, সব থেকে ভাল জাতের বীজ কিনে ফিরে এস, যে বাগানের কথা বললে, তা বসাও। গরীব দুঃখীদের মনে তোমার আর এই মহৎহৃদয় মানুষদের, এত ধন দেখেও যাদের মন টলে নি, তাদের স্মৃতি চিরজীবী হোক।'

তরুণ শিষ্যটি তক্ষুণি সেই মোহরগুলি চামড়ার থলিতে ভরে নিয়ে, পথে রওনা দিল।

অনেক পথ চলার পরে শেষ পর্যন্ত সে এসে পেঁছিল রাজধানীতে। শহরে পা দিয়ে প্রথমেই সে চলল বাজারের দিকে। বাজারে ফলের বীজের ব্যবসায়ীর খোঁজে ঘুরতে লাগল।

অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আর উজ্জ্বল রংয়ের কাপড়চোপড় সাজিয়ে বসা দোকানগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে অর্ধেকটা দিন অমনি অমনিই কেটে গেল। হঠাৎ পিছন দিক থেকে শোনা গেল ঘুন্টির আওয়াজ আর কার যেন তীক্ষ্ম চীৎকার। দেখা গেল বাজারের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত বোঝা বয়ে নিয়ে আসছে এক ক্যারাভান — মালের বদলে উটের পিঠে বোঝাই করা

হাজার হাজার বিভিন্ন ধরণের জীবন্ত পাখী, পাহাড়ে, বনে, স্তেপে, মরুভূমিতে যত রকমের পাখী দেখা যায়। তাদের পাগুলো বাঁধা আর আলুথালু হয়ে যাওয়া পাখনাগুলো ছট-ফট করছে; ক্যারাভানের ওপরে বিভিন্ন রংয়ের পালকের মেঘ পাক খাচ্ছে। ক্যারাভানের এগোনর তালে তালে পাখীগুলোর মাথা ঠুকে যাচ্ছে উটের পিঠে আর তাদের হাঁ করা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে করুণ চীৎকার। তরুণটির হৃদয় মায়ায় ভরে গেল। কৌতূহলী লোকেদের ভীড় ঠেলে সে ক্যারাভান-সর্দারের কাছে এগিয়ে এসে সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'হুজুর, এমন চমৎকার পাখীগুলির এমন শাস্তিবিধান কে করেছে? আর এগুলোকে নিয়ে আপনি কোথায়ই বা যাচ্ছেন?'

ক্যারাভান-সর্দার উত্তর দিল:

'আমরা খানের প্রাসাদে যাচ্ছি। এই পাখীগুলিকে খানের জন্য রান্না করা হবে। এর বদলে আমরা পাব পাঁচশ মোহর।'

'আমি যদি তোমাকে এর দ্বিগুণ সোনা দিই, তবে তুমি পাখীগুলোকে মুক্তি দেবে?' জিজ্ঞাসা করল তরুণটি।

ক্যারাভান-সর্দার শ্লেষভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলল।

তখন তরুণটি কাঁধ থেকে থলিটা নামিয়ে ক্যারাভান-সর্দারের সামনে খুলে ধরল। ক্যারাভান-সর্দার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থেকে গেল, তারপর যখন বুঝতে পারল যে কতটা দাম পেতে যাচ্ছে, তক্ষুনি ভৃত্যদের হুকুম দিল পাখীগুলোর বাঁধন খুলে দিতে।

ছাড়া পেয়ে পাখীগুলি সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে গেল, তারা সংখ্যায় এত যে দিনের আলো সেই মুহূর্তে ঢেকে গেল আর তাদের পাখার আন্দোলনে পৃথিবীতে ঝড় বয়ে গেল।

দূরে মিলিয়ে যেতে থাকা পাখীগুলির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তরুণটি, তারপর যখন তারা চোখের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তখন মাটি থেকে খালি থলিটা তুলে নিয়ে ফিরে চলল। মনটা আনন্দে ভরে গেছে, সহজ পা ফেলে চলতে লাগল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল গানের কলি।

কিন্তু যতই সে এগোতে লাগল বাড়ীর দিকে ততই তিক্ত ভাবনা তাকে চেপে ধরতে লাগল, অনুশোচনায় তত বেশী করে ভরে যেতে লাগল তার মন।

'নিজের ইচ্ছা মত পরের ধন ব্যয় করার অধিকার আমাকে কে দিল? আমি নিজেই তো গরীব দুঃখীদের জন্য বাগান প্রতিষ্ঠার কথা বললাম। কি বলব আমি এখন গুরুকে আর ঐ সরলহৃদয় মানুষগুলিকে যারা বীজ নিয়ে আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে?' নিজেকে অভিযুক্ত করতে লাগল সে। এইসব ভাবতে ভাবতে এমন হতাশায় ভরে গেল তার মন যে সে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল আর নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগল। কেঁদে কেঁদে সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে তার চোখদুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সে স্বপ্ন দেখল যেন কোথা থেকে একটা চমৎকার উজ্জ্বল রংয়ের পাখী উড়ে এসে বসল তার বুকের ওপর আর অপূর্ব গলায় গান গেয়ে উঠল:

'ও সহৃদয় যুবক! নিজের দুঃখ ভুলে যাও! মুক্তিপাওয়া পাখীরা তোমাকে সোনা ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু তোমার এই উপকারের প্রতিদান তারা অন্যভাবে দেবে। চোখ খোল দেরী কোরো না, ওঠ!..'

তরুণটি চোখ খুলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল: চোখের সামনে বিস্তৃত গোটা স্তেপটা ছেয়ে গেছে বিভিন্ন ধরণের পাখীতে।

পাখীগুলি নখ দিয়ে আঁচড়ে মাটিতে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে, ঠোঁটে করে বীজ এনে এনে তার মধ্যে ফেলছে, তারপর চটপট পাখা ঝাপটে মাটি সমান করে দিচ্ছে।

তরুণ যেই একটু নড়ল অমনি সব পাখীগুলি উড়ে চলে গেল আকাশে, আবার অন্ধকার হয়ে গেল দিনটা আর তাদের পাখার ঝাপটায় পৃথিবীতে ঝড় উঠল... যখন সবকিছু আবার শান্ত হয়ে গেল, পাখীদের খোঁড়া প্রতিটি গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল সবুজ সবুজ চারা গাছ, বেড়ে উঠতে উঠতে সেগুলি অনেক ডালপালাসমেত এক একটি বিরাট গাছে পরিণত হয়ে উঠতে লাগল, তাদের পাতাগুলি চকচকে, সোনালী ফল।

স্বয়ং ভারতের বাদশাহেরও এমন প্রাচুর্যভরা বিশাল বাগান নেই। অগুন্তি বিশাল বিশাল আপেল গাছ, তাদের ছাল যেন অম্বরে ঢাকা। আপেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে রসাল আঙুরের লতা, খুবানী ফলের গাছ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আলোভরা মাঠ যেখানে গজিয়েছে চমৎকার ঘাস আর বিভিন্ন রংয়ের ফুল। চারদিকে নালাগুলি বেয়ে ঠাণ্ডা জল বইছে কলকল করে, নালাগুলির মধ্যে বিছানো রয়েছে দামী দামী পাথর। তরুণটির স্বপ্নে দেখা সেই সুন্দর, সুকণ্ঠী পাখীটির মতই অনেক অনেক পাখী গাছের ডালে ডালে ওড়াউড়ি করছে আর কিচির-মিচির করছে।

বিস্মিত তরুণটি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, বাগানটা যে সত্যি সত্যিই দেখছে সে, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এটা সত্যি না স্বপ্ন তা পরখ করার জন্য জোরে চীৎকার করে উঠল সে, বহুবার প্রতিধ্বনি তোলা নিজের গলা শুনতে পেল। দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল না। তখন সে উত্তেজিত, আনন্দিত মনে চলল গুরুর তাঁবুর উদ্দেশ্যে।

শীঘ্রই এই বাগানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকায়। প্রথমেই সেখানে এসে পেঁছিল ধনী অভিজাত জায়গীরদাররা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু তারা বনের প্রান্ত পর্যন্ত এসে পেঁছানমাত্রই তাদের সামনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল লোহার ফটক বসান বিরাট পাঁচিল, সাতটা তালা লাগান ফটকে। তখন তারা নকশাকাটা ঘোড়ার জিনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপাশের সোনার আপেলগুলো ছেঁড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের মধ্যে যেই ফল ছুঁয়েছিল, হঠাৎ নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল। তা দেখে বাকীরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে চলে গেল।

তাদের পরেই চতুর্দিক থেকে বাগানে এসে পেঁছিল গরীবদুঃখীর দল। তারা কাছে আসতেই লোহার ফটক থেকে তালাগুলো খসে পড়ল আর ফটকটা হাট হয়ে খুলে গেল।

স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশুতে ভরে গেল বাগানটা। তারা বিভিন্ন রংয়ের ফুলগুলির ওপর দিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল কিন্তু ফুলগুলির কোনই ক্ষতি হল না তাতে। নালার স্বচ্ছ জল পান করল তারা, জলটা ঘোলা হল না; গাছের থেকে ফল ছিঁড়তে লাগল কিন্তু ফলের কমতি হল না তাতে। সারাদিন ধরে বাজতে লাগল দোম্বরার* মিষ্টি সুর, খুশী মেশান কথাবার্তা আর জোরে জোরে হাসি।

যখন রাত নামল, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন আপেলগুলি থেকে ফুটে বেরোল মৃদু একটু আলো, সব পাখীরা গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল শান্ত মিষ্টি এক সুর। গাছের নীচে সুগন্ধি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে সবাই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল। সারা জীবনে এই প্রথম তারা এমন সুখী ও তৃপ্ত বোধ করল।

•

---

* দোম্বরা — বাদ্যযন্ত্র।

সুন্দরী আইসলু

এক গ্রামে তিন ভাই বাস করত। তারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী ও অসমসাহসী। সমবয়সীরা তাদের নিয়ে গর্ব করত, মেয়েরা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত মুগ্ধ চোখে আর বৃদ্ধেরা তাদের প্রশংসা করত। বাচ্চা বয়স থেকেই ভাইয়েদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব: কখনও তাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি, কখনও ঝগড়া বা তর্কও হয় নি তাদের মধ্যে।

একদিন তারা বাজপাখী নিয়ে স্তেপের মধ্যে গেল শিকারের উদ্দেশ্যে।

বহুক্ষণ ধরে তাদের চোখে কোন জন্তু বা পাখী পড়ল না। তারা ঘোড়া ফিরিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল মাটিতে দেহটা প্রায় মিলিয়ে ছুটে গেল একটা শেয়াল, আগুনের মত লাল। ওর চমৎকার চামড়ার জন্য ভাল দাম পাওয়া যাবে। বড় ভাই বাজপাখীটাকে উড়িয়ে দিল, পাখীটা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশে উড়ে গেল, তারপর উঁচু থেকে বিদ্যুৎগতিতে নেমে এল শেয়ালটার ওপরে।

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ভাইয়েরা এসে পেঁছিল যেখানে পাখীটা নেমেছে, কিন্তু অবাক কাণ্ড। শেয়ালটা নেই, যেন কোন শেয়াল দেখাই যায় নি সেখানে, আর পাখীটা বসে আছে একটা পাথরের ফলকের ওপর, ফলকটাও যেমন তেমন ফলক নয়, কার দক্ষ ছেনীর আঘাতে তার ওপর ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য। ফলকটির প্রান্তে অলঙ্করণ করে লেখা আছে: 'যে আমার এই প্রতিকৃতিটা খুঁজে পেয়ে আমায় এনে দিতে পারবে আমি তার আজ্ঞাধীনা হব ও তাকে আমার স্বামী বলে মেনে নেব।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিন ভাই সেই রহস্যময় ফলকটির সামনে; ফলক থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি যেন জীবন্ত। তার প্রতি ভালবাসার আগুন জ্বলে উঠল তাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে।

বড় ভাই বলল:

'এবার কি হবে, কি করা উচিত আমাদের? এই অদ্ভুত পাথরটা খুঁজে পেয়েছি আমরা তিনজনে মিলে।'

মেজ ভাই বলল:

'ঘুঁটি ফেলে দেখা যাক: ভাগ্যই নির্দ্ধারণ করবে আমাদের মধ্যে কে সুন্দরীর খোঁজে যাবে।'

ছোট ভাই বলল:

'ভাইয়েরা, আমরা সবাই মিলে পাথরটা পেয়েছি, আমরা সবাই মিলেই সুন্দরীর খোঁজে যাই, যদি আমাদের এমন ভাগ্য হয় যে আমরা চোখে দেখব তাকে তবে আমাদের তিনজনের মধ্য থেকে সে নিজেই তার পছন্দমত স্বামী বেছে নেবে।'

তাই ঠিক হল। পাথরটা তুলে নিল তারা, আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার: পাথরটার নীচে চামড়ার থলিতে রাখা আছে তিন হাজার আগেকার দিনের মোহর। মোহরগুলি সমান ভাগে ভাগ করে নিল তারা। গ্রামে আর না ফিরেই সুন্দরীর খোঁজে রওয়ানা দিল তারা।

গোটা স্তেপ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াল তারা, ঘোড়ার সাজ, জিন ছিঁড়েকুটে গেল, কিন্তু পাথরের ওপরে ক্ষোদিত সেই মেয়েটির খোঁজ পেল না। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত তারা এসে উপস্থিত হল রাজধানীতে। রাজধানীর প্রান্তে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হল তাদের। ভাইয়েরা তাকে পাথরটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে জানে কিনা পাথরে ক্ষোদিত ঐ সুন্দরীকে, কোথায় থাকে সে।

'জানব না আবার,' বলল মহিলাটি, 'এ তো আমাদের খানের মেয়ে। ওর নাম আইসলু। ওর মত রূপগুনের অধিকারী আর কোনো মেয়ে নেই পৃথিবীতে।'

এত পথ পেরিয়ে আসার কষ্ট, ক্লান্তি সব ভুলে গিয়ে ভাইয়েরা তখুনি রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা দিল। পাথরের ফলকের ওপর লেখাটা পড়ে প্রহরীরা শাহজাদীর কক্ষে তাদের প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

জীবন্ত আইসলুকে দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল: চাঁদের নামে তার নাম* কিন্তু সূর্যের মতই উজ্জ্বল সে।

'কে আপনারা ?' আইসলু জিজ্ঞাসা করল। 'কি প্রয়োজনে আমার কাছে আগমন ?'

বড় ভাই সবায়ের হয়ে উত্তর দিল:

'স্তেপের মধ্যে শিকার খুঁজতে খুঁজতে তোমার প্রতিকৃতিসমেত এই পাথরটা আমরা পাই, আর আধখানা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে অবশেষে এটাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। এবার প্রতিশ্রুতি পূরণ কর, আইসলু ! আমাদের মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ করে নাও স্বামী হিসাবে।'

সুন্দরী আইসলু দামী গালিচা থেকে উঠে ভাইদের কাছে এসে বলল:

'হে বীর যুবকরা, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিচ্ছি না। যদি আপনারা সবাই সমান হন আমার চোখে তাহলে কি করে ন্যায়বিচার করব আমি ! কি করে জানব কে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ? আপনাদের ভালবাসার একটা পরীক্ষা নিতে চাই। এক মাসের মধ্যে যে আমাকে সব

* কাজাখ ভাষায় 'আই' মানে চাঁদ আর 'সলু' মানে সুন্দরী।

থেকে অসাধারণ উপহার এনে দিতে পারবে তারই স্ত্রী হব আমি। এই শর্তে রাজী আপনারা ?'

ভাইয়েরা নত হয়ে তাকে বিদায় জানিয়ে আবার তখুনি রওনা দিল, তারা লক্ষ্যও করল না যে শাহজাদী ইতিমধ্যেই ভাইদের মধ্যে সব থেকে ছোটজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। সে ভালবাসা এত গভীর যে সেই সময় থেকেই সে মলিন, শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল যেন এক কঠিন অসুখে পড়েছে , কিছুদিনের মধ্যেই সে বিছানা নিল, এমন কি নিজের বাবাকেও চিনতে পারল না। সারা দুনিয়া থেকে হাকিম-বদ্যি ডেকে পাঠাল খান, যে তার মেয়েকে সারিয়ে তুলবে তাকে হাজারটা উট দেবার কথা ঘোষণা করল। জাদুকর, বদ্যিতে ভর্তি হয়ে গেল রাজপ্রাসাদ কিন্তু খানের সুন্দরী কন্যার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে লাগল।

ঐ সময় তিন ভাই রাজধানীর থেকে অনেক দূরে পেঁাছে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে তারা চলল এক পথ ধরেই, তারপর পথটা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে, ভাইয়েরাও বিভিন্ন পথে রওনা হল, ঠিক হল ত্রিশ দিন বাদে আবার সেই জায়গায় এসে মিলিত হবে তারা।

বড় ভাই ডান দিকে গেল, কিছু পথ চলার পরে এসে পেঁাছল এক বড় শহরে। সব দোকান ঘুরে ঘুরে সে এক জায়গায় দেখতে পেল অপূর্ব সোনার ফ্রেমে বাঁধান একটি চমৎকার আয়না।

'কত দাম এই আয়নাটার ?'

'আয়নাটার দাম একশো মোহর, আর ওর গোপন রহস্যের দাম পাঁচশো মোহর।'

'কি সে গোপন রহস্য ?'

'এই আয়নাটা এমন যে ভোরের আলো ফোটার সময় যদি তাকাও এই আয়নাটার দিকে তো দেখতে পাবে সারা পৃথিবী, পৃথিবীর সমস্ত শহর গ্রাম কুটীর।'

'এমন একটা জিনিসই আমার প্রয়োজন!' ভাবল ছেলেটি। কোন চিন্তাভাবনা না করেই সে দাম মিটিয়ে দিয়ে আয়নাটা বুকের কাছে লুকিয়ে রাখল পোশাকের মধ্যে, তারপর ফিরে চলল সেখানে যেখানে তাদের দেখা হওয়ার কথা।

ওদিকে মেজ ভাই চলল সোজা মাঝখানের পথটা ধরে। সেও এক সময়ে অজানা এক শহরে এসে পেঁাছাল। বাজারে যেখানে বিদেশী সওদাগররা পসরা সাজিয়ে বসেছিল সেখানে তার চোখে পড়ল অপূর্ব কারুকাজ করা একটি গালিচা।

'কত দাম গালিচাটার ?' জিজ্ঞাসা করল সে বিক্রেতাকে।

'গালিচাটার দাম পাঁচশ মোহর আর এর রহস্যের দাম আরও পাঁচশ মোহর।'

'কোন গোপন রহস্যের কথা তুমি বলছ ?'

'এ হল উড়েচলা গালিচা! এক মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে এ গালিচা।'

ছেলেটি ব্যবসায়ীকে সঙ্গের সমস্ত টাকা দিয়ে দিল আর গালিচাটা গোল করে মুড়ে নিয়ে ফিরে চলল মনে বেশ অহঙ্কারের ভাব নিয়ে।

সবার ছোট ভাই চলল বাঁদিকে। চলতে চলতে সে এসে পেঁাছল এক অজানা শহরে।

দোকান পাটগর্নলি ঘ্ররে ঘ্ররে সে প্রিয়তমাকে উপহার দেবার উপযর্ক্ত কিছর্ই তেমন খ্ঁজে পেল না। একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল সে। হঠাৎ এক কদাকার ব্র্ড়োর দোকানে সে কি যেন একটা উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পেল।

'ওটা কি ?' জিজ্ঞাসা করল সে।

দোকানী তার হাতে দিল দামী দামী পাথর বসান এক সোনার চির্নী। ছেলেটির চোখ চকচক করে উঠল।

'কত চাও চির্নীটার জন্য ?'

দোকানী ঘড়ঘড় করে হাসল, তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বলল:

'ভেগে পড় এখান থেকে! এমন একটা জিনিস কেনার ক্ষমতা আছে নাকি তোমার! চির্নীটার দাম হাজার মোহর আর এর রহস্যের দাম দ্'হাজার মোহর।'

'চির্নীটার রহস্যটা কি ? কি জন্য তুমি এত দাম চাইছ ?'

ব্র্ড়ো বলল:

'যদি এই চির্নী দিয়ে অস্র্স্থ মান্র্ষের চুল আঁচড়ে দাও তো সে স্র্স্থ হয়ে উঠবে, আর যদি ম্ত লোকের চুল আঁচড়ে দাও তো সে বেঁচে উঠবে।'

'আমার আছে মাত্র এক হাজার মোহর,' বিষণ্ণভাবে বলল ছেলেটি, 'দয়া কর আমায়, এতেই বিক্রী করে দাও আমায় চির্নীটা: এই চির্নীটাই আমার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবে।'

'ঠিক আছে,' ঠোঁট বেঁকিয়ে হিংস্রভাবে বিড় বিড় করে বলল ব্র্ড়ো, 'হাজার মোহরের বদলে চির্নীটা দেব তোমায় যদি ফাউ হিসাবে নিজের দেহের থেকে এক টুকরো মাংস কেটে দাও।'

ছেলেটি ব্র্ঝল যে লোকটি মোটেও ব্যবসায়ী নয়, হিংস্র নরখাদক কিন্তু সে একটুও ভয় পেল না, পিছিয়ে গেল না। কোন কথা না বলে পকেট থেকে সব মোহরগ্র্লো ঢেলে দিল, তারপর ছ্র্রি দিয়ে ব্র্কের থেকে এক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে ভয়ঙ্কর লোকটিকে দাম মিটিয়ে দিল। চির্নীটা তার হয়ে গেল।

ঠিক ত্রিশ দিন পরে তিন ভাই আবার এসে মিলিত হল সেই জায়গায় যেখানে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ভাইয়েরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করল আর যে যা কিনেছে দেখাল।

'কোন জিনিসটা আইসল্র্র বেশী পছন্দ হবে ?' ভাবল প্রত্যেকেই, 'আয়না, গালিচা, চির্নী — সবকটা জিনিসই ভাল।'

গল্প করে কেটে গেল রাতটা, ভোর বেলায় যখন শ্র্কতারা দেখা দিল আকাশে, প্র্বের আকাশ লাল হয়ে উঠল, ভাইয়েদের মনে হল কি হচ্ছে প্থিবীতে দেখে।

সারা প্থিবী ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে, আইসল্র্ যেখানে আছে ভেসে উঠল সেই প্রাসাদও। কিন্তু এ কি ? প্রাসাদের সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য, সবার ম্র্খ বিষণ্ণ, কাকে যেন কবর দেওয়া হচ্ছে। দামী একটা তাব্র্তে করে বার করে আনা হল ম্তব্যক্তিটিকে, তার

পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল খান স্বয়ং, মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে নুয়ে পড়েছে। ভাইয়েরা বুঝতে পারল আইসলু মারা গেছে।

তক্ষুনি মেজ ভাই গালিচাটা বিছিয়ে দিল, তিন ভাই পরস্পরের হাত ধরে তার ওপর দাঁড়াল। গালিচাটা উড়ে গেল মেঘের মধ্যে, পরমুহূর্তে এসে নামল আইসলুর কাছে। ভীড়ের লোকেরা এক পাশে সরে গেল। খান হঠাৎ আকাশ থেকে উড়ে আসা তিনজন যুবকের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে, কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারল না। আর ছোট ভাই মৃত শাহজাদীর কাছে ছুটে গিয়ে তার চুলটা আঁচড়ে দিল সোনার চিরুনী দিয়ে।

নিঃশ্বাস নিল আইসলু, একটু কেঁপে উঠে দাঁড়াল, আগের মতই সুন্দর, আগের চেয়ে আরো বেশী সুন্দর। খান মেয়েকে বুকে চেপে ধরল। আনন্দে সবাই চীৎকার করে উঠল। হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে সবাই ফিরে চলল প্রাসাদের দিকে।

সেই দিনই খান এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে তাতে রাজধানীর সব বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানালেন। বাজারে বাজারে জঞ্জাল ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে বেড়ান এক বুড়োও আমন্ত্রিত হয়েছিল সেই ভোজে। সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসেছিল তিন ভাই; তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসছিল স্বয়ং আইসলু। ভাইয়েরা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তাদের মধ্যে কাকে সে স্বামীত্বে বরণ করে নেবে।

অন্ধকার হয়ে গেল আইসলুর মুখ, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'আমি ভালবাসি একজনকে, কিন্তু পরীক্ষার পরেও তোমরা তিনজনই আমার কাছে সমানই রয়ে গেছ, কারণ তোমরা তিনজনই অবাক করে দেওয়া উপহার এনেছ।'

তারপর সে বাবার পরামর্শ চাইল। একটু চিন্তা করে খান বলল:

'যে আয়নাটা বড় ভাই এনেছে সেটা ছাড়া তোমরা জানতেই পারতে না আইসলুর মৃত্যুর কথা; মেজ ভাইয়ের কেনা গালিচা ছাড়া তোমরা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতে পারতে না। আর ছোট ভাইয়ের আনা চিরুনীটা ছাড়া তোমরা আমার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতে না। আমি তোমাদের আধখানা রাজ্য দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কার হাতে আইসলুকে তুলে দেওয়া উচিত তা বুঝতে পারছি না।'

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে শোনা গেল সেই ভিখারী বুড়োর গলা।

'মহারাজ, একটা কথা বলার অনুমতি দিন।'

সে দিন খুশীতে খানের মনটা খুব উদার হয়ে গিয়েছিল।

'বল,' অনুমতি দিল সে।

'সবকিছু বিবেচনা করে আমি হলে এমনি বিচার করতাম,' বলল বুড়ো, 'যে সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে উপহার কিনেছে আইসলু তারই হোক।'

খান সম্মতি জানালেন:

'তাই হোক।'

'আমি আয়নাটার জন্য ছ'শ মোহর দিয়েছি,' বলল বড় ভাই।

'আমি গালিচাটার জন্য দিয়েছি হাজার মোহর,' মেজ ভাই বলল।

'আমিও চিরুনীর জন্য দিয়েছি হাজার মোহর আর...' হঠাৎ চুপ করে মাথা নামিয়ে নিল ছোট ভাই।

'চুপ করলে কেন!' চীৎকার করে উঠল খান। 'বল সত্যি করে।'

তখন ছেলেটি বুকের পোশাক সরিয়ে দিল, সবাই দেখল তার বুকে একটা বিরাট ক্ষতস্থান হাঁ হয়ে আছে।

আইসলু চীৎকার করে উঠে হাতে মুখ ঢাকল। আর খান সেই বীরকে আলিঙ্গন করে বলল:

'আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। তুমি আমার জামাতা ও উত্তরাধিকারী হও।'

তারপর অতিথিদের দিকে ফিরে সবাইকে শুনিয়ে বলল যে বড় দুই ভাইকে উজীর করা হবে আর সেই বুড়ো যে যথার্থ উপদেশ দিয়েছে তাকে কাজী করা হবে।

এরপর ভোজসভা আবার পূর্ণ হয়ে গেল হর্ষধ্বনিতে। ত্রিশ দিন ধরে চলল সেই ভোজসভা আরও চল্লিশ দিন ধরে বিদায় জানান হল ভোজসভাকে আর সেই ভোজসভার স্মৃতি আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে।
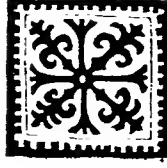
সুলেমান খান ও বাইগিজ পাখী

সুলেমানের প্রাসাদ ছিল ধনরত্নে পূর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে সব থেকে বেশী মূল্য দিত খান একটা সোনার আংটিকে, সেটাকে কখনই সে খুলত না হাত থেকে। সেটা ছিল একটা জাদু-আংটি: যে সেটাকে পরত সেই গাছপালা জীবজন্তুর ভাষা বুঝতে আরম্ভ করত আর তাদের ওপর প্রভুত্ব অর্জন করত।

একবার শিকারে বেরিয়ে সুলেমান ঠাণ্ডা জলে মুখচোখ ধুয়ে নেবার জন্য নদীর কাছে গেল। অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিতে যাবার সময়ে জাদু-আংটিটা খুলে পড়ে গেল হাত থেকে, ডুবে যেতে লাগল জলে। সুলেমান জলে ঝাঁপ দিতে যাবে রত্নটা উদ্ধারের জন্য, হঠাৎ জলে দেখা দিল একটা বিশাল মাছ, মাছটা আংটিটা গিলে ফেলে লেজ নাড়িয়ে জলের গভীরে ডুব দিল।

ঐ আংটিটার কথা ভাবতে ভাবতে সুলেমান গভীর বিষণ্ণ মনে চলতে লাগল নদীর ধার বরাবর। অনেকক্ষণ চলার পর দেখতে পেল একটা কুটীর, কুটীরের কাছে মাছ ধরার জাল শুকোচ্ছে।

রাত নামছে ক্রমশ। খান ঢুকল কুটীরে। দোরগোড়া পেরিয়ে সে কার যেন নাকীসুরে কথা শুনতে পেল:

'ভাল কিসমৎ আজ! পেটভরে খাওয়া যাবে!'

খানের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে — কুটীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রক্তপিপাসু জালমাউজ-কেম্পীর ডাইনী আর তার দিকে বাড়িয়েছে লম্বা লম্বা নখওয়ালা হাতগুলি। খান বাঁচবার জন্য হাতে তুলে নিল শিকারের ছোরাটা, এমন সময় শোনা গেল আর একটা মিষ্টি গলা, যেন বুলবুলি গান গেয়ে উঠল:

'এই আগন্তুকটিকে কিছু কোরো না, মা! দেখছ না ও কেমন সুন্দর ও আভিজাত্যময়। স্বয়ং সুলেমান খানও এর থেকে বেশী সুন্দর নন।'

খান ফিরে তাকাল সেই কণ্ঠের অধিকারিনীর দিকে আর তার হৃদয় যেন কেঁপে উঠল,

আগুন জ্বলে উঠল: চুলার কাছে রঙচঙা গালিচার ওপর এমন অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে বসে আছে যে তার জন্য মরতে কেউই ভয় পাবে না।

জালমাউজ-কেম্পীর ডাইনী বলল:

'বেঁচে গেছিস যে আমার মেয়ে বুলুকের চোখে পড়েছিস। তোকে ছেড়ে দেব আমি। কিন্তু শীগগির পালা এখান থেকে। এখুনি বুড়ো ফিরবে। তখন তোকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

সুলেমান বলল:

'যদি সুন্দরী বুলুকও আমার সঙ্গে না যায় তবে আমি এক পা'ও নড়ব না।'

এমন সময় নদীর জল ফেঁপে উঠল, মাটি গুরগুর করে উঠল, কুটীরটা দুলে উঠল। যেন দারুণ ঝড় উঠেছে। জালমাউজ-কেম্পীর ডাইনী ঘরময় ছুটোছুটি করে, তারপর সিন্দুক খুলে চীৎকার করে বলল সুলেমানকে:

'ওরে পাগল, ঢুকে পড় এই সিন্দুকের মধ্যে। দেরী করিস না।'

সিন্দুকের ঢাকাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ো নরখাদক — দিয়াউ এসে ঢুকল কুটীরে।

'মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।' গমগম করে বলল সে।

স্ত্রী তাকে বকাবকি আরম্ভ করে দিল:

'মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেছে বুড়োর। কাল যে মানুষটা খেয়েছি আমরা, সেটারই গন্ধ বেরোচ্ছে। এখন আমাদের এখানে কেউই আসে নি।'

রাত কাটল। ভোরবেলায় দিয়াউ নদীতে গেল মাছ ধরতে, একটু পরেই ফিরে এল অনেক মাছ ধরে নিয়ে।

'এ দিয়ে সকালের খাবার তৈরী কর,' মেয়েকে আর বউকে বলল সে। 'আমি আবার শিকারে বেরোচ্ছি। হয়ত দুপুরের খাবার জন্য একটা মানুষ বা ঘোড়া ধরতে পারব।'

চলে গেল সে। জালমাউজ-কেম্পীর ডাইনী সুলেমানকে সিন্দুক থেকে বের করে পিঠে ধাক্কা দিতে দিতে দরজার দিকে নিয়ে চলল:

'দূর হয়ে যা, চোখের সামনে থেকে। ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয়েছে আমায় তোর জন্য।'

সুলেমান কিন্তু একটুও নড়ল না জায়গা ছেড়ে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুন্দরী বুলুকের দিকে।

বাবার আদেশ অনুযায়ী মেয়েটি ওদিকে মাছ কাটতে বসেছে। বড় মাছটা কাটতেই বিস্মিত চীৎকার শোনা গেল মেয়েটির, মাছটির পেট থেকে সে বের করে আনল একটি সোনার আংটি। আংটিটা তার হাত ফসকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে এল সুলেমানের পায়ের কাছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে হাতে পরল। এক মুহূর্তে সে আবার আগের মতই শক্তিশালী আর জ্ঞানী হয়ে উঠল।

'আমি — সুলেমান খান।' খুশীমনে বলল সে। 'বুলুক, তুমি কি আমার স্ত্রী, পৃথিবীর অধিকর্ত্রী হতে চাও?'

বুলবুক রাণী হল এইভাবে। এখন সে ঘুমোয় রেশমী বালিশে মাথা রেখে, খায় সোনা-রূপোর থালা-বাটীতে, জরি-মখমলের পোশাক পরে।

খান তার কোনকিছুর অভাবই রাখে নি — রাজসংক্রান্ত কাজকর্ম সব ভুলে গিয়ে কেবল ভাবত আরো কিভাবে খুশী করা যায় স্ত্রীকে।

এক দিন খান তাকে বলল:

'তুমি যদি চাও বুলবুক, আমি তোমার জন্য সোনা আর হীরের প্রাসাদ তৈরী করে দেব।'

'সোনা, হীরের তৈরী প্রাসাদ আমার চাই না,' আদুরে সুরে চোখ নাচাতে নাচাতে বলল বুলবুক, 'যদি তুমি আমায় ভালবাস, মালিক, তো আমার জন্য একটা পাখীর হাড়ের প্রাসাদ বানিয়ে দাও।'

সর্বশক্তিমান সুলেমান হাঁক দিল যেন পৃথিবীর সব পাখী অবিলম্বে তার কাছে এসে হাজির হয় এবং ধীরভাবে মৃত্যুদণ্ড মেনে নেয়।

বেচারী পাখীগুলো উড়ে এলো সুলেমানের প্রাসাদে, গান গাইছে না তারা, কিচির মিচির করছে না, ধীর স্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল মৃত্যুর: সেই জাদু-আংটিটির এমনই ক্ষমতা।

বুলবুক পাখীগুলোকে গুণে হতাশ সুরে খানকে বলল:

'একটা পাখী তোমার কথা শোনে নি, শাহানশাহ্, তোমার আদেশমত এখানে হাজির হয় নি। তার নাম — বাইগিজ।'

প্রচণ্ড রাগ হল সুলেমানের। দাঁড়কাককে আদেশ দিল বেইমান বাইগিজকে খুঁজে বার করে আনতে।

তিন দিন ধরে উড়ে উড়েও দাঁড়কাক পেল না তাকে খুঁজে। তখন খান দ্রুতগতি চিলকে পাঠাল তার খোঁজে।

চিলটা বাইগিজকে খুঁজে পেল পাহাড়ে এক পাথরের নীচে। পাথরের নীচে এমন সেঁধিয়ে গেছে বাইগিজ, যে না ঠোঁট দিয়ে না থাবা দিয়ে ধরা যায় সেটাকে।

চিলটা বলল:

'ওহে বাইগিজ, কি করছ ?'

'ভাবছি।'

'কি ? কি বললে ? শুনতে পেলাম না।'

বাইগিজ যেই মাথাটা বার করেছে পাথরের নীচ থেকে চিলটা তাকে নখ দিয়ে খপ করে ধরে ফেলে খানের কাছে নিয়ে এল।

বাইগিজ গান গাইতে লাগল:

এ কি হল। প্রাণ যে যায়
শত্রুর ধারাল নখের ছোঁয়ায়।

চিলটা বাইগিজকে সুলেমানের পায়ের কাছে ফেলে দিল, বাইগিজ কিন্তু গান থামাল না:

মাথাটা আমার আঙুলের মতই
পালকের নীচে আমি যেন ছোট্ট চড়াই,
রক্ত আমার, মাংস আমার সামান্যই অতি
তাতে চিলেরও হবে না ক্ষুধা নিবৃত্তি।

সুলেমান হুঙ্কার ছেড়ে মাটিতে পা ঠুকে বলল:

'বাইগিজ! তুই একবার ডাক শুনেই এলি না কেন?'

'আমি ভাবছিলাম।' বলল বাইগিজ।

'কি ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম, পৃথিবীতে কোনটা বেশী — পাহাড় না সমতল ভূমি।'

'কি সিদ্ধান্ত করলি?'

'ছুঁচো মাটি খুঁড়ে তুলে তুলে যে ঢিপিগুলো তৈরী করে সেগুলোকে যদি গোণা হয় তাহলে পাহাড়ই বেশী হবে।'

'আর কি ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম আমি — মৃত না জীবিতের সংখ্যা বেশী।'

'কাদের সংখ্যা বেশী তোর মতে?'

'ঘুমন্ত মানুষদের যদি মৃতদের দলে ফেলা হয় তাহলে মৃতদের সংখ্যাই বেশী।'

'আর কি ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম পুরুষমানুষ না স্ত্রীলোক বেশী।'

'কারা বেশী?'

'স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অনেক বেশী হবে শাহানশাহ, যদি স্ত্রীলোকের দলে ফেলা হয় সেই সব দুর্বল চরিত্রের পুরুষমানুষদের যারা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে স্ত্রীলোকের যে কোন মনোবাসনা পূরণ করতে প্রস্তুত।'

যখন বাইগিজ একথা বলল সুলেমান লজ্জায় লাল হয়ে চোখে হাতচাপা দিল: ছোট্ট পাখীর কথার ইঙ্গিত বুঝল খান। তক্ষুনি সে তার আদেশাধীন পাখীদের মুক্তি দিয়ে দিল আর পাখীগুলি আনন্দে গান গাইতে গাইতে আর কিচির মিচির করতে করতে যে যার পথে উড়ে চলে গেল।

পাখীর হাড় দিয়ে প্রাসাদ তৈরী করা হল না শেষ পর্যন্ত। চতুর পাখী বাইগিজ পাখীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল, এজন্য তারা বাইগিজকে চিরকালের জন্য তাদের বিচারক নির্বাচন করল।

কিনে নেওয়া স্বপ্ন

সারসেমবাই ছিল অনাথ, মা-বাবা কেউ নেই। কষ্টে দিন কাটে তার। জমিদারের কাছে কাজ নিল সে ভেড়া চরাবার। জমিদার তার কাজের বদলে একটি খোঁড়া ভেড়া তাকে দেবে শরৎকালে এই প্রতিশ্রুতি দিল। তাতেই খুশী মেষপালকটি। ভেড়ার পাল চরায়, জমিদারের উচ্ছিষ্ট খায় আর শরৎকালের অপেক্ষা করে।

'শরৎকাল আসবে,' ভাবতে থাকে সে, 'খোঁড়া ভেড়াটা পাব, তখন আমিও জানব মাংসের স্বাদ কেমন...'

একবার সারসেমবাই নতুন একটা জায়গায় চরাতে নিয়ে এল ভেড়ার পাল, হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে নেকড়ে বেরিয়ে এসে বলল:

'একটা ভেড়া দে। যদি না দিস তবে জোর করে নিয়ে নেব দশটা!'

'ওরে নেকড়ে, কেমন করে তোকে ভেড়া দিই বল্ তো? ভেড়ার পাল তো আর আমার নয়। ভেড়া কমে গেছে দেখলে জমিদার মেরে ফেলবে আমায়।'

নেকড়ে একটু চিন্তা করে বলল:

'ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার। যা মালিকের কাছে গিয়ে একটা ভেড়া চেয়ে আন আমার জন্য।'

সারসেমবাই মালিকের কাছে গিয়ে সব বলল। জমিদার ভেবে দেখল দশটা একটার বেশী, দশটার থেকে একটার দাম কম। সারসেমবাইকে সে বলল:

'নেকড়ে একটা ভেড়া নিক। কিন্তু কোন বাছাবাছি চলবে না। রুমাল দিয়ে ওর চোখ বেঁধে দিবি। যেটাকে ধরবে সেটাই ওর।'

জমিদার যা বলল সারসেমবাই ঠিক তাই করল।

চোখ বাঁধা অবস্থায় নেকড়ে পালের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ভেড়ার গলা কামড়ে ধরল। যেখানে যত দুঃখ দুর্দশা সব গরীবেরই কপালে জোটে। ধরবি তো ধর, নেকড়ে সেই

খোঁড়া ভেড়াটাকেই ধরল যেটা মালিক সারসেমবাইকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মনের দুঃখে কান্না আরম্ভ করে দিল সারসেমবাই। নেকড়ের মায়া হল তার কান্না দেখে।

'কি আর করবি।' বলল নেকড়ে। 'তোর ভাগ্যটাই দেখছি এমনি। ভেড়ার চামড়াটা তোকে দিয়ে দেব। হয়ত লাভজনক দামে কাউকে বিক্রী করে দিতে পারবি।'

মাটি থেকে ভেড়ার চামড়াটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলল সারসেমবাই ভেড়ার পাল নিয়ে।

উল্টো দিক থেকে দেখা গেল জমিদার আসছে লাল ঘোড়ায় চড়ে। রেকাবে পা দিয়ে উ'চু হয়ে দাঁড়িয়ে ভেড়াগুলোকে গুণল জমিদার। দেখে — গোটা পালটাই অক্ষত আছে, নেই কেবল সারসেমবাইয়ের খোঁড়া ভেড়াটা। এমন সময় দেখা গেল সারসেমবাইকে। হাতে লাঠি নিয়ে আসছে ভেড়ার পালের পেছনে, কাঁধে ভেড়ার চামড়া, জল গড়িয়ে পড়ছে চোখ বেয়ে।

হাসিতে ফেটে পড়ল জমিদার এমন জোরে যে তার ঘোড়াটাও কে'পে উঠল।

'দেখ্ কেমন রাখাল তুই! নিজের ভেড়াটাকেই বাঁচাতে পারলি না। আমার ভেড়াগুলোকেও তুই এমনি করে খোয়াবি... দূর হয়ে যা! তোর পাওনা মিটেই গেছে।'

চলল সারসেমবাই মাঠঘাট পেরিয়ে যেদিকে তার লাঠির ছায়া পথনির্দেশ করে সেদিকেই।

চলতে চলতে অনেক দূরের এক শহরে এসে পে'ছাল সে। সেখানের বাজারে গিয়ে ঢুকল। ভীড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু কেউ তাকে ভেড়ার চামড়ার দাম জিজ্ঞাসা করল না। প্রায় সন্ধ্যার সময় ছেলেটি মাত্র তিন পয়সায় চামড়াটা বিক্রী করে দিল একজন লোককে।

'এই পয়সা দিয়ে তিনটে রুটি কেনা যাবে। তিনদিন চলে যাবে তিনটে রুটিতে। তারপর যা হয় হবে!..'

রুটীর দোকানের দিকে যাবার পথে দেখে এক অসুস্থ বুড়ো ভিক্ষা করছে। সারসেমবাই তাকে একটা পয়সা দিল। বুড়ো প্রথমে ঘাড় নাড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর নীচু হয়ে রাস্তা থেকে একমুঠো বালি তুলে নিয়ে ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল:

'নে, তোর দয়ালুমনের জন্য এই পুরস্কার।'

সারসেমবাই ভাবল বুড়োর মাথার গোলমাল আছে, কিন্তু বুড়োকে মনে আঘাত দেবে না বলে বালিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল। রাত নামল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। অনাথ রাখাল ছেলেটি কোথায় রাত কাটাবে? এক সরাইখানায় গিয়ে রাতের জন্য আশ্রয় চাইল সে। সরাইখানার মালিক তাকে থাকতে দিল কিন্তু দাম চাইল তার জন্য, আর একটা পয়সা দিয়ে দিতে হল সরাইখানার মালিককে।

সরাইখানার অতিথিদের সবাইকে মালিক শুতে দিল কম্বলে, গালিচায় আর সারসেমবাইকে বলল মাটিতে শুয়ে পড়তে। খালি পেটে, ঠাণ্ডা, শক্ত মাটিতে শোওয়ায় ভাল করে ঘুম হল না তার, আজেবাজে স্বপ্ন দেখল।

ভোরবেলায় জেগে উঠল সরাইখানা. উঠোনে লোকেরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে।

পরদেশী সওদাগরেরা রওনা দেবে বলে উটের পিঠে মাল বোঝাই করতে করতে গল্প করতে লাগল।

একজন বলল:

'কাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। যেন আমি রাজা, শুয়ে আছি দামী বিছানায়, আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে উজ্জ্বল সূর্য, আর আমার বুকের ওপর খেলা করছে চাঁদের উজ্জ্বল এক ফালি...'

সারসেমবাই সওদাগরের কাছে এগিয়ে এসে বলল:

'সারা জীবনে আমি একটাও ভাল স্বপ্ন দেখি নি। এই স্বপ্নটা আমাকে বিক্রী করে দিন। ওটা আমার হোক।'

'স্বপ্ন বিক্রী?' হা হা করে হেসে উঠল সওদাগর। 'আচ্ছা, তুই কি দাম দিবি তার জন্য?'

'আমার কেবল একটাই পয়সা আছে... এই যে।'

'দে পয়সাটা!' বলল সওদাগর, 'ব্যাস। স্বপ্নটা দিয়ে দিলাম তোকে রে ছেলে!'

বলে আরো জোরে হেসে উঠল সওদাগর, তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত অন্য সবাইও হেসে উঠল। রাখাল ছেলেটি ওদিকে এমন একটা স্বপ্ন কিনতে পেরে আনন্দে ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে...

তারপর সারসেমবাই অনেক পথ চলল। অনেক গ্রাম পড়ল পথে। কিন্তু কোন খানেই তার না জুটল কোন কাজ, না জুটল আশ্রয়, না একগেলাস পানীয়।

শীতকাল। রাতের অন্ধকারে স্তেপের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সারসেমবাই, ফুঁ দিয়ে দিয়ে জমে যাওয়া আঙুলগুলো গরম করে। দুরন্ত হাওয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে এদিক ওদিক নিয়ে যায়, তুষার-ঝড় তাকে নিয়ে ঘুরপাক খায়। কাঁদে সারসেমবাই, তার চোখের জল গালেতেই জমে যায়। একেবারে দুর্বল হয়ে সে একটা বরফের চিপির ওপর বসে পড়ল আর হতাশায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

'এমন কষ্ট পাওয়ার চাইতে নেকড়ের হাতে মরাও ভাল ছিল!'

সে এই কথা বলামাত্রই অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা দিল এক বিরাট নেকড়ে: গায়ের লোম খাড়া, চোখ জ্বলছে!

'শিকার পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত,' আনন্দে চীৎকার করে উঠল নেকড়ে, 'বাচ্চাগুলো খুশী হবে।'

'আমায় মেরে ফেল নেকড়ে,' আস্তে করে বলল ছেলেটি, 'তোমার বাচ্চাদের খুশী কর। আমার মরাই ভাল...'

নেকড়েটা কিন্তু একটুও নড়ল না. ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বলল:

'সারসেমবাই তুমি নাকি? তুমিই তো আমাকে দিয়েছিলে খোঁড়া ভেড়াটা। আমি চিনেছি তোমায়। ভয় পেও না. আমি তোমাকে কিছু করব না। হয়ত আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। বোসো দেখি আমার পিঠে, ধরে থাকো শক্ত করে!'

সারসেমবাই বসল তার পিঠে আর নেকড়ে ছুটতে লাগল তুষার স্তূপের মধ্য দিয়ে। এক নিবিড় বনের প্রান্তে এসে বলল:

'দেখছ সারসেমবাই, ঐ যে দূরে আগুন জ্বলছে। ওখানে দস্যুদল বিশ্রাম নিতে থেমেছিল। এখন তারা আবার অনেকদূরে চলে গেছে, ফিরতে দেরী আছে... যাও, আগুনে শরীরটা গরম করে নাও। আর ভোরবেলায় হয়ত শীতটা কমে যাবে... বিদায়!'

চলে গেল নেকড়ে, সারসেমবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল আগুনের দিকে। আগুনে শরীরটা গরম হল তার, এমনকি দস্যুদের খাওয়া মাংসের হাড়গুলো চুষে চুষে একটুখানি খিদেও মিটল তার। এত খুশী হল সে যে আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হল তার। অল্পতেই তো খুশী বেচারা!..

ভোরের আলো ফুটতে লাগল। আগুনটা ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে নিভে গেল। ছেলেটি হাত গরম করার জন্য উষ্ণ ছাইয়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। আঃ কি আরাম! আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে লাগল সে হাতটা, হঠাৎ শক্তমতন কি একটা ঠেকল তার হাতে। সেটাকে ছাই থেকে বার করে এনে সারসেমবাই বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল... সোনার কৌটা! বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল ছেলেটির... কৌটার মধ্যে কি আছে?..

ঢাকাটা খুলল সারসেমবাই। এমন সময় সূর্য উঠল আর তার প্রথম রশ্মি এসে পড়ল কৌটার ওপর। সারসেমবাই অস্ফুট চীৎকার করে উঠল, চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ঔজ্জ্বল্যে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল — কৌটাটা হীরায় ভর্তি!..

কৌটাটা বুকের কাছে চেপে ধরে ছেলেটি দৌড় দিল বনের মধ্য দিয়ে, আনন্দে মাটিতে পা পড়ছে না।

'এখন কেবল তাড়াতাড়ি লোকবসতির কাছে পেঁছাতে পারলে হয়!' ভাবল সে, 'এবার আর দুঃখকষ্ট বলতে কিছু থাকবে না আমার... এ ধনে একশো'জন লোকেরও সুখ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।'

এদিকে বন কিন্তু ক্রমশ গভীর হচ্ছে। ভয় ধরে গেল সারসেমবাইয়ের, কেন যে বনের এত গভীরে চলে এল, মনে হল তার।

'জনহীন বনের মধ্যে এই ধন দিয়ে কি হবে আমার?'

এসময় হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলক দেখা গেল আর ছেলেটি এসে পড়ল বড় খোলা মাঠে। মাঠের মাঝখানে নদীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা তাঁবু, তাঁবুটা সাদা চাদরে ঢাকা।

'কে থাকে এখানে? আমার মত হতভাগ্য, দুঃখীকে তাড়িয়ে দেবে না তো?' ভাবল সারসেমবাই।

একটা বুড়ো গাছের কোটরে সারসেমবাই সোনার কৌটাটা লুকিয়ে রেখে তারপর তাঁবুতে ঢুকল।

'সালাম!' বলল সে।

তাঁবুর ভিতরে চুলা জ্বলছে আর সেই চুলার সামনে উবু হয়ে বসে একটি মেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। অপরিচিত ছেলেটিকে দেখে সে লাফিয়ে উঠে চোখে বিস্ময় আর আতংক নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'কে তুমি, কি করে এখানে এলে ?' জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি অবশেষে।

সারসেমবাই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না তার। এমন সুন্দরী মেয়ে সে আগে কখনও দেখে নি, কেবল কবি আর গায়কদের গানেই শোনা যায় এমন সুন্দরীর কথা। কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর মনে কোন গভীর দুঃখ আছে, তাই চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ আর মুখ তুষারের থেকে সাদা।

'আমি অনাথ সারসেমবাই। একটু আশ্রয়, কাজ আর খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' বলল সারসেমবাই। 'ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি কে ?'

মেয়েটি তার কাছে একটু এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন কাঁপা স্বরে বলল:

'আমার নাম আলতিন-কিজ, আমার মত দুঃখী মেয়ে আর কেউ নেই পৃথিবীতে। আমার কথা শুনে তোমার কোন লাভ নেই, সারসেমবাই, তোমার ভীষণ বিপদ... পালাও, যত তাড়াতাড়ি পার পালাও এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে, যদি পথ খুঁজে পাও। তোমার দুর্ভাগ্য তোমায় কোথায় নিয়ে এসেছে জান ? এ হল ডাইনী জালমাউজ-কেম্পিরের তাঁবু। শীগগিরি ডাইনী ফিরে আসবে। তখন তোমার দফারফা... পালাও, এখনও সময় আছে !..'

এমন সময় দরজার বাইরে শোনা গেল আওয়াজ, মড়মড়, দুপদুপ। মেয়েটার মুখচোখ আরো বিষণ্ণ হয়ে গেল।

'এসে পড়েছে !' আতঙ্কিতভাবে বলে মেয়েটি সারসেমবাইয়ের হাত ধরে টেনে চুলার থেকে বেশ দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে চাদর চাপা দিয়ে দিল।

সারসেমবাই লুকিয়ে পড়ল, কিন্তু ছোট্ট একটা গর্ত দিয়ে সব দেখতে লাগল তাঁবুতে কি হচ্ছে না হচ্ছে।

দরজাটা খুলে গেল আর হুড়মুড় করে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল লাল ঠোঁট ভয়ঙ্কর চেহারার জালমাউজ-কেম্পির। হুকের মত বাঁকা নাক, জটাপড়া চুল, নেকড়ের মত ধারাল দাঁত। তাঁবুর চারদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, তারপর চুলার কাছে বসে পড়ে কালো হাড়বারকরা আঙুলগুলো আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিল। খানিকক্ষণ সেইভাবেই বসে রইল আর টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, আলতিন-কিজ ওদিকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে।

শরীরটা একটু গরম হলে পর জালমাউজ-কেম্পির ঘড়ঘড় করে বলল:

'আলতিন-কিজ, আমার কাছে আয় দেখি।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একপা এগিয়ে মেয়েটি থেমে গেল আর বুড়ীটা তাকে আঁকশির মত আঙুল দিয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নিল।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল আলতিন-কিজ। সারসেমবাইয়ের মুঠি শক্ত হয়ে গেল, বুড়ীর

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাবল, কিন্তু ঠিক তখনি বুড়ী রাগে হিসহিস করতে করতে মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল:

'নিষ্কর্মার ধাড়ী! ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন তুই?! জানিস না নাকি কি জন্যে তোকে আমার এই তাঁবুতে এনে রেখেছি? অনেক দিন আগেই তোকে খেয়ে ফেলা উচিত ছিল আমার, আমি এদিকে কেবল দিন পিছোচ্ছি আর অপেক্ষায় আছি কবে তোর বুদ্ধি হবে, একটু মাংস গজিয়ে নিবি গায়ে। শোন্ রে, মনে রাখিস যদি কালও এসে দেখি এইরকমই রোগা রয়ে গেছিস তো এই আগুনেই তোকে জীবন্ত ভেজে খাব!'

তারপর বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল। আর আলতিন-কিজ আগুনের কাছে বসে সারারাত ধরে কাঁদল।

সকালবেলায় জালমাউজ-কেম্পির মেয়েটিকে আবার হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

সারসেমবাই চাদরের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে বলল:

'আলতিন-কিজ, কেমন করে তুমি এই রক্তচোষা বুড়ীর হাতে পড়লে সে সবকথা বল।'

আলতিন-কিজ বলতে আরম্ভ করল:

'বাবা-মার সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলাম আমরা আমাদের গ্রামে। একবার বাবা-মা আত্মীয়-বাড়ি গেলেন। যাবার সময় বাবা আমায় বললেন, 'আলতিন-কিজ, তুমি একা রইলে। সাবধানে থেকো, নিজে দরজার বাইরে বেরিও না আর কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিও না।' তাঁবুর ভেতরে বসে থেকে বিরক্তি ধরে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। বন্ধুরা ছুটে এল আমায় দেখে, স্তেপে ফুল কুড়াতে যাচ্ছে ওরা, ডাকল আমায়। গেলাম বোকার মত। ফুল ছিঁড়ছি, দেখি লাঠিতে ভর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে থুরথুরে এক বুড়ী। 'আঃ কেমন চমৎকার মেয়ে! কি সুন্দর মেয়ে!' বলল বুড়ী, 'কত দূরে তোমার বাড়ী গো, মেয়ে?' 'এই তো কাছেই থাকি। এই তো আমাদের তাঁবু.' 'আমাকে তোমাদের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে একটু জল খেতে দাও।' খারাপ কিছু মনে আসে নি আমার। বুড়ীকে সঙ্গে করে গ্রামে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালাম। বুড়ী কিন্তু তারপরেও চলে যেতে চাচ্ছে না তাঁবু ছেড়ে, লক্ষ্য করছে আমাকে। 'কি সুন্দর মেয়ে। চমৎকার মেয়ে! আয় আমি তোর মাথাটা আঁচড়ে দিই!' আমি বুড়ীর হাঁটুতে মাথা রাখলাম, আর সে সোনার চিরুনী বার করে আমার মাথা আঁচড়ে দিতে লাগল। হঠাৎ আমার এমন ঘুম পেয়ে গেল! চোখ বুজে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, চোখ মেলে দেখি এই তাঁবুতে শুয়ে আছি। কত দিন কাটল। সেই থেকে আমি এই জালমাউজ-কেম্পির ছাড়া আর কাউকেই দেখি নি। প্রতিদিনই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।'

বলা শেষ হয়ে আলতিন-কিজ আবার জলভরা চোখে সারসেমবাইকে অনুরোধ করতে লাগল যতক্ষণ জালমাউজ-কেম্পির বাইরে আছে, সেই ফাঁকে পালিয়ে যেতে।

কিন্তু মেয়েটির কথায় সারসেমবাই কেবল মৃদু হাসল, তারপর তাকে ভগ্নীস্নেহে আলিঙ্গন করে বলল:

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, আলতিন-কিজ। আমরা একসঙ্গে যাব...'

'তোমার কথা শুনে ভারি ভাল লাগছে, সারসেমবাই,' বলল আলতিন-কিজ, 'কিন্তু তুমি যা বলছ তা কোনদিনই হবার নয়। ডাইনীটা পথেই আমাদের ধরবে, যদি না ধরে তাহলেও আমরা পথে ঠাণ্ডায় জমে যাব।'

'আমরা বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপর পালাব...'

আলতিন-কিজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'যারা সাহসী প্রায়ই তারা যুক্তি দিয়ে কোন কিছু বিচার করে দেখে না,' বলল সে। 'তুমি ভুলে গেছ যে আজ ডাইনীটা আমায় মেরে ফেলবে।'

'না, আলতিন-কিজ, তুমি মরবে না!' উত্তেজিতভাবে বলল সারসেমবাই। 'আমি ভেবে রেখেছি। জালমাউজ — চালাক, কিন্তু আমরা ওকে বোকা বানাব। তাঁবুর ভেতরে অন্ধকার, আজ তোমার বদলে আমি তোমার পোশাক পরে বেরোব ওর সামনে!... আমি তোমার চেয়ে লম্বা, একটু মোটাও... হয়ত আমরা এভাবে ঠকাতে পারব বুড়ীকে আর শীতকালটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সময় পাব হাতে...'

আলতিন-কিজ অবাক হয়ে গালে হাত দিল, বলতে লাগল সারসেমবাই যে এভাবে নিজেকে বলি দেবে তার জন্য তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। কিন্তু ছেলেটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

'যদি আলতিন-কিজ, তুমি জেদাজেদি করবে তাহলে আমি আজকেই ডাইনীর সঙ্গে লড়তে নামব আর তোমার অনেক আগেই ওর পেটে যাব।'

তখন মেনে নিল মেয়েটি। তারা পোশাক বদলাবদলি করে নিল। আলতিন-কিজ চাদরের নীচে লুকিয়ে পড়ল আর সারসেমবাই আগুনের কাছে তার জায়গায় বসে রইল।

এমন সময় দরজার বাইরে শোনা গেল ধুমধাম, মড়মড় আওয়াজ, হুড়মুড় করে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকল লাল মুখ ভয়ঙ্কর ডাইনী। আগুনে হাত গরম করে নিয়ে ঘড়ঘড় করে বলল:

'আলতিন-কিজ, এদিকে আয়!'

সারসেমবাই নির্ভয়ে এগিয়ে গেল বুড়ীর দিকে। বুড়ী তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে বিড়-বিড় করে বলল:

'একদিনেই কেমন যেন বেড়ে উঠেছিস মনে হচ্ছে।'

তার চোখে প্রতারণা ধরা পড়ল না, সে সারসেমবাইয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে, চিমটি কেটে হি হি করে হেসে বলল:

'ওঃ তুই শয়তান মেয়ে! অনেকদিনই আমি বুঝেছি তুই আমায় ঠকাচ্ছিস। ভাল করে যেই একটু হুমকি দিয়েছি, অমনি দেখছি চেহারা বদলে গেছে!... বেশ তাহলে আর কিছুদিন বেঁচে থাক, গতরে আরো একটু লাগুক...'

আরো বেশ কিছু দিন কাটল আলতিন-কিজ আর সারসেমবাইয়ের, উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় ভরা বেশ কিছু দিন।

তারপর বসন্তকাল এল, নদীতে জল ছলছলিয়ে উঠল, পাখীর কিচমিচ শোনা গেল, ফুল ফুটে উঠল।

সারসেমবাই তার সঙ্গিনীকে বলল:

'আলতিন-কিজ, এবার আমাদের পালাবার উদ্যোগ করতে হয়। ডাইনীবুড়ীর রাগ আগের থেকে আরো বেড়েছে দেখি, আমাদের পরিকল্পনার কথা কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি? যদি বুড়ী আমার কথা জানতে পারে, তো আমাদের দু'জনকেই মরতে হবে। তীরধনুক তৈরী করে আমি শিকারে যাব, কিছু পশুপাখী শিকার করে আনব যাতে আমাদের পথে খাবারের সংস্থান থাকে, তিন দিন বাদে চুপি চুপি ফিরে আসব, তারপর আমরা পালিয়ে যাব।'

'যা ভাল বোঝ কর সারসেমবাই,' বলল মেয়েটি চোখভরা জল নিয়ে, 'সব সময় সতর্ক থেকো, সুস্থ, অক্ষত অবস্থায় ফিরে এস।'

'কেঁদো না আলতিন-কিজ, আমার জন্য দুঃখ কোরো না,' বলল সারসেমবাই, 'আর যখন খুব মন খারাপ লাগবে নদীর কাছে গিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকবে: যদি জলে ভেসে আসে হাঁসের পালক তার মানে আমি বেঁচে আছি, সুস্থ আছি, দূর থেকে তোমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

বিদায় নিল তারা পরস্পরের কাছ থেকে। খানিকক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এল আলতিন-কিজ, ডাইনীবুড়ী যদি হঠাৎ ফিরে আসে ফাকা তাঁবুতে।

সারসেমবাই ওদিকে নদীর ধার বরাবর চলতে থাকল।

প্রথম দিন সে তিনটে বুনো হাঁস মারল, তাদের পালকগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সে জলে ভাসিয়ে দিতে লাগল। দ্বিতীয় দিনে আরো তিনটে হাঁস মেরে তাদের পালকগুলোও জলে ভাসিয়ে দিল।

তৃতীয় দিনে সারসেমবাই দেখে: বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এক হরিণশিশু দাঁড়িয়ে আছে আর তার ওপরে একপাল কাক চীৎকার করছে আর ওড়াউড়ি করছে। হরিণশিশুটির চোখ ঠুকরে দিতে চাইছে। মায়া হল তার হরিণশিশুটির জন্য, কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিল সে।

একটা বুড়ো হরিণ ছুটে এল সেদিকে:

'ধন্যবাদ, সারসেমবাই! তোমার এই উপকারের প্রতিদান দেব।'

আবার চলতে লাগল সারসেমবাই। শুনতে পেল এক করুণ ব্যা-ব্যা ডাক। দেখে একটা ছোট্ট মেষশাবক গর্তে পড়ে গেছে, চীৎকার করছে, কিছুতেই উঠে আসতে পারছে না। মায়া হল ছেলেটির, টেনে তুলল তাকে গর্ত থেকে। ছুটে এল বুড়ো পাহাড়ী মেষ, বলল:

'ধন্যবাদ, সারসেমবাই, তোমার এই উপকারের প্রতিদান দেব।'

আবার চলতে লাগল সারসেমবাই। চিঁ চিঁ শব্দ আসছে কোথা থেকে?.. দেখে একটা ঈগলপাখীর ছানা পড়ে গেছে বাসা থেকে, এখনও পালকও গজায় নি বাচ্চাটির দেহে। পাখীটার জন্যও মায়া হল তার, সেটিকে তুলে নিয়ে বাসার মধ্যে বসিয়ে দিল ছেলেটি।

বুড়ো ঈগলপাখী উড়ে এল, বলল:

'ধন্যবাদ, সারসেমবাই, তোমার এই উপকারের প্রতিদান দেব।'

এই দিনটিতে সারসেমবাই কিছুই শিকার করতে পারে নি। এদিকে সন্ধ্যা নামে নামে। তার মনে পড়ল সকাল থেকে একটা হাঁসের পালকও সে জলে ভাসায় নি। বুকটা ব্যথা করে উঠল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বেচারী আলতিন-কিজ এখন কি ভাববে? কোনো চিন্তাভাবনা না করেই সে দৌড় লাগাল ফিরে যাবার জন্য।

ওদিকে আলতিন-কিজ তার অপেক্ষায় আছে বিষণ্ণ মনে। যেই জালমাউজ-কেম্পির বেরিয়ে যায় অমনি সে ছুটে যায় নদীর কাছে। ছলছল করে বয়ে চলেছে নদী, জলে ভেসে চলেছে হাঁসের পালক, মুখে হাসি ফোটে মেয়েটির। 'বেঁচে আছে সারসেমবাই।'

তৃতীয় দিন এল, তাদের বিচ্ছেদের শেষ দিন। আলতিন-কিজ নদীর কাছে গিয়ে একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে রইল, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা...

জল বয়ে যায় ছলছল করে কিন্তু হাঁসের পালক তো কই আসছে না ভেসে...

নদীর পাড়ে পড়ে সে মুখে হাত চাপা দিয়ে গভীর দুঃখে কাঁদতে লাগল:

'সারসেমবাই আর বেঁচে নেই। হায় রে ও জানতেও পারল না যে ও যাতে বেঁচে থাকে সুখী থাকে তার জন্য আমি হাজার বার মরতেও রাজি...'

কান্নাকাটি করতে করতে বেচারী লক্ষ্যও করে নি যে জালমাউজ-কেম্পির একেবারে কাছে এসে পড়েছে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বুড়ী তার ঘাড় ধরে ঢুকিয়ে নিয়ে এল তাঁবুতে ভাল করে তাকে সাজা দেবে বলে।

'তোর ছলনা সব ধরা পড়েছে!' গরগর করে বলল বুড়ী, 'পালিয়ে যাবি ভেবেছিস? তোকে বাঁচাবার জন্য লোক জুটেছে? তাহলে শোন্, এখান থেকে তুই কোনদিনও বেরিয়ে যেতে পারবি না, কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না কারণ তোকে আমি এবার চিবিয়ে খাব!'

হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল হাট হয়ে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সারসেমবাই। আলতিন-কিজ তার কাছে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, আর বুড়ী তাকে শক্ত করে ধরেই আছে ছেড়ে দিচ্ছে না।

'দাঁড়াও, জালমাউজ-কেম্পির!' চীৎকার করে বলল ছেলেটি, 'আলতিন-কিজকে মুক্তি দাও, ভাল মুক্তিপণ দেব তোমাকে।'

'মুক্তিপণ দিবি? আরে বাচাল। তুই ভিখারী মুক্তিপণ দিবি কোথা থেকে?'

গাছের কোটর থেকে সোনার কৌটোটা বের করে সারসেমবাই বুড়ীকে দেখিয়ে ঢাকনাটা খুলল। সেই অমূল্য সম্পদ যেই দেখল, জালমাউজ-কেম্পির অমনি লোভে হাঁউমাউ করে উঠে ছেড়ে দিল মেয়েটিকে। প্রচণ্ড লোভে হিংসা ভুলে গেল সে।

'নে, নে, নিয়ে যা মেয়েটাকে, দে আমায় মণিগুলো।'

কিন্তু সারসেমবাই অত সহজে সোনার কৌটোটা বুড়ীর হাতে তুলে দেবার পাত্র নয়।

'এই যে নে, কুড়িয়ে নে।' বলে সে হীরেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

তারার মত ঝলকাতে ঝলকাতে হীরেগুলো গড়িয়ে পড়ল। বুড়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো কোঁচড়ে ভরে নিতে লাগল, ওদিকে সারসেমবাই আলতিন-কিজের হাত ধরে দে দৌড়।

তাদের চোখে পথঘাট কিছু পড়ছে না, মাঠবন পেরিয়ে দৌড়চ্ছে, পিছনপানে ফিরে তাকাচ্ছে না ভয়ে। গাছের ডালপালায় লেগে হাতপা' কেটে, ছড়ে যাচ্ছে, গাছকাটা গুঁড়ি তাদের পথরোধ করছে। একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আলতিন-কিজ, পায়ে কাঁটা ফুটে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, দৌড়তে দৌড়তেই চুলের বেনীটা সরিয়ে দিচ্ছে, জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে।

হঠাৎ তারা শুনতে পেল পেছনে ধুমধাম মড়মড় আওয়াজ: কাঁপছে গোটা বনটা, গাছগুলো ভেঙে পড়ছে — জালমাউজ-কেম্পির ধাওয়া করেছে তাদের পিছনে।

'জোরে দৌড়তে হবে আলতিন-কিজ, এখন কেবল ভরসা আমাদের পা।' বলল সারসেমবাই।

আলতিন-কিজ বলল:

'আমি আর পারছি না, সারসেমবাই। মাথা ঘুরছে, হাঁটু ভেঙে পড়ছে। এবার তুমি একা পালাও! যতক্ষণে জালমাউজ-কেম্পির আমাকে খাবে, তুমি বেশ খানিকটা দূরে পালিয়ে যেতে পারবে...'

'কি বলছ তুমি, আলতিন-কিজ? তোমাকে আমি ফেলে যাব না কিছুতেই। তুমি এই পৃথিবীতে সবকিছুর থেকে দামী আমার কাছে।'

আবার দৌড়তে লাগল তারা। বুড়ী ওদিকে একেবারে কাছে এসে পড়েছে... তার গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গজগজ করছে, হুমকি দিচ্ছে:

'ধরবই তোদের, চিবিয়ে খাব!'

পড়ে গেল আলতিন-কিজ, হাঁফাচ্ছে, স্বর বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে:

'বিদায় সারসেমবাই... আমাকে ছেড়ে পালাও... আমার বাঁচার আর কোন উপায়ই নেই...'

কেঁদে ফেলল ছেলেটি:

'মরতেই যদি হয় তো একসঙ্গেই মরব!..'

মেয়েটিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে নিজের পিঠে বসিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে চলল।

এমন সময় হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সেই বুড়ো হরিণ। বলল:

'আমি তোমায় ভুলি নি, সারসেমবাই। আমার পিঠে বস তোমরা, আর ভাল করে গলা ধরে থাক আমার। আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না ডাইনী।'

এক মুহূর্তে বুড়ো হরিণ তাদের এক উঁচু পাহাড়ের কাছে পেঁৗছে দিয়ে বলল:

'এখানে জালমাউজ-কেম্পির খুঁজে পাবে না তোমাদের!'

পাহাড়ের পাদদেশে বসল তারা পরস্পরের গলা জড়িয়ে, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার আগেই দেখে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে হুমহাম করতে করতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে জালমাউজ-কেম্পির।

লাফিয়ে উঠল সারসেমবাই, সঙ্গিনীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাতে একটা ধারাল পাথরের টুকরো নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল লড়াই করবার জন্য।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে তার সামনে দাঁড়াল বুড়ো পাহাড়ী মেষ, বলল:

'আমি তোমায় ভুলি নি, সারসেমবাই। আমার পিঠে বস তোমরা আর আমার শিংগুলো ধরে থাক ভাল করে। আমি তোমাদের এ বিপদ থেকে বাঁচাব।'

জালমাউজ-কেম্পির যখন পাহাড়ের নীচে পৌঁছাল, ছেলেমেয়েদুটি তখন পাহাড়ের চূড়ায়। প্রচণ্ড রাগে বুড়ী পাহাড়ে দাঁত বসিয়ে কামড়াতে লাগল, নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। টলে উঠল পাহাড়টা যেন এখুনি ভেঙে পড়বে।

হঠাৎ বুড়ো ঈগলপাখীটা উড়ে এল তাদের কাছে পাহাড়ের ওপর। বলল:

'আমি তোমায় ভুলি নি, সারসেমবাই। বোসো তোমরা আমার পিঠে। তুমি আমার বাচ্চাকে বাঁচিয়েছ, আমিও তোমাদের বাঁচাব।'

লাফিয়ে উঠে বসল তারা ঈগলের পিঠে, ঈগল উড়ে গেল আকাশে আর সেই মুহূর্তেই পাহাড়টা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে, শয়তান বুড়ী জালমাউজ-কেম্পির চাপা পড়ল পাহাড়ের নীচে।

উড়ে চলল ঈগল, দিন যায়, রাত যায়। কখনও তারা মেঘের ওপরে, কখনও মেঘের নীচে। তারপর খোলা জায়গায় একটা গ্রামের কাছে নেমে এল ঈগল।

আলতিন-কিজ মাটিতে নেমে চারদিকে তাকিয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠল:

'এ যে আমাদের গ্রাম দেখছি!'

মেয়েটির চীৎকারে তার বাবা-মা বেরিয়ে ছুটে এল মেয়ের কাছে, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।

'এতদিন কোথায় ছিলি তুই, আলতিন-কিজ? কি হয়েছিল তোর, মা? কে তোকে বাঁচাল?'

মেয়ে তাদের সবকিছু বলে সারসেমবাইকে দেখিয়ে দিল:

'এই যে, এ আমাকে বাঁচিয়েছে!'

দাঁড়িয়ে আছে সারসেমবাই, লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না, ধুলোভরা, কাটাছড়া শরীর, নোংরা, ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক ঢাকা, খালি পা।' মেয়েটির বাবা-মা তার হাত ধরে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেল, তাকে পরিয়ে দিল সব থেকে ভাল পোশাক, সম্মানের আসনে বসিয়ে দিল তাকে।

'আমাদের এখানে থেকে যাও তুমি, সারসেমবাই। আমরা তোমাকে যত্ন করব যেমন করি শিশুকে, আমরা তোমায় সম্মান করব যেমন করি সাদামাথা বৃদ্ধকে।'

বছরের পর বছর যায়। সারসেমবাই আর আলতিন-কিজ সেই গ্রামে থাকতে লাগল, শ্রম-বিশ্রাম, সুখ-দুঃখ সব তারা সমানভাবে ভাগ করে নেয়। সারসেমবাইয়ের মত বীর ও সাহসী আর কোন পুরুষমানুষ ছিল না সেই অঞ্চলে, আলতিন-কিজের মত সুন্দরী ও স্নেহময়ী আর কোন নারী ছিল না পৃথিবীতে। যখন তাদের বয়স বাড়ল, বিয়ে হল তাদের, আরো বেশী

সুখী হল তারা। শীঘ্রই তাদের এক ছেলে জন্মাল, বাবার গর্ব আর মায়ের আনন্দের কারণ সেই ছেলে।

একদিন কাজের পরে সারসেমবাই মাঠে সুগন্ধি ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, আলতিন-কিজ তার কাছেই বসে ঝুঁকে আছে তার দিকে আর তার বুকের ওপর খেলা করছে তার ছেলে। মনের সুখে হেসে উঠল সারসেমবাই, বলল:

'এই তো সত্যি হল আমার সেই স্বপ্নটা যেটা আমি ছেলেবেলায় সরাইখানার এক সওদাগরের কাছে কিনেছিলাম এক পয়সা দিয়ে। দেখ সবাই, আমি শুয়ে আছি দামী বিছানায় — আমার দেশের পবিত্র মাটিতে, আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে স্বচ্ছ সূর্য — আমার প্রিয়তমা আলতিন-কিজ তুমি; আর আমার বুকের ওপর খেলা করছে উজ্জ্বল চাঁদের ফালি — আমাদের প্রথম সন্তান... এই মুহূর্তে যে কোন রাজাই ঈর্ষা করবে আমার ভাগ্যকে!'

ছেলেবেলার দুঃখেভরা দিনগুলির কথা মনে পড়ে সারসেমবাইয়ের ইচ্ছে হল আবার একবার দেখে সেই ছেঁড়া পোশাকটা যেটা পরে সে চলে এসেছিল জমিদারের কাছ থেকে, যেটা পরে সে ঘুরে বেরিয়েছে বিভিন্ন দেশে, আর অবশেষে রক্তখাগী জালমাউজের তাঁবুতে তার আলতিন-কিজের দেখা পেয়েছে। নিয়ে এল আলতিন-কিজ সেই ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকটা। সেটা হাতে নিয়ে মাথা নাড়ল সারসেমবাই: গর্ত গর্ত হয়ে গেছে, টুকরো হয়ে খসে পড়ছে... আর তার মধ্যেই পকেটটা অক্ষত রয়েছে আর কি যেন রয়েছে তাতে। আরে কি এটা? পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সারসেমবাই, এক মুঠো বালি উঠে এল হাতে। মনে পড়ল সেই ভিখারী বুড়োকে সে বাজারে একটি পয়সা দিয়েছিল, তার বদলে বুড়ো তাকে এই অদ্ভুত উপহার দেয়; দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিটা সে উড়িয়ে দিল হাওয়ায়। হাওয়া হালকা বালির কণাগুলোকে নিয়ে মাঠময় ছড়িয়ে দিল। যতদূর চোখ যায় গোটা স্তেপভূমিটা জীবজন্তুর পালে ভরে গেল, বালিকণাগুলি পরিণত হয়েছে শক্তিশালী উটে, ছটফটে ঘোড়ায়, দুধাল গরুতে আর মোটা মোটা ভেড়ায়।

গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞাসা করতে লাগল:

'কার এই অগুন্তি গরু, ভেড়ার পাল? কার এমন অপূর্ব ঐশ্বর্য?'

সারসেমবাই উত্তর দিল:

'এই অগুন্তি গরু ভেড়ার পাল আমার আর তোমাদের, এই অপূর্ব ঐশ্বর্য আমাদের সবার।'

সুন্দরী মীরজান ও জলতলের অধিপতি

এক গরীব বিধবা ছিল। তার ছিল একমাত্র সন্তান, একটি মেয়ে, তাদের বংশে সব থেকে সুন্দরী। নাম তার মীরজান। এক গরমের দিনে গ্রামের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যাবে, মীরজানকেও ডাকল তারা। জলে নামল সবাই। মেয়েরা বলল:

'তুই সত্যিই সুন্দরী, মীরজান। খান তোকে দেখলে বলতেন, 'ও সুন্দরী মীরজান, তোমায় আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব, তুমি কেবল আমার হও।'

মীরজান লজ্জায় চোখ নীচু করল:

'তোমরা এমন ঠাট্টা করছ কেন, মেয়েরা? আমার দিকে খান ফিরেও তাকাবেন না। আমি যে গ্রামের মধ্যে সব থেকে গরীব।'

যেই সে একথা বলেছে হঠাৎ নদীর জল ফুঁসে উঠল আর নদীর গভীর থেকে কার যেন তেজী কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'ও সুন্দরী মীরজান, তোমায় আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দেব, তুমি কেবল আমার হও!'

মেয়েরা ভয় পেয়ে ছুট লাগাল তীরের দিকে, তারপর পোশাকগুলো নিয়ে দলবেঁধে গ্রামের দিকে দৌড়াল। মীরজানের কথা আর কারুর মনেই রইল না।

সে তীরে দাঁড়িয়ে দেখে তার পোশাকের ওপরে সাতপাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে এক বিরাট সাপ, মাথা উঁচু করে তুলে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

সাপটা বলল:

'ও সুন্দরী মীরজান! আমি জলের রাজ্যের রাজা। তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমাকে বিয়ে কর! তোমাকে উপহার দেব আমার স্ফটিকের প্রাসাদটা। তুমি যদি আমায় কথা দাও, আমাকে বিয়ে করবে তাহলে তোমার পোশাক দিয়ে দেব তোমায়, যদি রাজী না হও বিয়ে করতে, তোমার পোশাক আমি নদীতে নিয়ে চলে যাব। তখন তুমি কি করবে?'

ভয়ে দিশা হারিয়ে মীরজান কথা দিল। অমনি সাপটাও যেন আর নেই, কেবলমাত্র যেখানে

সেটা গিয়ে জলে নেমেছে সেখানে জলটা চক্রাকারে ঢেউ কাটতে লাগল, আর ছোট ছোট ঢেউগুলো তীরে এসে ধাক্কা দিতে লাগল। কোনরকমে পোশাক পরে মেয়েটিও দৌড় দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে তাঁবুতে ঢুকে মায়ের সামনে মাটিতে পড়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

'কি হল, সোনামণি ? কে তোর মনে দুঃখ দিয়েছে ?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন মায়ের।

মীরজান হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সব কথা মাকে বলল:

'কি হবে এখন ? আমি কথা দিয়েছি। কথা দিয়ে সে কথা না রাখা সম্ভব নয় তো।'

মা মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল:

'শান্ত হ', বাছা। ঐ ভয়ঙ্কর সাপটা নেহাতই তোর কল্পনা। অমন সাপ হয় না। ক'দিন বাড়ীতে বসে থাক কোথাও বেরোস না।'

এক সপ্তাহ কেটে গেল। মীরজান আবার হাসিখুশী হয়ে উঠল। মা তাকে তাঁবু থেকে এক পাও কোথাও বেরোতে দেয় না আর নিজেও দূরে কোথাও যায় না।

একদিন বৃদ্ধা দরজার বাইরে তাকিয়ে ভয়ে হিম হয়ে গেল:

'হায় হায়, এবার আমাদের আর বাঁচতে হবে না। যতদূর চোখ যায় কালো কালো সাপ নদী থেকে বেরিয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে আসছে।'

সাদা হয়ে গেল মীরজানের মুখ:

'আমাকে নিতে এসেছে ওরা...'

দরজা বন্ধ করে দিল তারা, তারপর সব আসবাবপত্র এনে চেপে দিল দরজাটা, আর নিজেরা চাদরের নীচে লুকিয়ে রইল, নিঃশ্বাস নিচ্ছে না ভয়ে।

সাপগুলো ওদিকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে — গোটা এলাকাটা গোলমালে ভরে গেছে। তাঁবুর কাছে এসে দেখে যে ভেতরে ঢোকবার পথ বন্ধ, হিস্‌হিস করে উঠল তারা, তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেতরে ঢুকবার পথ খুঁজে নিল, অজ্ঞান মীরজানকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে নদীর দিকে বয়ে নিয়ে চলল তারা। মীরজানের মা চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলল তাদের পেছনে পেছনে কিন্তু তাদের ধরতে পারল না। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সাপগুলো জলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

দুঃখে টলতে টলতে বুড়ী নিজের ফাঁকা ঘরে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে আর বলতে লাগল:

'আমার মেয়ে মীরজান শেষ হয়ে গেল। শয়তান সাপটা আমায় চিরদুঃখিনী করে দিল।..'

দিন যায়, চাঁদ ওঠে আবার ডোবে। মীরজানের মা একেবারেই বুড়িয়ে গেল, পিঠ ঝুঁকে গেল, চুল সাদা হয়ে গেল। তবু কিসের যেন অপেক্ষায় থাকে সে সব সময়। নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে থাকে দূর দিগন্তে যেদিকে তার মেয়েকে নিয়ে গেছে কালো সাপেরা।

একদিন সে বিষণ্ণ মনে বসে আছে নিজের তাঁবুর দোরগোড়ায়, হঠাৎ দেখে এক

যুবতী আসছে তার দিকে, রানীর মত পোশাক-আশাক, তার বাঁ কোলে একটি মেয়ে আর ডান হাতে একটি ছেলের হাতধরা।

সর্বশরীর কেঁপে উঠল বৃদ্ধার।

'মীরজান! মেয়ে আমার! তুই নাকি?' মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল সে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকল তারা। মেয়ে, নাতিনাতনীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বৃদ্ধা, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

'কোথা থেকে তুই এলি, মীরজান?'

'আমি এসেছি জলতলের রাজ্য থেকে। আমার স্বামী সে রাজ্যের অধিপতি।'

'জলের নীচে তুই সুখে আছিস?'

'আমার থেকে বেশী সুখী আর কেউ নেই, মা। তোমার জন্য আমার মন কেমন করছিল আর আমার ছেলেমেয়েকে তোমায় দেখাব ভাবলাম।'

'তুই কি আবার ঐ মুখপোড়া সাপটার কাছেই ফিরে যাবি নাকি, মা? তুই তোর দুঃখিনী মাকে আবার ফেলে যাবি নাকি?' বলল বৃদ্ধা আর মনে ভাবল: 'এ আমি কখনও হতে দেব না। কিছুতেই আর আমি মীরজানকে কাছছাড়া করব না।'

মীরজান উত্তর দিল: 'মাগো, আমি তোমার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ীতে, জলতলের প্রাসাদে পেঁছান চাই। আমার স্বামী অপেক্ষা করে আছেন আমাদের জন্য। আমি তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। জল ছেড়ে যখন উঠে আসেন তখন তিনি কেবলমাত্র সাপের চেহারা নেন কিন্তু জলের নীচে তিনি চমৎকার বীরপুরুষ।'

'যাক, কি আর হবে, এই ছিল আমাদের কপালে। কিন্তু তুই জলের নীচের রাজ্যে কি করে আবার ফিরে যাবি?'

'আমি নদীর কাছে গিয়ে ডাক দেব: 'আহমেদ, আহমেদ! আমি তোমার স্ত্রী! এসো, সোনামনি, আমাদের নিয়ে যাও!' আমার স্বামী তখন এসে আমাদের নিয়ে যাবে প্রাসাদে।'

বুড়ী ভাবল, 'আচ্ছা, এবার বুঝলাম কি করতে হবে।'

এবার কান্নাকাটি করে মেয়েকে বারবার বলতে লাগল:

'চিরকাল আমার সঙ্গে থাকতে না চাস, আজকের রাতটা অন্তত থেকে যা!'

মায়া হল মীরজানের মায়ের জন্য, সকাল পর্যন্ত থেকে যেতে রাজী হল। অত্যন্ত আনন্দিত হল বৃদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে যেন যৌবন ফিরে পেল।

দিন এদিকে শেষ হতে চলেছে। রাত নামলে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল সুন্দরী মীরজানও। তখন বৃদ্ধা চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কুড়ুলটা নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

নদীর কাছে এসে উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল:

'আহমেদ, আহমেদ! আমি তোমার স্ত্রী! এসো, সোনামনি, আমাদের নিয়ে যাও!'

তক্ষুণি জলের থেকে উঠে এল সাপটা আর তীরের ওপর মাথা রেখে স্নেহমাখা স্বরে বলল:

‘এলে শেষ পর্যন্ত, মীরজান! কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি, ছেলেমেয়ের জন্যও মন কেমন করছে...’

আর দেরী করল না বৃদ্ধা, কুড়ুলের এক ঘায়ে সাপটার মাথা কেটে উড়িয়ে দিল... কাটা মাথাটা তীরে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। নদীর জল লালে-লাল হয়ে উঠল...

সকালে ঘুম থেকে উঠে মীরজান ছেলেমেয়েকে নিয়ে মায়ের কাছে বিদায় নিতে লাগল:

‘চললাম গো মা, আবার এক বছর বাদে আসব তোমার কাছে।’

ছেলের হাত ধরে আর মেয়েকে কোলে নিয়ে চলল নদীর দিকে। জলের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল স্বামীকে:

‘আহমেদ, আহমেদ! আমি তোমার স্ত্রী। এসো, সোনামনি, আমাদের নিয়ে যাও!’

কেউ উঠে আসে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডাক দিল মীরজান:

‘আহমেদ, আহমেদ! আমি তোমার স্ত্রী। এসো, সোনামনি, আমাদের নিয়ে যাও!’

জলের গভীর থেকে জলতলের রাজ্যের অধীশ্বর আর উঠে আসে না কিছুতেই। মীরজানের বুকটা কেমন ব্যথা করে উঠল, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে নদীটা লালে-লাল...

সবই বুঝল মীরজান, কাঁদতে কাঁদতে চুমু খেতে লাগল ছেলেমেয়েকে:

‘তোমাদের বাবা মারা পড়েছেন... আর আমিই তার জন্য দায়ী... তোমরা এখন অনাথ হয়ে গেলে, কি করব আমি?’

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ছেলেমেয়েকে বলল:

‘তুই, মামণি, দোয়েল পাখী হয়ে জলের কাছে কাছে উড়ে বেড়াবি আর তুই, বাবা, বুলবুলি পাখী হয়ে ভোরবেলায় গান গাইবি! আর আমি তোদের আশ্রয়হীনা মা কোকিল হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াব, স্বামীর কথা স্মরণ করে বিষণ্নভাবে ডাকতে থাকব!..’

বলে তারা তিনজনেই পাখীতে পরিণত হয়ে গেল, তারপর ডানা ঝাপটা দিয়ে বিভিন্ন দিকে উড়ে চলে গেল।
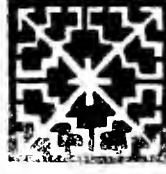
কাদিরের নসীব

দুই ভাই ছিল। বড় ভাই বুদ্ধিমান, কর্মঠ আর ছোট ভাই ছিল নির্বুদ্ধি, অলস আর হিংসুটে। নাম তার কাদির। তাকে নিয়েই এই গল্প।

কাদির একদিন তার ভাইয়ের কাছে এসে আক্ষেপ করে বলল:

'কেন এমন হয় বল দেখি, ভাই! তুমি আর আমি এক বংশের ছেলে, মায়ের পেটের ভাই। কিন্তু ভাগ্য আমাদের বিভিন্ন। তোমার সবকিছুতেই সাফল্য আর আমার সবেতেই ব্যর্থতা। তোমার ভেড়াগুলো মোটা হচ্ছে, বাচ্চা দিচ্ছে, আর আমারগুলো পটাপট মরছে; তোমার ঘোড়া দৌড়ে প্রথম হল আর আমারটা মাঝপথে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল; তোমার ঘরে মাংস আর কুমিস* সদাই মজুত, আর আমার ঘরে বিস্বাদ সুপ তাও পেটভরা নেই; তোমার আছে স্নেহময়ী স্ত্রী, আর আমার দিকে কোন মেয়েই ফিরে তাকায় না; তোমাকে বৃদ্ধরাও সম্মান করে আর আমাকে ছোট ছেলেরাও গালিগালাজ করে...'

বড় ভাই মৃদু হেসে উত্তর দিল:

'আমার নসীবই আমাকে সাহায্য করে নিশ্চয়ই।'

'নসীব আমাকে সাহায্য করে না কেন?'

'প্রত্যেকেরই নিজের নিজের নসীব আছে রে ভাই। আমার নসীব খাটাখাটনি করতে ভালবাসে আর তোরটা কোথায় কোন গাছতলায় পড়ে ঘুমোচ্ছে।'

'আচ্ছা, নসীবটাকে খুঁজে বার করে আমার জন্য খাটাখাটনি করতে বাধ্য করব।' ভাবল কাদির।

সেইদিনই সে নসীবের সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়ল।

চলতে চলতে সে অনেকদূরে এসে পৌঁছল। হঠাৎ একটা পাথরের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সিংহ, তার কেশর ফুলে উঠেছে; কাদিরের পথ আটকে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। ভয় পেয়ে গেল কাদির, পালিয়ে যাবার কোন জায়গা নেই — চারপাশে ন্যাড়া স্তেপভূমি। কি হবে?

* কুমিস — ঘোড়ার দুধ দিয়ে তৈরী পানীয়। — সম্পাঃ

সিংহটা বলল:

'কে তুই ?'

'আমি কাদির।'

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'নিজের নসীবকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'তাহলে শোন্, কাদির,' বলল সিংহ, 'যখন নসীবকে খুঁজে পাবি, তাকে জিজ্ঞাসা করবি, কি করলে আমার বেদনাটা কমবে। কোন লতাপাতায় আর কাজ হচ্ছে না। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। যদি তুই কথা দিস যে এ কাজটা করবি তাহলে তোকে ছেড়ে দেব আর তা নাহলে ছিঁড়ে খাব তোকে এখনই।'

কাদির সিংহকে কথা দিল তার জন্য নিয়ে আসবে ওষুধ বা জেনে আসবে কি খেলে কাজ হবে, সিংহটা তার পথ ছেড়ে দিল।

এগিয়ে চলল কাদির, দেখে: রোদের তাপে জ্বলে যাওয়া মাঠের মধ্যে বসে কাঁদছে এক বুড়ো, এক বুড়ী আর অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে, এমন দুঃখের সে কান্না, যেন তাদের কোন আত্মীয়বিয়োগ হয়েছে।

কাদির থেমে জিজ্ঞাসা করল:

'ওহে, তোমরা কাঁদছ কেন ?'

'আমাদের বড় দুঃখ,' বলল বুড়ো, 'তিন বছর আগে আমি এই জমিটা কিনি, এর দাম মেটাতে আমার যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিয়েছি। সর্বশক্তি দিয়ে এই জমি চাষ করি আমরা, মা যেমন তার শিশুর যতন করে তেমনই আমরা এই শস্যের যতন করি। কিন্তু এখনও একবারও আমরা ফসল তুলতে পারি নি। চারাগাছগুলো হুহু করে বেড়ে ওঠে, বসন্তকালে সমস্ত জমিটা সবুজ হয়ে যায়। প্রচুর শস্য পাবার আশায় মন ভরে ওঠে কিন্তু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি গাছে যত জলই দেওয়া হোক না কেন সেগুলি শুকিয়ে যায় আর একেবারে শিকড় পর্যন্ত জ্বলে যায়। এর কারণ কি কেউ বলতে পারে না। আমাদের নসীবে সুখ নেই গো ভালমানুষের ছেলে, মারা পড়ব আমরা।'

কাদির বলল:

'আমারও নসীবটা কোথায় কোন গাছের তলায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাকেই আমি খুঁজতে যাচ্ছি।'

তখন বুড়ো কাদিরকে অনুরোধ করতে লাগল:

'খোদা তোমার মঙ্গল করুন বাছা, সফল হও তুমি, যদি নসীবকে খুঁজে পাও তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা কোরো সে বলতে পারে নাকি আমাদের গাছগুলো মরে যায় কেন। তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমরা।'

কাদির তাকে কথা দিল যে উত্তর জেনে এই পথেই সে ফিরবে। তারপর আবার রওনা দিল নিজের পথে।

কয়েক দিন পরে কাদির এক বড় শহরে এসে পেঁছাল, জানতে পারল যে সেটা ঐ দেশের রাজধানী। সেই শহরের ভীড়েভরা রাস্তায় সে পা রাখতে না রাখতেই প্রহরীরা তার ওপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঘাড় ধরে তাকে নিয়ে চলল রাজার প্রাসাদে। হঠাৎ এই ঘটনায় একেবারেই ঘাবড়ে গেল কাদির, কি অপরাধ করেছে কিছুই বুঝতে না পেরে সে চরম কিছুরই অপেক্ষায় রইল। কিন্তু রাজা তাকে গ্রহণ করলেন মিষ্টি হেসে, মিষ্টি কথা বলে।

'তুমি আমার অতিথি হও বিদেশী,' বলল রাজা, 'কে তুমি, কোথায় যাচ্ছ সব বল।'

কাদির হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে বলতে লাগল রাজাকে সবকিছু, কিন্তু তার কথাবার্তা সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

তার কথা সব শুনে রাজা আদেশ দিল:

'ওঠ কাদির, আমার কাছে এস! আমাকে ভয় পেও না। আমি তোমাকে বলছি আমার বন্ধু ভেবে, ভৃত্য ভেবে নয়। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যখন তুমি তোমার নসীবকে খুঁজে পাবে তাকে জিজ্ঞাসা কোরো, কেন আমি এমন বিশাল, ধনী, শক্তিশালী রাজ্যের রাজা হয়েও মনে আমার কোন আনন্দ নেই, সোনার প্রাসাদে আমি বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকি। উত্তর যদি নিয়ে আস, তা সে যে ধরণের উত্তরই হোক না কেন তোমাকে আমি অকৃপণ হাতে পুরস্কার দেব।'

আবার রওনা দিল কাদির। তিন বছর ধরে পথ চলে সে এসে পেঁছাল এক বিরাট কালো পাহাড়ের কাছে, দেখে: খাড়া পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল গাছ আর তার নীচে শুয়ে একেবারে মরার মত ঘুমিয়ে আছে খালি-গা, খালি-পা, নোংরা চেহারা, চুল উস্কোখুস্কো মানুষের মত কি যেন একটা জীব।

'এটাই কি আমার নসীব নাকি?' ভাবল কাদির। তারপর জাগাতে লাগল সেই কুঁড়ের হদ্দটাকে।

'এই ওঠ, ওঠ, কাজ করতে লাগ। দেখ্ গিয়ে, আমার ভাইয়ের নসীব কেমন তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে। তুই আমার জন্য খাটতে চাস না কেন? ওঠ শীগগির!'

অনেকক্ষণ ধরে সে চেঁচাতে আর ধাক্কা দিতে লাগল ঘুমন্ত জীবটিকে। তারপর নসীব একটু নড়েচড়ে, হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুল, তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে, হাই তুলে, চোখ রগড়াতে লাগল।

'কাদির, তুই নাকি? শুধু শুধুই তুই দুনিয়াময় ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা করছিস। এইরকম একটা ছায়াময় গাছের নীচে শুয়ে থাকলেই পারতিস, আরামে বাঁচতে পারতিস তাহলে। তোর ভাইয়ের মত বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী লোকদেরই সাহায্য করে নসীব আর তোর মত নির্বুদ্ধি, অলস লোকদের জন্য নসীবও কিছু করবে না। যাক্, তুই যখন আমার কাছে এসেই পড়েছিস তখন বোস্, বল কেমন করে তুই এপথ খুঁজে পেলি, কি দেখেছিস পথে, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কি নিয়ে কথা বলেছিস, আর আমার কাছে তোর প্রয়োজনই বা কি।'

বলতে থাকে কাদির আর তার নসীব হাই তুলতে থাকে তার কথা শুনতে শুনতে। শেষ

পর্যন্ত শুনে, নসীব তাকে শিখিয়ে দিল ফিরে যাবার পথে কাকে কি উত্তর জানাতে হবে, তারপর বলল:

'তোর সব কথা শুনে আমি বুঝলাম কাদির যে তোর মধ্যে অনেক খারাপ গুণ থাকলেও ভাল গুণও অনেক আছে। তোর স্বভাবের এই ভাল দিকটার জন্য আমি তোকে পুরস্কার দিতে চাই। বাড়ী যা। তোর সামনে মস্ত বড় সৌভাগ্য অপেক্ষা করে আছে, যা সবাই পায় না। দেখিস, বোকামী করে সে সৌভাগ্য হাতছাড়া করিস না যেন। বিদায় !'

কাদিরের নসীব আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সারা উপত্যকা কাঁপিয়ে নাক ডাকাতে লাগল। কাদির আবার তাকে ধাক্কা দিতে লাগল, নিজের ভবিষ্যতের কথাটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য, কিন্তু ঘেমেনেয়ে গেল, জাগাতে পারল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পিছন ফিরে নিজের পায়েরই চিহ্ন ধরে ধরে ফিরে চলল।

সেই রাজার রাজ্যে এসে পেঁছাল। অত্যন্ত খুশী হয়ে রাজা সমস্ত ভৃত্য ও দেহরক্ষীদের চলে যেতে আদেশ দিল, অতিথিকে নিজের কাছে বসিয়ে বলল:

'বল, কাদির !'

কাদির বলল:

'আমার নসীব তোমার নিরানন্দের কারণ জানিয়েছে আমায়। তুমি রাজ্যশাসন করছ, সবাই তোমায় রাজা বলে সম্বোধন করে, ভাবে তুমি পুরুষমানুষ। আসলে তুমি স্ত্রীলোক। এই সত্য গোপন করা সহজ নয় তোমার পক্ষে। শাসনভার আর সামরিক দায়িত্ব পালন করে চলা তোমার একার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। উপযুক্ত স্বামী বেছে নাও নিজের জন্য, তাহলেই তোমার মনের আনন্দ আবার ফিরে আসবে।'

'তোমার নসীব ঠিক কথাই বলেছে, কাদির,' লজ্জিত রাজা দামী মস্তকাবরণটা খুলে ফেলল, কালো চুলের বেনী নেমে এল রঙীন গালিচার উপর। কাদির দেখল তার সামনে বসে আছে পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দরী এক যুবতী।

লজ্জায় লাল হয়ে যুবতীটি বলল:

'তুমিই প্রথম পুরুষমানুষ যে আমার গোপনকথা জেনেছে। তুমিই আমার স্বামী আর এ দেশের রাজা হও !'

এই প্রস্তাবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল কাদির তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নাড়িয়ে বলল:

'না, না, রাজা হতে চাই না আমি ! আমার সুখ অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য !'

আবার রওনা দিল সে।

পথে তার দেখা হল সেই বুড়ো-বুড়ী আর তাদের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। তাকে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল তারা:

'আমাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্য তুমি কি কিছু জেনে এসেছ কাদির ?'

কাদির বলল, 'শোন, তাহলে বলি। বহুদিন আগে এক ধনীলোক বিদেশী আক্রমণের ভয়ে

এই জমির নীচে চল্লিশঘড়া মোহর পুঁতে রেখেছিল। সেই জন্যই তোমাদের জমিতে কোন ফসল হয় না। ঐ মোহর খুঁড়ে বার কর, তোমাদের জমি উর্বরা হয়ে উঠবে, আর তোমরাও এই অঞ্চলের সব থেকে ধনী হয়ে উঠবে।'

আনন্দে বেচারীরা নাচানাচি আরম্ভ করে দিল, তারা হাসছে, কাঁদছে কাদিরকে জড়িয়ে ধরছে।

বুড়ো বলল:

'তুমি আমাদের দুঃখ ঘোচালে, কাদির। তুমি আমাদের কাছে থেকে যাও। মাটি খুঁড়ে মোহর তুলে আনতে সাহায্য কর আমাদের। এই ধনের অর্ধেকটা তুমি নাও আর আমার মেয়েকে বিয়ে করে আমার সন্তান ও জামাতা হও।'

বুড়ো-বুড়ীকে কাদিরের বেশ ভাল লাগল, আরো বেশী ভাল লাগল তাদের মেয়েকে। কিন্তু তবুও সে তাদের কাছে এমন কি রাতটাও কাটাল না।

'না,' কাদির বলল, 'আমার সুখ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।' তারপর আবার হাঁটা শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে জুতো গেল ছিঁড়েখুঁড়ে, পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলল মরুভূমির পথ ধরে। সামনে একটা বড় পাথর দেখে তার ওপর বসে চিন্তা করতে লাগল, 'পথের তো শেষ হতে চলল কোথায় আমার সুখ?'

একথা মনে হওয়ামাত্রই দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহ।

'তুমি আমার জন্য উপদেশ বা ঔষুধ কিছু এনেছ নাকি, কাদির?' বলল সিংহ।

'ওষুধ আনি নি, কিন্তু তোমার এই কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা পথ আছে। পৃথিবীতে সব থেকে নির্বোধ লোকের মগজের ঘিলুটা খেয়ে নাও যদি, তবেই সেরে উঠবে।'

'তুমি আমায় বাঁচালে, কাদির। এবার তাহলে বোকা লোকের খোঁজ করতে হয়, হয়ত তুমি আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। এবার বল দেখি পথে কাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার, কি কথা বলেছ তাদের সঙ্গে। যতক্ষণে না সব বলছ, ছাড়া পাবে না কিছুতেই।'

করার কিছু নেই, বলতে আরম্ভ করল কাদির পুরনো দেবদারু গাছের নীচে শুয়ে থাকা তার নসীবের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, মেয়ে-রাজার কথা, সেই বুড়ো-বুড়ী আর তাদের সুন্দরী মেয়ের কথা।

সিংহের চোখ চকচক করে উঠল, দাঁত কিড়মিড় করল সে, তারপর কেশর ফুলিয়ে সে বলল:

'তুই একটা আহাম্মক, কাদির! হাতের মধ্যে এমন সুখ পেয়েও তুই তাকে ধরে রাখতে পারলি না। তুই প্রত্যাখ্যান করেছিস ক্ষমতা ও সম্মানকে, ধনসম্পদকে আর প্রত্যাখ্যান করেছিস দুই সুন্দরী পাত্রীকে... যদি আমি তিনবারও ঘুরে আসি সারা পৃথিবীটা তবুও তোর থেকে বেশী বোকা লোক খুঁজে পাব না। তোর মগজটাই আমার অসুখ সারাবে!..'

সিংহটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাদিরের ওপর। তাড়াখাওয়া ভেড়ার মত ভয় পেয়ে

কাদির মাটিতে পড়ে গেল। তাই বেঁচে গেল সে: সিংহটা বুক দিয়ে পাথরের ওপর পড়ে সেই আঘাতে তক্ষুনিই মরে গেল।

'কি নসীব!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠল কাদির। 'অনিবার্য মৃত্যু আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল, আর বেঁচে গেলাম আমি! ওঃ কি কপাল!'

কাদির যখন গ্রামে ফিরে এল কেউ তাকে চিনতে পারল না: চেহারাটা তেমনই, কিন্তু স্বভাব বদলে গেছে। যেন পুনর্জন্ম হয়েছে তার, নতুন মানুষ হয়ে গেছে সে। সদা হাসিখুশী, অমায়িক স্বভাব, কোনকিছুতেই বিরক্তি নেই, কাউকেই আর হিংসা করে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে যায় গান গাইতে গাইতে, সবাই তাকে প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল তার বিচক্ষণতা আর সুন্দর স্বভাবের জন্য। দিনে দিনে তার ধনসম্পদ বেড়েই উঠতে লাগল, বিয়ে-থা করে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে লাগল।

'কেমন আছ, কাদির?' বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে।

কাদির মৃদু হেসে উত্তর দেয়:

'পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি!'

জিরেনশে ও কারাশাশ

বহুদিন আগে এক জ্ঞানী লোক ছিল, নাম তার জিরেনশে-শেশেন। তার জ্ঞান সমুদ্রের মতই অসীম ও গভীর, সে কথা বলে যেত একটানা যেন বুলবুলির সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কিন্তু এত গুণী হওয়া সত্ত্বেও জিরেনশে ছিল সেই অঞ্চলের সব থেকে গরীব লোক। যখন সে নিজের মাটির ঘরে শুত তার পাদুটো বেরিয়ে থাকত ঘরের দরজার বাইরে। আর ঝড়বাদলার দিনে তার ঘরের দেওয়াল ছাতের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে অঝোরে জল ঢুকত।

একদিন জিরেনশে বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছে স্তেপভূমি পেরিয়ে। দিন ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, তাই তারা জোরে ঘোড়া চালাচ্ছে যাতে আলো থাকতে থাকতেই রাত কাটাবার একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া যায়। হঠাৎ তাদের পথের সামনে পড়ল চওড়া একটা নদী। নদীর ওপারে একটা গ্রাম আর এপারে মেয়েরা বস্তার মধ্যে ঘুঁটে ভরছে।

মেয়েদের কাছে এসে তারা জিজ্ঞাসা করল নদী পার হওয়া যাবে কেমন করে।

মেয়েদের দল থেকে এগিয়ে এল একটি তরুণী যাকে তার বন্ধুরা ডাকছিল কারাশাশ বলে। তার অঙ্গে একটি অতি পুরনো, তালিদেওয়া পোশাক, কিন্তু এক অপূর্ব সৌন্দর্যে সে যেন ঝলকাচ্ছে: চোখগুলি যেন তারার মত, হাঁ-মুখটি একফালি চাঁদ আর দেহবল্লরী যেন সুঠাম ও নমনীয় দ্রাক্ষালতা।

'দুটি জায়গা আছে,' মেয়েটি বলল, 'একটা বাঁদিকে — কাছে, কিন্তু দূরে, অন্যটা ডানদিকে — দূরে কিন্তু কাছে।' বলে সে দু'দিকে দুটি অগভীর জলের জায়গা দেখিয়ে দিল।

কেবলমাত্র জিরেনশে মেয়েটির কথার অর্থ বুঝল তাই ঘোড়ার মুখ ফেরাল ডানদিকে।

একটু পরে সে পার হবার জায়গাটা দেখতে পেল। অগভীর জল, আর বালি নদীতলে। সহজেই নদী পেরিয়ে গেল সে, তারপর তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রাম পর্যন্ত পেঁছে গেল।

আর তার বন্ধুরা ওদিকে বাঁদিকে কাছের পথটায় গিয়ে পরে অনুতাপ হল তাদের। নদীর মাঝ পর্যন্ত পেঁছবার আগেই ঘোড়াগুলো জড়িয়ে গেল কাদায়। সবচেয়ে গভীর জায়গায় তাদের ঘোড়া থেকে নামতে হল আর ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে হাঁটতে হাঁটতে নদী পেরোতে

হল। সারা শরীর ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে তারা যখন গ্রামের দিকে রওনা দিল তখন সন্ধ্যা নামছে।

জিরেনশে গ্রামের প্রথম তাঁবুর কাছে ঘোড়া থামাল। দেখলেই বোঝা যায় সেটায় গ্রামের সব থেকে দরিদ্র লোকের বাস; জিরেনশে আন্দাজ করল, যে মেয়েটি তাদের পথ বলে দিয়েছে তার বাবামার তাঁবু এটা।

কারাশাশের মা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাল, বলল ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবুতে বসে বিশ্রাম করতে। তাঁবুটির বাইরে যেমন দারিদ্র্যের চিহ্ন, ভিতরেও তেমনি। কারাশাশের মা অতিথিদের বসতে গালিচার বদলে ভেড়ার শুকনো চামড়া পেতে দিল।

কিছু পরে কারাশাশ ঘুঁটেবোঝাই বস্তা কাঁধে নিয়ে ঢুকল তাঁবুতে।

সেটা ছিল বসন্তকাল, সূর্য অস্ত যাবার আগে প্রচণ্ড জোরে একবার বৃষ্টি হয়ে গেছে। সব মেয়েরা ঘরে ফিরেছে ভেজা ঘুঁটে নিয়ে তাই তাদের পরিবারে সন্ধ্যাবেলায় রান্নাবান্না কিছু হল না। খালিপেটেই ঘুমোতে শুল তারা।

কারাশাশই কেবল নিয়ে এসেছে শুকনো ঘুঁটে। আগুন জ্বালাল সে অতিথিদের আরামের জন্য।

'কি করে তুমি বিষ্টির হাত থেকে ঘুঁটে বাঁচালে ?' অতিথিরা জিজ্ঞাসা করল।

কারাশাশ বলল যখন বৃষ্টি এল, সে ঘুঁটের বস্তার ওপর শুয়ে পড়ে নিজের দেহ দিয়ে সেটাকে ঢেকে রাখল। তার পোশাক ভিজে গেল বটে কিন্তু পোশাক শুকিয়ে নিতে তো কোন কষ্ট নেই, চুলার কাছে বসলেই হল। এমন করে ঘুঁটে বাঁচান ছাড়া আর কোন পথ ছিল না, তার বাবা ভেড়ার পাল চরিয়ে রাতের বেলায় ফেরে ক্ষুধার্ত, হিমে কাতর হয়ে, আগুন না জ্বালাতে পারলে বাবার কষ্ট হবে। অন্য মেয়েরা বৃষ্টির সময় ঘুঁটের বস্তার নীচে লুকোল, তাতে তাদের ঘুঁটে ভিজল আর পোশাকও শুকনো রইল না।

অতিথিরা তার উত্তরে অবাক হল তার বুদ্ধি দেখে।

তারপর তারা জানতে চাইল রাতে কি ধরণের আহার্য দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে।

কারাশাশ উত্তর দিল:

'আমার বাবা গরীব কিন্তু অতিথিপরায়ণ। যখন জমিদারের ভেড়ার পাল চরিয়ে ফিরবে যদি যোগাড় করতে পারে তো একটা ভেড়া জবাই করবে আর যদি যোগাড় করতে না পারে তো এমনকি দুটো জবাই করবে।'

জিরেনশে ছাড়া আর কেউই একথার মানে বুঝল না, তারা এটা ঠাট্টা বলে ভেবে নিল।

কারাশাশের বাবা ঘরে ফিরে অপরিচিত লোক বসে আছে দেখে দৌড়ল জমিদারের কাছে হঠাৎ এসে পড়া অতিথিদের আহার প্রস্তুত করার জন্য একটা ভেড়া চাইল।

জমিদার ভাগিয়ে দিল তাকে।

তখন কারাশাশের বাবা তার একটিমাত্র ভেড়ীটাকেই কাটল, সেটি ছিল গর্ভবতী। ভেড়ীর মাংস দিয়ে অতিথিদের জন্য সুস্বাদু বেশ্‌বারমাক তৈরী করল।

তখনই কেবল অতিথিরা কারাশাশের কথার অর্থ বুঝতে পারল।

সবাই যখন খেতে বসল, জিরেনশে বসল কারাশাশের মুখোমুখি। তার রূপে আর বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে জিরেনশে সবার অলক্ষ্যে নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বোঝাল যে কারাশাশকে সে খুব ভালবেসে ফেলেছে।

কারাশাশও তার থেকে চোখ নামাচ্ছিল না, তাই সবই সে দেখতে পেল, সেও চোখে হাত ঠেকাল। এভাবে সে বলতে চাইল যে জিরেনশের মনের ভাব তার নজর এড়ায় নি।

তখন জিরেনশে নিজের মাথার চুলে হাত বোলাল, জানতে চাইল তার বাবা দান হিসেবে তার মাথার চুলের মতই অগুন্তি গরুভেড়া দাবী করবে নাকি।

কারাশাশ এর উত্তরে যে ভেড়ার চামড়াটার ওপর বসেছিল সেটায় হাত বোলাল অর্থাৎ ঐ চামড়ায় যতগুলি লোম ততগুলি গরুভেড়া পেলেও বাবা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ে বিষণ্নভাবে মাথা নামিয়ে নিল জিরেনশে।

তার জন্য মায়া হল মেয়েটির। চামড়ার কোনটা একটুখানি উল্টে সে হাত বোলাল মোলায়েম লোমহীন চামড়াটায়। এভাবে সে বুঝিয়ে দিল যদি উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় তো বাবা কোন কিছু না নিয়েই মেয়েকে তুলে দেবে তার হাতে।

কারাশাশের বাবা তাদের এই নিঃশব্দে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া সমানেই লক্ষ্য করছিল, বুঝল যে দু'জনের দু'জনকে মনে ধরেছে তাদের, আরো নিশ্চিত হল যে জিরেনশেও তার মেয়ের মতই বুদ্ধিমান। তাই, যখন জিরেনশে তার কাছে অনুমতি চাইল কারাশাশকে বিয়ে করার জন্য, সে সানন্দে সম্মতি দিল।

তিনদিন বাদে জিরেনশে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এল নিজের গ্রামে।

সুন্দরী ও বুদ্ধিমান কারাশাশের খ্যাতি সমস্ত এলাকায়, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাজধানী পর্যন্ত পেঁছাল।

খান যখন শুনলেন উজিরের কাছে যে কারাশাশের মত সুন্দরী, বুদ্ধিমতি মেয়ে আর নেই পৃথিবীতে, গরীব জিরেনশের প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠল তাঁর মন, স্থির করলেন ছিনিয়ে নিতে হবে ওর স্ত্রীকে।

খানের দূত ঘোড়ায় চড়ে এসে জিরেনশেকে জানাল, খানের আদেশ সে যেন অবিলম্বে তার স্ত্রীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়।

করার তো আর নেই কিছু, রওনা দিল তারা প্রাসাদপানে।

কারাশাশকে দেখামাত্রই খান স্থির করলেন যে কোনো উপায়েই হোক না কেন তাকে নিজের স্ত্রী করতেই হবে, আর জিরেনশেকে আদেশ দিলেন তাঁর কাছে কাজে লাগার জন্য।

দিনের বেলায় জিরেনশে কাজ করে চোখধাঁধান রাজপ্রাসাদে, আর সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে নিজের কুটীরে কারাশাশের কাছে।

তার নিজস্ব এই সময়টিতে সে প্রিয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলত:

'নিজের কুটীরে কতই না সুখ। রাজপ্রাসাদের থেকেও বড় এ কুটীর।'

পাগুলো তো ওদিকে কুটীরের বাইরে বেরিয়ে আছে।

দিন যায়, আর খান সব সময়ই চিন্তা করেন কি করে জিরেনশেকে মেরে ফেলে কারাশাশকে দখল করা যায়। অনেকবার তিনি জিরেনশেকে দুরূহ, বিপজ্জনক কাজের ভার দিয়েছেন, প্রতিবারই সে দ্রুত ও চমৎকারভাবে সে কাজ করে ফেলেছে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার কোন সুযোগই আসছে না।

একবার খান অনুচরবর্গ নিয়ে স্তেপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, খুব হাওয়া সেদিন, মাঠের মধ্যে দিয়ে উড়ছে শুকনো ঘাসের দলা একটা। খান জিরেনশেকে বললেন:

'ঐ শুকনো ঘাসের দলাটাকে ধাওয়া করে জেনে আয় ও কোথা থেকে আসছে আর যাচ্ছে কোথায়। দেখিস উত্তর না আনতে পারলে তোর মাথাটা আর থাকবে না ঘাড়ের ওপর।'

শুকনো ঘাসের দলার পিছনে ধাওয়া করে সেটাকে ধরে ফেলল জিরেনশে, বল্লমের ফলায় সেটাকে বিঁধে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ফিরে এল।

খান জিজ্ঞাসা করল:

'কি উত্তর পেলি ?'

জিরেনশে উত্তর দিল:

'মহারাজ, শুকনো ঘাসের দলাটা আপনাকে সেলাম জানাল আর প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলল, 'কোথা থেকে আসছি আমি আর কোথায় যাচ্ছি তা জানে বাতাস আর কোথায় থামব তা নির্ভর করছে খাতের উপর। এ তো জানা কথাই। হয় তুই বোকা যে এমন প্রশ্ন করছিস আমায়, না হয় সে বোকা যে তোকে পাঠিয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর জানতে।'

প্রচণ্ড রাগ হল খানের, কিন্তু আত্মসংবরণ করলেন, জিরেনশের ওপর বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেল।

আর একবার খান তাকে আদেশ দিলেন তাঁর কাছে আসতে রাতেও না দিনেও না, পায়ে হেঁটেও না, ঘোড়ায় চড়েও না, সে যেন রাস্তাতেও না দাঁড়িয়ে থাকে আবার প্রাসাদেও না ঢোকে, এর এদিক ওদিক হলে তার মাথা কাটা পড়বে।

বিষন্নমনে বাড়ী ফিরল জিরেনশে, তারপর কারাশাশের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল, দু'জনে মিলে তারা একটা ফন্দী বার করল।

জিরেনশে খানের কাছে উপস্থিত হল ভোরবেলায়, ছাগলের পিঠে চড়ে এসে থামল ঠিক ফটকের চৌকাঠের ওপর।

খানের মতলব আবার ব্যর্থ হল। আবার একটা নতুন মতলব আঁটলেন তিনি।

শরৎকাল এল যখন জিরেনশেকে কাছে ডেকে চল্লিশটি ভেড়া তাকে দিয়ে বললেন:

'এই চল্লিশটি ভেড়া দিলাম তোকে, সারা শীতকাল ওদের দেখাশোনা করবি তুই। আর শোন, যদি বসন্তকালে এরা ভেড়ীর মত বাচ্চার জন্ম না দেয় তো তোর মাথা কাটা যাবে।'

জিরেনশে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে ঘরে ফিরল।

'কি হয়েছে তোমার ? এমন বিষণ্ণ কেন ?' জিজ্ঞাসা করল কারাশাশ।

জিরেনশে খানের অদ্ভুত খেয়ালী আদেশের কথা বলল।

'আরে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করে নাকি। শীতকালে সমস্ত ভেড়াগুলো কেটে ফেলবে, আর বসন্তকালে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, দেখো!'

কারাশাশের কথামতই কাজ করল জিরেনশে।

বসন্তকাল এল।

একদিন জিরেনশের কুটীরের দরজায় এসে ধাক্কা দিল খানের দূত, বলল, খান আসছেন তাঁর ভেড়াগুলোর বাচ্চা হল নাকি জানতে চান।

জিরেনশে দমে গেল, এবারে আর কিছুতেই তার রক্ষা নেই, ভাবল সে।

কারাশাশ বলল:

'মন খারাপ কোরো না। তুমি যাও মাঠের মধ্যে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাক, সন্ধ্যার আগে ফিরো না। আমি খানকে অভ্যর্থনা জানাব।'

জিরেনশে চলে গেল আর কারাশাশ একা রইল কুটীরে। একটু পরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর হুঙ্কার শোনা গেল, 'এই কে আছ, দরজা খোল!'

কারাশাশ গলা শুনেই বুঝল খান এসেছেন। সে কুটীর থেকে বেরিয়ে কুর্ণিশ করল খানকে।

'তোর স্বামী কোথায় ? বাইরে এল না যে ?' রাগতভাবে বললেন খান।

কারাশাশ বলল:

'মহারাজ, আমার স্বামীবেচারাকে মাফ করে দিন, ও বাড়ীর বাইরে গেছে আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই। যেই সে শুনল যে আপনি আমাদের ঘরে আসছেন তখনই দুঃখে ভেঙে পড়ল, আপনার মত এমন সম্মানিত অতিথির মুখে দেবার মত কোন আহার্যই যে আমাদের ঘরে নেই। তাই সে গেছে তার পোষা বটের পাখীটাকে দুয়ে দুধ নিয়ে আসতে, সে দুধ দিয়ে কুমিস তৈরী করবে আপনার জন্য। আপনি কুটীরের ভেতরে আসুন, আমার স্বামী এখুনি ফিরে আসবে।'

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন খান।

'তুই মিথ্যা বলছিস, অপদার্থ মেয়েছেলে!' চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'কে কবে দেখেছে বটের পাখীর দুধ হয় ?'

'মহারাজ, আপনি বিস্মিত হচ্ছেন কেন ?' নিরীহভাবে বলল কারাশাশ, 'আপনি কি জানেন না যে, যদি দেশের শাসক জ্ঞানী হয় তো এমন অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে ? আপনারই তো চল্লিশটা ভেড়া কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চার জন্ম দেবে ?'

খান বুঝল যে তাকে ব্যঙ্গ করছে সাধারণ একটা মেয়েছেলে। লজ্জায় কি করবেন না বুঝতে পেরে হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে, খুব জোরে সেটাকে চাবুক পিটিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই থেকে তিনি জিরেনশে আর কারাশাশকে জ্বালাতন করেন নি, আর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে লাগল।

খান জানিবেকের ঘোড়া

খান জানিবেকের একটা ঘোড়া ছিল, খুব ভাল জাতের আর তেজী। ঘোড়া তো নয় যেন ঝড়। এই ঘোড়াটা ছিল খানের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও গর্বের বস্তু। হঠাৎ ঘোড়াটা অসুখে পড়ল। খান মনোকষ্টে অধীর হয়ে পড়ল। প্রতিদিনের কাজকর্ম, আমোদ-আহ্লাদ, এমন কি খাওয়াদাওয়া, ঘুম সব ছাড়ল। লোকদের কানে গেল তার হুমকি:

'যদি কারুর এমন সাহস হয় যে বলে আমার ঘোড়া মারা গেছে তো আমি তার গলায় শলা ঢুকিয়ে দেব!'

প্রাসাদের লোকেরা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। খানের দাসদাসীরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চলাফেরা করতে লাগল। সহিসরা এক মুহূর্তেও ঘোড়ার পাশ ছেড়ে নড়ে না। ঘোড়া এদিকে মাটিতে পড়ে মরে গেল। করার কিছুই নেই। সব্বাই জানত যে মরতে তাদের হবেই। স্বামীরা স্ত্রীদের কাছ থেকে আর পিতারা সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল।

তখন খানের কাছে এলেন মহাজ্ঞানী জিরেনশে-শেশেন, খান তাঁর দিকে উন্মত্ত চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমাকে ঘোড়াটার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'কি হয়েছে তার? বল!'

'হুজুর! অধীর হবেন না! কিছুই হয় নি ঘোড়ার। আগে সে যেমন ছিল, তেমনই আছে, কেবল মুখে খাবার নিচ্ছে না, চোখ মেলছে না, পা নাড়াচ্ছে না, লেজে ঝাপটা দিচ্ছে না!'

'তার মানে আমার ঘোড়াটা মরে গেছে!' চীৎকার করে বলল খান।

'আসলে তাই, হুজুর! কিন্তু ভেবে দেখুন, যে নিষিদ্ধ কথাটা উচ্চারণ করার জন্য আপনি নিষ্ঠুর সাজা দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন তা' উচ্চারিত হয়েছে আপনার মুখ দিয়েই আমার মুখ দিয়ে নয়। আপনি নিজের মৃত্যু চাইবেন বলে আমার মনে হয় না।'

এইভাবে জ্ঞানী জিরেনশে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে নিজেকে এবং অন্যান্য লোকদের খানের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

কামার ও তার স্ত্রী

অনেক দিন আগের কথা। এক শহরে বাস করত এক দক্ষ কামার। মানুষ যতকিছু জিনিসের কথা জানে সবকিছুই সৃষ্টি করতে পারত তার হাত দু'টি — সে হাত দুটি পারত না কেবল কামার আর তার বৌয়ের জন্য যথেষ্ট আহার যোগাতে। সেই শহরের লোকেরা ছিল খুবই গরীব, তাই কামার কোথাও কোন কাজ না পেয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। সে কখনও মনখারাপ করত না, সবসময়েই ঠাট্টাতামাসা করত, গান গাইত, কিন্তু দুঃখেকষ্টে তার মনটা পুড়ে কয়লার মতই কালো হয়ে গেছে। সে নিজে সব দুঃখকষ্টই সহ্য করতে পারে, কিন্তু তার অল্পবয়সী বৌ, অমন সুন্দরী একশো বছরে একজন জন্মায়, সে অভাবে এত কষ্ট পাচ্ছে দেখে তার ভীষণ দুঃখ হয়। এই সব দেখে কামারের মনে হল সে রাজধানীতে গিয়ে রোজগার করার চেষ্টা করবে, সেখানে ধনী লোকেদের হয়ত প্রয়োজন হবে তার হাতের তৈরী জিনিসপত্র।

স্ত্রীর কাছে বিদায় নেওয়ার সময় বলল:

'প্রিয়তমা, তিন বছরের জন্য আমি বিদেশে যাচ্ছি। তুমি কি আমাকে মনে রাখবে? আমাদের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদে তুমি অবিশ্বাসিনী হবে না তো?'

তার স্ত্রী নীচু হয়ে মাটি থেকে তুলে নিল একটা নীল ফুল। ফুলটা সে স্বামীর হাতে তুলে দিল এই বলে:

'প্রিয় আমার! এই ফুলটা নিয়ে তুমি তেমনই যতনে রাখবে যেমন আমি রক্ষা করব তোমার স্ত্রী হিসেবে আমার মর্যাদা। যেখানেই তুমি থাক না কেন, যতই পথ অতিক্রম কর না কেন, জানবে এই ফুলটা যতদিন বিবর্ণ হয়ে যাবে না, তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও ততদিন অম্লান হয়ে থাকবে...'

রাজধানীতে এসে পেঁছে কামার এক চাখানায় ঢুকল চা খেয়ে পথের ক্লান্তি কাটাবে বলে। অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেখানে বসেছিল ভাল পোশাকআশাকপরা তিনজন পুরুষমানুষ, কোনো কথা বলছিল না তারা, খাবার-দাবার কিছুই ছুঁচ্ছিল না, তাদের মনে যেন কোন গভীর উৎকণ্ঠা জমে আছে। অজানা লোকটিকে সেখানে ঢুকতে দেখে সেই তিনজন তার দিকে এমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যে অস্বস্তি লাগল কামারের।

'আপনারা আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন, হুজুর?' বলল কামার। 'আমি গরীব কিন্তু সৎ লোক। অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি রোজগারের আশায়। আমি পেশায় কামার, আমাকে কোন কিছু তৈরী করতে দিলে জীবনেও কখন পস্তাতে না।'

সেই তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করল, তারপর তাদের মধ্যে যে বয়সে সবচেয়ে বড়, সে কামারকে কাছে ডেকে বন্ধুত্বপূর্ণস্বরে বলল:

'আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোন হে, কামার! আমরা তিনজন এ রাজ্যের উজীর, চাখানার মালিককে সেকথা জানাতে চাই না আমরা। বাজার, সরাইখানা, চাখানা আর যেখানে অনেক লোক জড় হয় সেসব জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজেই, ফূর্তি করা বা কৌতূহলবশত নয়। খান আমাদের আদেশ দিয়েছেন তাঁর জন্য সোনারূপো দিয়ে এক প্রাসাদ তৈরী করে দিতে; যদি তাঁর আদেশ আমরা পূরণ করতে পারি তো আমাদের পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর যদি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাসাদ নির্মিত না হয় তাহলে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে। খুবই বিপদে পড়েছি আমরা, সময় এগিয়ে চলেছে কিন্তু আমরা গোটা রাজধানী ঘুরে এমন একজন দক্ষ কারিগরকে পেলাম না যে এমন একটা অসাধারণ কাজ হাতে নেওয়ার সাহস করবে। তুমি যদি আমাদের কোনরকম সাহায্য করতে পার কাজটা না করলেও পরামর্শ দিয়ে অন্তত!'

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কামার বলল:

'উজীরমশাই, আমার ভাগ্যই এই চাখানার দরজা খুলে দিয়েছে। যত সোনারূপোর দরকার আমাকে দিন আর চাই সত্তরজন সাহায্যকারী, আমি যথাসময়ে তৈরী করে দেব এমন এক প্রাসাদ যা কোন দেশের কোন খানেরই ছিল না কখনও।'

সেইদিনই কাজ আরম্ভ করে দিল কামার। হাপরের আগুন উঠল, দামী ধাতুর ওপর হাতুড়ির ঠনঠন শব্দ শোনা গেল, ব্যস্ত কর্মচারীরা এদিকওদিক ছুটোছুটি করে প্রধান কারিগরের নির্দেশ পালন করতে লাগল। নির্দিষ্ট দিনে প্রাসাদ তৈরী হয়ে গেল। আর কোথাও এর আগে কখনও এমন অপূর্ব প্রাসাদ দেখা যায় নি, যে সোনারূপো দিয়ে প্রাসাদের ছাত-দেওয়াল তৈরী সেগুলিও প্রাসাদের সৌন্দর্যের কাছে কিছুই নয়।

যখন খান দেখলেন নতুন প্রাসাদ, আনন্দে ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে উঠলেন আর তখনই উজীরদের পুরস্কার দেবার আদেশ দিলেন। তারপর বললেন:

'এমন অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি যে করেছে সেই কারিগরকে আমি দেখতে চাই।'

কামারকে যখন নিয়ে আসা হল তখন খান তাকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলেন আর এমন কথা বললেন যা এর আগে আর কেউ তাঁর মুখ থেকে শোনে নি।

'আজ থেকে তুমি হবে আমার প্রধান উজীর ও বন্ধু,' বললেন তিনি, 'আমি চাই না যে আমার অধীনস্থ কেউ বা অন্য দেশের কোন রাজা তোমার এই প্রতিভাকে কাজে না লাগায়। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এই চমৎকার প্রাসাদে আর কাজ করবে কেবল আমার জন্য!'

ওদিকে সেই তিন উজীর, যদিও কামার তাদের জীবন বাঁচিয়েছে আর তার জন্যই বড়রকমের

পুরস্কারও পেয়েছে তারা, তবুও কামারের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ জাগল তাদের মনে; তারা ভাবতে লাগল কামারকে শেষ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপযশ রটিয়ে।

কামার থাকতে লাগল প্রাসাদেই। প্রতিদিনই সে খানের জন্য তৈরী করে নিয়ে আসে এক একটি আশ্চর্য জিনিস, আর প্রতিটি জিনিসই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে আগেরটিকে হার মানায়। যত বেশী করে খান আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কামারের প্রতি, উজীরদের বিদ্বেষ ততই বাড়ে, সরলমনা কামারকে প্রতিপদে অনুসরণ করতে লাগল তারা; শীঘ্রই তারা লক্ষ্য করল যে কামার মাঝেমাঝে জামার পকেট থেকে একটা নীলরংয়ের ফুল বার করে অনেকক্ষণ ধরে দেখে, অল্প একটু ঠোঁট নাড়িয়ে মমতাভরে চুমো দেয় সেটাকে, তারপর আবার সাবধানে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে সেটাকে।

খানের কাছে গিয়ে তারা জানাল:

'ও শক্তিমান খান! আপনার প্রিয়পাত্র কামার ডাইন, জাদুকর। একটা জাদু ফুলের সাহায্যে প্রাসাদ তৈরী করে সে আপনার ভালবাসা অর্জন করেছে, ফুলটাকে সে লোকচক্ষের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। আমাদের সন্দেহ শয়তান আপনার বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধি করছে।'

খান ছিলেন বদরাগী ও সন্দেহপ্রবণ। কামারকে তক্ষুনি ডেকে পাঠাবার আদেশ দিলেন তিনি আর যখন সে এল, প্রচণ্ড রাগে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কি ফুল ওটা তুই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখিস বুকের মধ্যে? যদি বাঁচতে চাস খুলে বল্!'

কামার বুঝল কে তার গোপনকথা ফাঁস করে দিয়েছে, ফুলটি বার করে সরলমনে খানকে বলল তার সুন্দরী স্ত্রীর কথা আর তাকে বিদায় জানাবার সময় স্ত্রী যে কথাগুলি বলেছিল সেকথা।'

'শয়তানের এত সাহস হুজুরের কাছে মিথ্যা বলছে।' তার কথায় বাধা দিল প্রধান উজীর। 'আমরা ভাল করেই জানি ওর স্ত্রী ওকে অনেকদিনই ভুলে গেছে, এখনই আর কাউকে হাতের কাছে পেলে আবার বিয়ে করবে। টাকাপয়সা, উপহার দিয়ে মন ভোলান যায় না এমন কোন মেয়েছেলেই হয় না। শক্তিমান খানের হুকুম পেলে একথা প্রমাণ করে দেব আমি।'

খান বললেন:

'প্রমাণ কর।'

প্রধান উজীর প্রমাণ নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত কামারকে কোন শাস্তি না দিয়ে তার ওপর প্রহরা বসাতে আদেশ দিলেন। প্রধান উজীর রওনা দিল সেই শহরের উদ্দেশ্যে যেখানে কামারের স্ত্রী থাকে, এক বদমাস লোকের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে অর্থ দিয়ে তাকে বশ করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানাল।

লোকটি বলল:

'কামারের স্ত্রীর মত নিষ্পাপ আর প্রেমময়ী স্ত্রী শুধু এ শহরে কেন সারা দুনিয়াতেও আর একটি নেই। জালমাউজ-কেম্পীরই কেবল তোমায় সাহায্য করতে পারে।' একটুও দেরী না করে ডাইনীবুড়ীকে সে তখুনি নিয়ে এল প্রধান উজীরের কাছে।

জালমাউজ-কেম্পীর নাকীসুরে বলল:

'যদি তুই আমায় হাজারটা মোহর দিস তবে সবরকম চালাকি করে দেখব যাতে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

হাজারটা মোহর পেয়ে জালমাউজ-কেম্পির তার অর্ধেকটা নিজে নিল আর বাকী অর্ধেকটা কামারের স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল:

'ওরে মেয়ে, তোর স্বামী দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোর কথা একেবারেই মনে করে না দেখছি। একজন ভাল লোক যে তোকে খুব ভালবাসে, এই অর্থ তোকে পাঠিয়েছে তোর হাতখরচের জন্য। ভাল বংশের লোক সে, ধনী, যদি তুই তার সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলিস তো সে তোকে সুখী করার জন্য সোনায় মুড়ে দেবে।'

কামারের স্ত্রী বলল:

'তোমার কি ভাল মন গো বুড়ী। ঐ লোকটিকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এস। আমার দরজা খোলা থাকবে। তুমি ওকে পথ দেখিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ী চলে যেও। আমি তাকে উচিতমতই অভ্যর্থনা জানাব।'

বুড়ী উজীরের কাছে গিয়ে বলল:

'কামারের বউ তো টাকাটা একেবারে লুফে নিল। রাজী আছে ও। আজ সন্ধ্যাবেলায় তুই ওর কাছে যাবি। এবার আমার পারিশ্রমিক দে দেখি।'

এই সাফল্যে প্রধান উজীর এত খুশী হল যে বুড়ীকে একমুঠো মোহর দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে উজীর কামারের বউয়ের বাড়ী গেল। সুন্দরী মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা জানাল অতিথিকে, চুলার কাছে তাকে বসিয়ে তার সামনে সাজিয়ে দিল বিভিন্ন আহার্যদ্রব্য কুমিস, মাংস, মিষ্টি। উজীর বেশ আয়েস করে বসে যেই খাবারের দিকে হাত বাড়াতে যাবে অমনি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেবার আওয়াজ শোনা গেল।

'ও কিসের আওয়াজ ?' ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল উজীর।

কামারের স্ত্রী ভাল করেই জানত ওটা কিসের আওয়াজ, দিনের বেলাতেই সে স্বামীর হাতুড়িটা দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছে, রাতের হাওয়ায় দোলা লেগে সেটা এখন দরজায় ঠোকা লেগে আওয়াজ তুলছে। কিন্তু এখন সে মুখেচোখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে, নিরুপায়ের ভঙ্গীতে হাত ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে বলল:

'হে সম্মানিত অতিথি, এ নিশ্চয়ই আমার ভাই এসেছে। ও বেশীক্ষণ থাকবে না। ততক্ষণ তুমি পাশের ঘরে লুকিয়ে থাক।'

বলে পাশের ঘরের দরজা খুলে ধরল অতিথির সামনে।

যেই উজীর সেই ঘরের দরজাটা পেরিয়েছে তাকে এক ধাক্কা দিল কামারবৌ আর সে গিয়ে পড়ল এক গভীর অন্ধকার গর্তের মধ্যে। আর কামারবৌ হা-হা করে হাসতে লাগল ওপরে।

সেই মুহূর্তে প্রহরাধীনে থাকা কামার নীলফুলটা বার করে দেখতে লাগল: সেটা তাদের

বিচ্ছেদের দিনে যেমন তাজা আর সুগন্ধী ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। মমতাভরে ফুলটিকে চুমো দিল সে।

পরের দিন কামারবৌ গর্তের মধ্যে একগাদা ভেড়ার লোম ছুঁড়ে দিয়ে বন্দীকে আদেশ দিল সেগুলোকে বাছাই করতে।

'দেখিস্ ভাল করে কাজ করিস তা নাহলে দুপুরবেলায় জনারের রুটি পাবি না!'

সেই গর্তের মধ্যে অনেকদিন ধরে বসে কাজ করে উজীর, আর দুপুরবেলায় একটা করে জনারের রুটি পায়। ওদিকে খান তার অপেক্ষায় আছেন, অপেক্ষা করে করে বিরক্তি ধরে গেল তাঁর।

দ্বিতীয় উজীরকে তিনি বললেন:

'তোমার বন্ধু দেখছি কিছুই করে উঠতে পারে নি, তাই জন্যই আমার সামনে মুখ দেখাতে সাহস পাচ্ছে না। কামারের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে থাকলে তোমাদের কপালে দুঃখ আছে।'

ভয়ে আধমরা হয়ে উজীর বলল:

'ও শক্তিমান খান! আমরা আপনাকে সত্যকথাই বলেছি। আদেশ করুন — আমি প্রমাণ করে দেব।'

খান বললেন:

'ঠিক আছে! যাও!'

কিছুদিন যাবার পরে প্রথম উজীরের ভাগ্যে যা ঘটেছিল দ্বিতীয় উজীরের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটল। শুধু শুধু অর্থব্যয় করে সেও গিয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে। গর্তে বসে ভেড়ার লোম বাছতে থাকা লোকটিকে ভাল করে দেখতে লাগল সে।

'কে তুমি?' দ্বিতীয় উজীর জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি কে?' প্রথম উজীর জিজ্ঞাসা করল।

পরস্পরকে চিনতে পেরে তারা ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে দিল, তাদের এমন অবস্থার জন্য পরস্পরকে দোষ দিতে লাগল। আর কামারবৌ ওদিকে তাদের ঝগড়া শুনে হা-হা করে হাসতে লাগল। তারপর গর্তের মধ্যে একটা চরকা নামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় উজীরকে হুকুম দিল ভেড়ার লোম দিয়ে পশম তৈরী করতে।

'দেখিস্ ভাল কাজ না হলে দুপুরে জনারের রুটী পাবি না!'

ওদিকে কামার ঠিক তখনই নীলফুলটা বার করে দেখল সেটা আগের মতই তাজা আর সুগন্ধী আছে।

আর খান দ্বিতীয় উজীরের ফেরার অপেক্ষা না করে তৃতীয়জনকে পাঠালেন কামারবৌয়ের কাছে।

'যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরে না আস তাহলে তোমার আর সেই দুই শয়তানের ফাঁসি-কাঠ থেকে নিস্তার নেই।'

তৃতীয় উজীর বিপদ বুঝতে পারল, তাই বিষণ্ণ-হতাশ মনে রওনা দিল, শীঘ্রই সেই গর্তে

সেও তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হল। তিনজনই পরস্পরকে দোষ দিতে লাগল তাদের ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটার জন্য। আর কামারবৌ ওপরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

নতুন বন্দীকে দেওয়া হল একটা তাঁত:

'তিনসপ্তাহের মধ্যে আমাকে একটা সুন্দর গালিচা বুনে দিবি। একটুও ঢিলে না দিয়ে এখুনি কাজ আরম্ভ কর: দুপুরবেলায় জনারের রুটি পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করছে তোর ওপরই...'

একদিন খান কামারকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন।

'আমার তিন উজীর তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরে আসে নি। আমার সন্দেহ সে তাদের যাদুর বলে মেরে ফেলেছে। যদি তা সে করে থাকে তাহলে তার আর তোমারও মাথা কাটা পড়বে। কিন্তু যদি উজীররা তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে থাকে তবে আরো কঠোর সাজা পাবে তারা। আমি নিজেই যাব তোমার শহরে আর তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

কিছুদিন বাদে দলবল নিয়ে খান এসে পেঁছিলেন কামারের শহরে। নিজের বাড়ীর কাছে এসে কামার স্ত্রীকে এমন মাননীয় অতিথির আগমনবার্তা জানাবার জন্য অনুমতি চাইল আগে বাড়ীতে ঢোকার। খান অনুমতি দিলে কামার বাড়ীতে ঢুকল।

স্বামীকে দেখে কামারবৌ তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তমধ্যে তারা পরস্পরকে জানাল সেই বিচ্ছেদের পর কি কি ঘটেছিল। তারপর কামার দেহরক্ষীপরিবৃত খানকে সসম্মানে নিয়ে এল বাড়ীর মধ্যে।

নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে কামারবৌ অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল। এমন সুন্দরী সে, তার হাঁটাচলায় এমন মর্যাদা আর কথাবার্তায় এমন বুদ্ধি প্রকাশ পাচ্ছে যে খানের মনটা নরম হয়ে গেল তখুনি আর সাধারণ সেই স্ত্রীলোকের হাত থেকে আহার্য গ্রহণ করলেন তিনি।

হাতে কুমিসভর্তি পেয়ালা নিয়ে চমৎকার গালিচার ওপরে বসে খান জিজ্ঞাসা করলেন:

'বল দেখি, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমার কাছে আমার তিন উজীর একের পর এক এসেছিল কিনা?'

'মহারাজ, দীর্ঘজীবি হোন! উজীরদের স্থান তাদের প্রভুর পাশেই! কি উদ্দেশ্যে তারা আসতে পারে দরিদ্র নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকের ঘরে?'

চুপ করে গেলেন খান, আর নিজের অপ্রতিভভাব ঢাকার জন্য গালিচার জটিল নক্সাটা দেখতে লাগলেন।

'এমন দামী গালিচা তুমি কোথায় পেলে?'

'আমার দাসীরা এটা বুনেছে, মহারাজ।'

ভ্রূ কপালে উঠল খানের।

'দাসী? তোমার স্বামী তো আমাকে বলেছে যে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে গেছে তোমায়। দাসী রাখার মত অর্থ কোথায় পেলে তুমি?'

'আমার দাসীরা অর্থ চায় না। আমি যা বলি সব তারা করে, দিনে একটি করে কেবল জনারের রুটির পরিবর্তে।'

'অবিশ্বাস্য।' ভ্রূ কোঁচকালেন খান।

'মহারাজ, এখনই আপনাকে দেখাব আমার দাসীদের। ওরাও আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে।' বলে সে পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

গর্ত থেকে তিন উজীরকে বার করে এনে ফিসফিস করে কামারবৌ বলল:

'আমার স্বামী ফিরে এসেছে — সর্বনাশ! তোমাদের এবাড়ীতে দেখলেই হয়ে গেল। আমি তোমাদের শাস্তি দিতে চেয়েছি কেবল তোমাদের ধৃষ্টতার জন্য, কিন্তু তোমাদের মৃত্যু চাই নি। এই নাও ক্ষুর, গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি, আর এই আমার কতগুলো পুরনো পোশাক, দেরী না করে পরে ফেল এগুলো, তোমাদের আমার বান্ধবী বলে বাড়ীর বার করে দিয়ে আসব।'

কামারবৌ যা বলল কোন প্রতিবাদ না করে উজীররা তাই করল। তখন কামারবৌ তাদের হাত ধরে নিয়ে এল দেহরক্ষীপরিবৃত হয়ে বসে থাকা খানের কাছে।

সামনে কঠোর খানকে বসে থাকতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল উজীররা আর খান অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন:

'কেমন অদ্ভুত দাসী! চেহারা পুরুষের মত আর স্ত্রীলোকের পোশাকপরা। এদের মুখগুলোও যেন চেনাচেনা লাগছে। এরা কারা ?'

'এরাই আপনার কাছে আমার অপবাদ রটিয়েছে আর আমার স্ত্রীর নামে কলঙ্ক দিয়েছে। এই হল আসল ব্যাপার, হুজুর।' স্ত্রীর হয়ে কামার বলল।

তখন উজীররা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে তাদের সব দোষ স্বীকার করল।

মনে প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে শুনতে লাগলেন খান তাদের কাহিনী কিন্তু যখন তারা কামারবৌয়ের বাড়ীতে তাদের বন্দী হওয়ার কথা বলতে লাগল তখন তাঁর ঠোঁটগুলি কেঁপে উঠল, কাঁধ নড়ে উঠল, এমন জোরে হেসে উঠলেন তিনি যে হাতের পেয়ালা নড়ে উঠে পুরো কুমিসটা তাঁর রেশমী পোশাকের উপর পড়ল। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তারপর আত্মসংবরণ করে বললেন:

'এমন মজা বহুদিন পাই নি! এই তিন বুদ্ধু যাদের আগে আমি উজীর বলে জানতাম এরা এখন থেকে আমার ভাঁড় হবে,' আর কামারকে বললেন, 'আর তুমি, আমার প্রিয় কারিগর, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার সঙ্গে রাজধানীতে যাবে আমার প্রিয় অতিথি হিসাবে। তোমাকে তোমার কাজের জন্য যোগ্য পুরস্কার দেব আমি।'

বহু বছর কেটে গেছে। খান, বদমাশ উজীর যারা পরে ভাঁড় হয়েছিল, কামার আর তার সুন্দরী স্ত্রী সবার দেহই ধূলায় মিশিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিভাবান কারিগরের গড়া সেই প্রাসাদ আজও দাঁড়িয়ে আছে, চারদিক তার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে।

সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। অমর হয়ে থেকে যায় কেবল মানুষের হাতের অমর সৃষ্টিগুলিই।
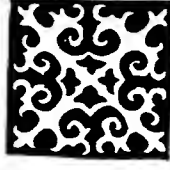
অদ্ভুত নাম

একজন লোকের তিনটি ছেলে ছিল, প্রথমপক্ষের দুটি ছেলে আর দ্বিতীয়পক্ষের একটি। দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেটিই সবার ছোট, নাম তার আসপান। যদিও আসপান বুদ্ধিমান, দয়ালু আর নরম স্বভাবের ছিল, কিন্তু তার বড় ভাইয়েরা ছোটবেলা থেকেই সহ্য করতে পারত না তাকে। তাদের অত্যাচার, চড়-চাপড়, বিদ্রূপ অনেক সইতে হয়েছে ছোট ভাইকে, লুকিয়ে কেঁদেছে সে, কিন্তু বাবাকে কখনও নালিশ করে নি, ভাইদের ক্ষতি করতে সে কখনই চায় নি।

দিন যায়, মাস যায়, ছেলেদের বয়স বাড়ে, বাবাও ক্রমশঃ বৃদ্ধ হতে থাকে। বাবার মৃত্যুর পরে বাবা যা রেখে গিয়েছিল তা বড় দুই ভাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল আর ছোট ভাইকে দিল কেবল একটা কালো ইয়ুরতা* আর কয়েকটা ভেড়া।

আসপান ভাইদের সঙ্গে তর্ক-বিবাদ করতে চাইল না।

'দিন চলে যাবে আমার,' মনে মনে ভাবল সে, 'সুস্থ বিবেকবুদ্ধির দাম ধনসম্পদের থেকেও অনেক বেশী...'

কিছুদিন বাদে একটি গরীব মেয়েকে মনে ধরল আসপানের, তাকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকতে লাগল।

বছর কাটল। একদিন বড় ভাইয়েরা ছোট ভাইকে ডেকে বলল:

'আমাদের কাছে খবর এসেছে যে রাজধানীতে ষাঁড়ের দাম খুব বেড়ে গিয়েছে। আমাদের ষাঁড়গুলোকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করব আমরা। ষাঁড়গুলোকে নিয়ে যেতে সাহায্য কর তুই আমাদের। যদি বিক্রীপাটা ভাল হয়, তোকে আমরা একটা ঘোড়া দেব তাহলে।'

'তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ ভাইয়েরা,' বলল আসপান, 'কিন্তু আমি কোন পারিশ্রমিক না পেলেও তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'খুব ভাল কথা,' চোখ টেপাটেপি করল বড় দুই ভাই নিজেদের মধ্যে। 'তুই পারিশ্রমিক নিতে চাচ্ছিস না তো আরো ভাল কথা। বাবা তো সবসময়ই তোর দয়ালু হৃদয়ের প্রশংসা করতেন। তৈরী হয়ে নে। ভোরবেলাতেই রওনা দেব।'

---

* ইয়ুরতা — তাঁবু।

ভোরবেলায় আসপান স্ত্রীর কাছে বিদায় নিল। স্ত্রী তাকে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেলল, বলল:

'যাত্রা শুভ হোক তোমার। ভালয় ভালয় ফিরে এস। যখন ফিরে আসবে তোমার অপেক্ষায় দোলনায় শুয়ে থাকবে আমাদের প্রথম সন্তান।'

পথে ষাঁড়গুলোকে নিয়ে প্রচণ্ড খাটনি হল আসপানের, ভাইয়েরা তো সেইজন্যই তাকে সঙ্গে নিয়েছে যাতে নিজেদের খাটনি আর ঝামেলা কম হয়। কিন্তু যখন তার স্ত্রীর কথাগুলো মনে আসছিল তাদের সন্তান সম্বন্ধে, সমস্ত ক্লান্তি তার দূর হয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে, মনে হচ্ছিল সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক।

রাজধানীতে এসে পেঁছাল তারা। বাজারের কাছে একটা খোঁয়াড় ভাড়া করে সেখানে ষাঁড়গুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেরাও সেখানে থাকার সব বন্দোবস্ত করতে লাগল। যেই তাদের ঘুমোতে যাবার ব্যবস্থা সব করা শেষ হয়েছে, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল, খানের দেহরক্ষীদল এসে পেঁছল খোঁয়াড়ে।

তাদের দলনেতা বলল, 'এই ব্যাপারীরা, তোমাদের ষাঁড়গুলোকে এখানে রেখে আমাদের সঙ্গে চল। খান তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বড় ভাই দু'জনের ভয়ে হাতপা জমে গেল, ছোট ভাই তাদের বুঝাল:

'আমরা তো খারাপ কাজ কিছু করি নি। খান কিছু বলবেন না আমাদের। তাঁকে কেবল যথাযোগ্য সম্মান দেখাবে আর তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে বুদ্ধি করে।'

যখন তাদের খানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি বেশ সহৃদয়ভাবেই তাদের গ্রহণ করলেন কোনরকম রুক্ষতা ছাড়াই বললেন:

'প্রতি ঋতুর আছে নিজস্ব ফল, প্রতি এলাকায় নিজস্ব রীতি। আমাদের এখানের রীতি হল: যে কোনো ব্যাপারীই যে কোনো জিনিস নিয়েই সওদা করতে আসুক না কেন তাকে খানের সামনে দাঁড়িয়ে খানের বলা ধাঁধার উত্তর দিতে হয়। যে ঠিক উত্তর দেয় সে পুরস্কার পায় আর এখানে সওদা চালানোর অনুমতি পায়। আর যে ঠিক উত্তর দিতে পারে না তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য তৈরী হও তোমরা।'

'হয়ে গেল আমাদের!' ফিসফিস করে বলল বড় দুই ভাই।

'আমার ওপর নির্ভর করতে পার,' অস্ফুটস্বরে ছোট ভাই বলল।

'তিনটি ধাঁধা বলছি, প্রথমে বড় ভাই, তারপরে মেজ ভাই, তারপর ছোট ভাই এইভাবে উত্তর দেবে।' খান বললেন। 'প্রথম ধাঁধা: 'ঘোড়ার থেকে উঁচু, কুকুরের থেকে নীচু' — কি সেটা? দ্বিতীয় ধাঁধা: 'জীবন্ত থেকে জন্মায় মৃত, মৃত থেকে জন্মায় জীবন্ত' — কি সে জিনিস? তৃতীয় ধাঁধা: 'একটি বাসায় চল্লিশটি বাজপাখী' — কি সেটা?'

বড় ভাই দু'জন যতক্ষণে কপাল কুঁচকে চোখ পিটপিট করছিল ছোট ভাই এগিয়ে গিয়ে বলল:

'অনুমতি দিন বাদশাহ্, আপনার সব ধাঁধারই উত্তর তৈরী।'

'অসম্ভব !' বিস্মিত হলেন খান।

আসপান বলল:

'ঘোড়ার থেকে উঁচু, কুকুরের থেকে নীচু' — এ হল ঘোড়ার জিন, তাই না, হুজুর ? 'জীবন্ত থেকে জন্মায় মৃত' — এ হল পাখীর ডিম, আর 'মৃত থেকে জন্মায় জীবন্ত' — হল পাখীর ছানা। 'একটি বাসায় চল্লিশটি বাজপাখী' — হল তীরভরা তূণীর।'

'ঠিক বলেছ !' চীৎকার করে বললেন খান। 'যদি তুমি আমার আরো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তো দামী উপহার পাবে আমার কাছে।'

'বলুন, হুজুর !' বলল আসপান।

'কোন পাথর সব থেকে ভারী ?' জিজ্ঞাসা করলেন খান।

'যে পাথরটা আমাদের মাথায় পড়ে, হুজুর।'

'ঠিক। আর পৃথিবীতে কোন বস্তুর ধার তরোয়ালের থেকেও বেশী ?'

'জিভ তরোয়ালের চেয়েও ধারাল।'

'ঠিক। এমন কি জিনিস আছে পৃথিবীর কোন লোকই জানে না ?'

'কেউ, এমনকি সব থেকে জ্ঞানী পণ্ডিতরাও জানেন না পরমুহূর্তে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে।'

খান সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে রইলেন আসপানের দিকে।

'তোমার প্রখর বুদ্ধি। জানতে ইচ্ছে হয় কোথাকার লোক তুমি, নাম কি, হয়ত তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে।'

আসপানের উত্তর শোনার পর খান প্রধান উজীরকে আদেশ দিলেন তাকে একথলি মোহর দেবার জন্য, আর বড় ভাই দু'জনকে বললেন:

'যদিও ধাঁধার উত্তর দেওয়া তোমাদের বুদ্ধিতে কুলায় নি, তবুও তোমাদের ছোট ভাইয়ের কারণে ষাঁড় বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত রাজধানীতে থাকতে অনুমতি দিলাম তোমাদের।'

ভাইয়েরা কৃতজ্ঞতা জানাল, খানের সৈন্যরা তাদের পেঁছে দিয়ে এল খোঁয়াড় পর্যন্ত, তাদের ষাঁড়গুলো বসে বসে জাবর কাটছে তখন। তিন ভাইয়ের কারুরই সারারাত ঘুম এল না চোখে: ছোট ভাইয়ের — আনন্দে যে খানের সুনজরে পড়েছে সে, আর বড় দুই ভাইয়ের মন ছোট ভাইয়ের প্রতি হিংসায় জ্বলছে যে খান তাকে উপহার দিয়েছেন, তার বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন তাই তারাও ঘুমোতে পারছে না।

সকালবেলায় বাজার শুরু হল। অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইয়েরা বেশ চড়া দামেই সব ষাঁড়গুলি বিক্রী করে দিয়ে, রওনা দিল ফিরে যাবার জন্য।

শহরের বাইরে জনহীন মাঠের মধ্যে এসে তারা বিক্রীকরা টাকা ভাগ করতে বসল। ছোট ভাই তাদের বলল:

'আমাদের তিনজনের অর্থের পরিমাণ যাতে সমান সমান হয় তার জন্য আমি মোহর যতটা দরকার দিতে চাই তোমাদের।'

বড় ভাইয়েরা কোন ইতস্তত: না করেই সে মোহর নিল কিন্তু ভাইয়ের উদারতা তাদের লোভকে তৃপ্ত করল না, বরং আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের ইচ্ছে হল খানের দেওয়া থলিতে যত মোহর ছিল সবগুলো নিয়ে নিতে।

চলতে চলতে ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে তারা শলাপরামর্শ করতে লাগল:

'আসপানকে মেরে ফেলাই ভাল, বলব আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন সাপে কামড়ায় ওকে। সাক্ষী তো নেই, কে আর আমাদের সন্দেহ করবে?' ছোরা হাতে নিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এল আসপানের কাছে।

আসপান ছোরাহাতে ভাইদের দেখে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য বলতে লাগল।

'ভাইয়েরা, আমার রক্ত দিয়ে কি হবে তোমাদের? আমার সব অর্থ নিয়ে নাও, কিন্তু প্রাণে মেরো না আমাকে। আমার ইয়ুরতা অন্ধকার করে দিও না...'

কিন্তু বদমাশগুলো তার প্রার্থনার উত্তরে বিদ্রূপ করে বলল:

'ছেড়ে দিই আর কি! আমরা তোকে ছেড়ে দিলেই তুই গিয়ে খানকে সব বলে দিবি। খান আমাদের মাথা কেটে ফেলার হুকুম দেবেন তোর কথা শুনে আর আমাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি তুই পাবি তখন। তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি থাকলেও আমাদের ঠকাতে পারবি না।'

নিরাশ হয়ে ছোট ভাই বলল:

'ঠিক আছে তোমাদের মনে যদি এতটুকু দয়ামায়াও না থাকে তো মেরে ফেল আমায়। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধটা অন্তত রক্ষা কর।'

'কি অনুরোধ?'

'ফিরে গিয়ে যদি তোমরা দেখ যে আমার ছেলে হয়েছে তো আমার স্ত্রীকে বলবে ছেলের নাম যেন রাখে 'বাঁচাও'। এ আমার মৃত্যুপূর্বের ইচ্ছা...'

হা-হা করে হেসে উঠল ভাইয়েরা:

'এমন অনুরোধ রাখলে কোন ক্ষতি হবে না আমাদের। কথা দিচ্ছি তোর কথাগুলো ঠিক ঠিক বলব তোর স্ত্রীকে।'

বলে ভাইয়েরা আসপানের বুকে ছোরা বসিয়ে দিল...

দশবছর কাটল। খানের বয়স বেড়েছে কিন্তু শক্তি-উৎসাহ যথেষ্টই আছে এখনও। তাঁর প্রধান উজীর ওদিকে একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কাজে বা পরামর্শে কোনভাবেই আর সাহায্য করতে পারেন না। খানের মনে পড়ল সেই জ্ঞানী যুবকটির কথা যে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের, সমস্ত ধাঁধার উত্তর দিয়েছিল, স্থির করলেন তাকেই প্রাসাদে এনে প্রধান উজীর করবেন।

ঘোড়া সাজাতে আদেশ দিলেন খান, তারপর অসংখ্য অনুচর নিয়ে স্তেপের মধ্য দিয়ে রওনা দিলেন সেদিকে, যেখানে আসপানরা থাকে বলে তাঁর ধারণা। বহুদিন ধরে খোঁজাখুঁজি

করতে লাগলেন তাঁরা। একদিন তাঁরা এক গ্রামের কাছাকাছি এসে শুনতে পেলেন একটি মেয়ের চীৎকার:

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

'চল সবাই!' চাবুক হাঁকিয়ে বললেন খান। 'ওদিকে কোন মেয়ে বিপদে পড়েছে। সাহায্য করতে হবে।' জোর ঘোড়া ছোটালেন তিনি।

সেই স্ত্রীলোকটি সামনে হঠাৎ খানকে আর অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহীদের দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মুখে হাত ঢাকল। খান মিষ্টিসুরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কি হয়েছে তোমার? বাঁচাও বলে চীৎকার করছিলে কেন? কে তোমার কি ক্ষতি করেছে?'

আত্মসংবরণ করে স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল:

'হুজুর, কেউ আমাকে কিছু করে নি। বাঁচাও — আমার ছেলের নাম। অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে চলে গেছে সে, খাবার সময় হয়েছে এদিকে, তাই ডাকছি ওকে...'

বিস্মিত হলেন খান:

'কি অদ্ভুত নাম! এই প্রথম শুনলাম। তোমার আর তোমার স্বামীর ছেলেকে এমন অদ্ভুত নাম দেবার ইচ্ছা হল কেন?'

স্ত্রীলোকটি খানকে বলল যে দশবছর আগে তার স্বামী দুই ভাইয়ের সঙ্গে রাজধানীতে যায় কাজে, ফিরে আসার পথে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর আগে সে অনুরোধ করে যেন তার ছেলের নাম রাখা হয় 'বাঁচাও'।

চিন্তায় ডুবে গেলেন খান, তাঁর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল।

'তোমার স্বামীর নাম কি বল তো দেখি? আসপান নয় তো?'

'হ্যাঁ, তার নাম আসপান,' বলল স্ত্রীলোকটি।

'বুঝেছি!' উত্তেজিতভাবে বললেন খান। 'বুদ্ধিমান সৎ ছেলেটির মৃত্যু সাপের বিষে হয় নি, হয়েছে মানুষের বিদ্বেষে। ছেলের বাঁচাও নাম দিতে বলে সে শেষ মুহূর্তে তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুরই খবর পাঠিয়েছে। আর এবার বল দেখি খুনী ভাইয়েরা আসপানের মোহরগুলো তোমাকে দিয়েছে?'

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্ত্রীলোকটি।

'বোকা মেয়েমানুষকে মাফ করবেন হুজুর, আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। কখনই আমাদের কানাকড়িও ছিল না আর এখন তো কথাই ওঠে না। শ্বশুরের কাছ থেকে পাওয়া গরুর শেষটাকেও আমার থেকে নিয়ে নিয়েছে স্বামীর ভাইয়েরা।'

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন খান।

'নিয়ে এস খুনীদের!'

তাই দু'জনকে ধরে আনা হল। তারা বুঝল মিথ্যা, ছল দিয়ে আর কোন কাজ হবে না তাই সমস্ত দোষ স্বীকার করল।

খান আদেশ দিলেন খুনী দু'জনকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে মাথা কেটে ফেলা হোক

যেখানে তারা আসপানকে মেরেছে, আর সমস্ত কিছু যা তারা আসপানের থেকে নিয়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হোক তার বিধবা স্ত্রীকে।

এমন সময় বাঁচাও ছুটে এল তার মা'র কাছে। মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল সে, কিন্তু খান তাকে কাছে ডাকলেন, তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

'বাঁচাও, তুই ধাঁধার উত্তর দিতে পারিস?'

'পারি,' সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল ছেলেটি।

'তাহলে বল দেখি 'রঙীন দড়ির ফাঁস এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে গিয়ে লাগল' — কি সেটা?'

'রামধনু!' চিন্তা না করেই উত্তর দিল ছেলেটি।

খানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মৃদু হেসে বললেন:

'সাবাস! বাপ কা বেটা! আমার সঙ্গে যাবি তুই। লেখাপড়া শিখবি, কাজ করবি আমার কাছে। আর যখন বড় হয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান শিখবি তখন তোকে উজীর করব আমি।'

বাঁচাও মা'র গায়ে লেপটে থেকে বলল:

'হুজুর, আপনার অনুচরের তো কমতি নেই, আপনার উজীর হবার জন্য আমাদের দেশে একটা ভিখারীছেলের থেকে বেশী বুদ্ধিমান আর কেউ নেই নাকি? আর আমার মা'র একজনই অনুচর, একজনই পরামর্শদাতা, আমার বাবার মৃত্যুর পরে একজনই রক্ষাকর্তা, সে — আমি। আমাকে আমার মা'র কাছে থাকতে অনুমতি দিন!'

ছেলেটির কথার কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না খান।

তিন ভাইয়ের কাহিনী

অনেকদিন আগে এক সদাচারী জ্ঞানী লোক ছিল। তার তিন ছেলে ছিল। লোকে বলে: শিকারীর ছেলে তীরে শান্ দেয়, দর্জির ছেলে কাপড় কাটে। জ্ঞানী লোকটির ছেলেরা ছোট বয়স থেকেই বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়েই সময় কাটায়। তাদের মধ্যে বড় যে ভাই সে তখনও ঘোড়ায় উঠে বসতে পারে না আর ইতিমধ্যে বিচার, পরামর্শ করার জন্য লোক আসে ভাইয়েদের কাছে।

একদিন তাদের কাছে দু'জন লোক এল দুটি উট আর একটি উটের বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে।

তারা বলল:

'আমাদের দু'জনেরই একটি করে উট আছে। উটদুটি সর্বদাই একসঙ্গে চরত মাঠে। কয়েকদিন আগে ওদের ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখি দুটি সদ্যজাত উটশিশু, একটি জীবিত, অপরটি মৃত। এখন আমরা বুঝতে পারছি না উটশিশুটি কার, কোন উটটির বাচ্চা সে। দুটি উটই বাচ্চাটিকে সমানভাবে আদর করে খাওয়ায় আর বাচ্চাটিও দুটি উটের প্রতি সমান আকৃষ্ট।'

বড় ভাই বলল:

'উটগুলোকে নদীর ধারে নিয়ে যাও।'

মেজ ভাই বলল:

'বাচ্চাটাকে ডোঙায় করে নদীর অন্য তীরে নিয়ে যাও।'

ছোট ভাই বলল:

'তাহলেই তোমাদের সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যাবে।'

ছেলেগুলি যা বলল তেমনই করা হল।

অপরপারে উটশিশুটি ভয়ে ছটফট করতে করতে করুণ চীৎকার করে উঠল। উটগুলিও অধীর হয়ে চীৎকার করতে লাগল। একটি উট অস্থির হয়ে নদীর তীর বরাবর ছুটোছুটি করতে লাগল আর অন্যটি নদীর খাড়া পাড় বেয়ে জলে নেমে এল, তারপর জল পেরিয়ে উটশিশুটির কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখনই সবাই বুঝল ঐ উটটিরই বাচ্চা।

এই অসাধারণ ছেলেদের অপূর্ব বুদ্ধির কথা লোকের মুখেমুখে সারা স্তেপে ছড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধ জ্ঞানীও অত্যন্ত সুখী ও গর্বিত ছেলেদের নিয়ে।

দিন যায়। বাবার বয়স বাড়ে, ছেলেরাও বড় হয়। যখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠল জ্ঞানী তাদের ডেকে বলল:

'দীর্ঘদিন বাঁচলেই জ্ঞানার্জন করা যায় না, তার জন্য অনেক দেখা দরকার। সোনার প্রকৃত দাম কে জানে? ধনী নয়, জানে স্বর্ণকার। খাদ্যের গুণ কে জানে? যে খেল, সে নয়, যে তা তৈরী করেছে সে জানে। কে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারে? যে সে পথে যাবার উদ্যোগ করছে সে নয়, যে সেই পথ পেরিয়ে এসেছে সেই। বইপত্র রেখে দিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়, জ্ঞানের সব থেকে বড় উৎস জীবনের বইটাকে পড়ে নাও।'

বাবা ছেলেদের আশীর্বাদ করল, আর তারা দীর্ঘদিনের সফরে রওনা হল।

একদিন তারা পৃথিবীর হাজার পথের একটি দিয়ে যাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

বড় ভাই বলল:

'একটা ক্লান্ত উট একটু আগে এই পথ পেরিয়ে গেছে।'

মেজ ভাই বলল:

'হ্যাঁ, উটটার বাঁচোখ কানা।'

ছোট ভাই বলল:

'ওর পিঠে চাপান আছে মধু।'

এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের সামনে এসে হাজির হল একজন উৎকণ্ঠিত লোক।

'আপনারা পথে কোন উট দেখেছেন নাকি?' জিজ্ঞাসা করল লোকটি। 'চোরেরা আমার একটা উট নিয়ে গেছে।'

'তোমার উটটা অনেক পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই নয় কি?' জিজ্ঞাসা করল বড় ভাই।

'হ্যাঁ,' বলল লোকটি।

'ওর বাঁচোখটা কানা তো?' জিজ্ঞাসা করল মেজ ভাই।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' আনন্দিত হল লোকটি।

'ওর পিঠে মধু ছিল তো?' জিজ্ঞাসা করল ছোট ভাই।

'মধু! মধু! তাড়াতাড়ি বলুন কোথায় আমার উট?'

'তা আমরা জানি না, আমরা তাকে দেখি নি।' বলল ভাইয়েরা।

বিরক্ত হল লোকটি:

'কি করে এমন মিথ্যা বলতে পারেন যে দেখেন নি, যদিও তার সম্বন্ধে আপনারা সবকিছুই জানেন? আপনারাই বোধহয় উটটাকে চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।'

এমন চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল সে যে অল্প দূর দিয়ে যেতে থাকা খানের সৈন্যদলও তা শুনতে পেল। তারা সেখানে এসে চারজনকেই ধরে নিয়ে গেল খানের কাছে।

খান জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন।

'তোমরা বলছ যে চুরিযাওয়া উটটাকে তোমরা দেখো নি, তবে কেমন করে তার মালিককে তোমরা উটের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারলে?' জিজ্ঞাসা করলেন খান জ্ঞানীর ছেলেদের।

বড় ভাই বলল:

'উটটা যে অনেক পথ হেঁটেছে তা ওর পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারি আমি: ক্লান্ত হয়ে পড়া জীব পা টেনে টেনে চলে তাই পায়ের ছাপ পড়ে লম্বা লম্বা।'

মেজ ভাই বলল:

'উটটার বাঁচোখ কানা বুঝলাম এইভাবে, যে উটটা যেতে যেতে কেবল ডানদিকের ঘাসপাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।'

ছোট ভাই বলল:

'যদি পথের ওপর দলেদলে পিঁপড়ে দেখা যায় তবে কি আর বুঝতে বাকী থাকে যে উটটা মধু বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।'

খান অবাক হয়ে গেলেন তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি আর যে আত্মমর্যাদা নিয়ে তারা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল তা দেখে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা হল আর একবার তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করার। একটা মিষ্টি বেদানাকে সবার অলক্ষ্যে রুমালে মুড়ে তিনজনকে দেখিয়ে বললেন:

'আমার হাতে কি?'

বড় ভাই বলল:

'একটা কিছু গোল জিনিস।'

মেজ ভাই বলল:

'আর খুবই সুস্বাদু।'

ছোট ভাই শেষে বলল:

'এককথায়, হুজুর, আপনার হাতে আছে বেদানা।'

খানের মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ঠিক!' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'এমন সূক্ষ্মদর্শী লোক আর কখনও দেখি নি। তোমরা বয়সে তরুণ কিন্তু আমার দাড়িওয়ালা উজীরেরাও তোমাদের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এখানে তিন দিন থেকে যাও তোমরা, পালা করে আমার লোকেদের বিচার করবে, যদি তোমাদের বিচার ন্যায়সংগত মনে হয় আমার, তাহলে তোমাদের উজীর করে নেব।'

এই কথা শুনে পুরনো উজীরদের মনে প্রচণ্ড বিদ্বেষ জাগল ঐ তিন তরুণের প্রতি, যাতে নিজেদের রোজগার, ক্ষমতা ও খানের মনোযোগ তাদের প্রতি কমে না যায় সেজন্য তারা ঐ তিন তরুণের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগল সর্বরকমের।

প্রথম দিনে বিচারের কাজ চালাল বড় ভাই। দু'জন লোককে নিয়ে আসা হল তার কাছে। একজন বলল:

'আমি গরীব মেষপালক। অভাবে পড়ে কাল আমি আমার সবচেয়ে ভাল ভেড়াটাকে কাটি, আজ সারাদিন বাজারে বসে বেচি সে মাংস। বিক্রীর সমস্ত টাকাটা আমি থলিতে ভরে রাখি, আর এই লোকটি থলিটি চুরি করেছে আমার পকেট থেকে।'

অন্যজন ক্রুদ্ধভাবে নিজের দোষ অস্বীকার করতে লাগল:

'মেষপালক মিথ্যা বলছে। আমার কাছে একটা টাকার থলি আছে, কিন্তু সেটা আমার নিজের ঠগটা শুধু শুধু আমার নামে বাজে কথা বলছে, বিচারে ও আমার টাকা জিতে নিতে চায়।'

বিচারক বলল:

'থলিটা দাও দেখি। এখুনি বলে দেব এ টাকা কার।'

খানের ভৃত্যদের আদেশ দিল সে একপাত্র ফুটন্ত জল নিয়ে আসতে। সেই জলের মধ্যে সে থলির থেকে সব মুদ্রাগুলি ফেলে দিল। মুহূর্তে জলের ওপর ভেসে উঠল চর্বির স্তর যেন ভেড়ার মাংস ফেলা হয়েছে জলে। আর কোন সন্দেহই রইল না যে মেষপালকই সত্যকথা বলেছে। বিচারক তাকে তার অর্থ ফিরিয়ে দিল আর চোরটিকে প্রহরাধীনে রাখার আদেশ দিল।

দ্বিতীয় দিনে মেজ ভাই বিচারের কাজ চালাতে লাগল।

বোঝাইকরা বস্তার মত প্রচণ্ড মোটা এক জমিদার এল এক গরীবদুঃখী লোককে জামা ধরে টানতে টানতে নিয়ে।

জমিদার বলল:

'এই ভিখারীটা কান্নাকাটি করে আমার কাছে এক সের মাংস ধার নেয়, বলে ওর নাকি ছেলে মরতে বসেছে। দিব্যি দিয়ে বলে যে এক সপ্তাহের মধ্যে দেনা শোধ করে দেবে, তা সে নিজের পায়ের থেকে কেটে দিতে হলেও। ছেলেটা ওর মরেছে বেশ ক'দিন হল, কিন্তু এই শয়তানটা কিছুতেই দিচ্ছে না মাংস বা তার জন্য দাম।'

বিচারক গরীব লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল:

'তুমি জমিদারের ধার শোধ কর নি কেন?'

'আমার কিছুই নেই,' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গরীব লোকটি বলল, 'শরৎকালের আগে আমি জমিদারের দেনা শোধ করতে পারব না।'

'কিন্তু আমি শরৎকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না!' চীৎকার করে উঠল জমিদার।

বিচারক বলল, 'তাহলে আমার বিচার হবে এরকম। জমিদার, তুমি ছুরি নিয়ে ওর পায়ের থেকে এক সের মাংস কেটে নাও। কিন্তু ঠিক এক সের! এককণাও বেশী বা কম যদি হয় তা-হলে চাবুকের দাগে তোমার সারা শরীর ভরে যাবে।'

জমিদার প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর পোশাকে পা জড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে

দৌড় লাগাল। সবাই হাসাহাসি করতে লাগল তা দেখে, আর গরীবলোকটি বিচারককে ধন্যবাদ জানাতে লাগল এমন সুবিচারের জন্য।

তৃতীয় দিনে বিচারকাজ চালাবার ভার পড়ল ছোট ভাইয়ের ওপর। দু'জন যুবক এসে উপস্থিত তার কাছে। তাদের মধ্যে চওড়াকাঁধ লম্বা যুবকটি বাদী. সে বলল:

'আমার বন্ধু আমার মোহর নিয়ে নিয়েছে।'

প্রতিবাদী বলল:

'ঐ মোহরটা আমার সৎ পরিশ্রমের রোজগার। কারুর থেকে মোহর কেড়ে নেবার কথা আমার মাথাতেই আসতে পারে না।'

বিচারক বাদীকে জিজ্ঞাসা করল:

'তোমার বন্ধু যে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কোন সাক্ষী আছে ?'

'না সাক্ষী নেই কেউ।'

বিচারক বলল, 'তাহলে, তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করা খুব সহজ নয়। আমাকে চিন্তা করতে হবে। ততক্ষণ তোমরা আমাকে লড়াই দেখিয়ে খুশী কর। যে জিতবে লড়াইয়ে সে পুরস্কার পাবে আমার কাছে।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বিচারক আর যুবক দু'জন পরস্পরের কোমরবন্ধ আঁকড়ে ধরে লড়াই আরম্ভ করল। পনেরো মিনিটও কাটল না, বাদী ইতিমধ্যে প্রতিবাদীকে তিনবার মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

বিচারক বলল, 'হয়েছে। সত্য ধরা পড়েছে, আমার রায়ও তৈরী। যে কোন লোকের কাছেই পরিষ্কার এদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী। সবার সামনেই বাদী প্রতিবাদীকে তিনবার ফেলে দিয়েছে মাটিতে। দুর্বল লোক শক্তিমানের কাছে মোহর ছিনিয়ে নিয়েছে একথা বিশ্বাস করা যায় নাকি ? না, প্রতিবাদীর কোনই দোষ নেই, আর নির্লজ্জ বাদী, তোকে ওর নামে কলঙ্ক দেওয়া ও জবরদস্তি করার জন্য কঠোর সাজা দেওয়া উচিত। কিন্তু তুই লড়াইতে জিতেছিস বলে তোকে মাফ করে দিচ্ছি — এই হবে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুরস্কার। যাও, আবার বন্ধু হবার চেষ্টা কর।'

সমস্ত জনগণ তিন ভাইয়ের ন্যায়বিচারের প্রশংসা করতে লাগল, খানও খুশী। পুরনো উজীররা কেবল বিদ্বেষে জ্বলতে লাগল। তারা খানকে বোঝাতে লাগল যে ঐ তিন ভাই বদমাশ, অজানা আগন্তুকদের বেশী বিশ্বাস করা অযৌক্তিক, খুব সম্ভবত শত্রুরা তাদের পাঠিয়েছে খানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য। খান কিন্তু ভাগিয়ে দিলেন কানভাঙানিদের, তারপর ঘোষণা করলেন:

'এই তিন তরুণ জ্ঞানীকে আমার উজীর নিযুক্ত করছি। দিনের বেলায় তারা আমাকে শাসনকাজে সাহায্য করবে, সন্ধ্যাবেলায় আমাকে গল্প শোনাবে, আর রাত্রে আমি যখন ঘুমাব, আমাকে পাহারা দেবে।'

দিন যায়। খান আরো বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন তিন তরুণের প্রতি।

সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাদের কথা শুনতে শুনতে ঘুম এসে যেত তাঁর। ভাইয়েরা খানের কাছে থাকত পালা করে, তাদের সবার প্রতিই মনোযোগ ছিল খানের, কিন্তু সবার ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ মনোযোগ। সেই জন্যই বুড়ো উজীরদের তার ওপর আরো বেশী রাগ। রাগে জ্বলতে জ্বলতে তারা ছোট ভাইকে নাজেহাল করবার জন্য ফন্দী আঁটল।

একদিন যখন খানের কাছে থাকার পালা এল ছোট ভাইয়ের উজীররা চুপিচুপি খানের শয়নকক্ষে একটা বিষাক্ত সাপ রেখে দিল। তারা ভাবল যে খান সাপটা দেখে তার প্রিয়পাত্রকে সন্দেহ করবেন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী হিসাবে, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হবেন তিনি, তখন তাঁকে ঐ তিন ভাইকে দূর করে দিতে রাজী করান যাবে।

রাতের বেলায় খান ঘুমোতে শুলে তরুণ উজীর তাঁকে বলতে লাগল প্রাচীনকালের বিভিন্ন বিশ্বাসহননের কাহিনী। এমন চমৎকারভাবে সে বলে যেন তার সামনে অদৃশ্য কোন বই খোলা আছে। এমন আবিষ্ট হয়ে গেছিলেন খান সেই সব কাহিনীতে যে ঘুমিয়ে পড়লেন কেবল মাঝরাতে।

যুবকটি তখন আলো নিভিয়ে দিতে গিয়ে দেখে একটা ভয়ংকর সাপ খানের পালঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটুও ভয় না পেয়ে সে তরোয়ালের এক ঘায়ে সাপটার মাথা কেটে ফেলল আর সাপের কাটাদেহটা ফেলে দিল পালঙ্কের নীচে। তরোয়ালটা সে খাপে ভরতে যাবে এমন সময় আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়ে চোখ মেললেন খান।

সামনে নিজের যুবক উজীরকে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করতে লাগলেন:

'প্রহরী! প্রহরী! খুন করল!'

দেহরক্ষীরা ছুটে এল শয়নকক্ষে, যুবকটিকে ধরে কারাকক্ষে বন্ধ করে রাখল সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

সকালবেলায় খান সব উজীরদের ডেকে বন্দীকে নিয়ে কি করা হবে তা আলোচনা করতে লাগলেন।

উজীররা সবাই এক কথাই বলতে লাগল: বাক্যব্যয়ে তারা কোন কার্পণ্য করল না আর বাকপটুতার রেষারেষি চালিয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে, সবাই যুবকটিকে বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা, ও খানের জীবননাশের প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করল, দাবী করল তাকে কঠোর, নির্দয় শাস্তি দেবার। তাদের কথা শুনতে শুনতে খান মাথা নাড়ছিলেন, তাঁর মুখ ক্রমশঃই অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। উজীররা ওদিকে মনে মনে প্রচণ্ড উল্লসিত বোধ করছিল যদিও তা জানতে দিচ্ছিল না, তাদের এই নির্মম ষড়যন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল তারা।

এবার বলার পালা এল অভিযুক্তের বড় ভাইয়ের।

সে বলল, 'অনুমতি দিন হুজুর, আমি আদালতের ভাষণের পরিবর্তে একটা প্রাচীন গল্প শোনাব, যেমন এতদিন শুনিয়েছি আমি আর আমার ভাইয়েরা আপনার মাথার কাছে বসে।

'বহুদিন আগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক বাদশাহ্ ছিলেন। একটা কথাবলা তোতাপাখীকে

তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন; বাদশাহের শয়নকক্ষে একটা সোনার খাঁচায় পাখীটা বসে থাকত। সংকটমুহূর্তে পাখীটা বাদশাহ্‌কে পরামর্শ দিত। দুঃখে সান্ত্বনা দিত আর বিশ্রামের সময়ে আমোদ জোগাত।

'একদিন বাদশাহ খাঁচার কাছে এসে দেখলেন পাখীটা পালক ফুলিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে।

'কি হল তোমার, বন্ধু?' জিজ্ঞাসা করলেন বাদশাহ।

তোতাপাখী বলল:

'আজ আমার দেশ থেকে উড়ে এসেছিল আমার কয়েকজন বন্ধু। তারা খবর এনেছে যে আমার বোনের বিয়ে হবে, বিয়ের দিনে আমাকে দেখতে চেয়েছে বোন। আমাকে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে অনুমতি দিন, মহারাজ! এই দয়ার পরিবর্তে আমি আপনার জন্য নিয়ে আসব অমূল্য উপহার।'

'কতদিন লাগবে তোমার ফিরে আসতে?' বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন।

'চল্লিশদিন, মহারাজ। চল্লিশদিনের দিন আমি এখানে পেঁৗছে যাব।'

'খাঁচার দরজাটা খুলে ধরলেন বাদশাহ্‌, পাখীটা একটা উল্লাসের ধ্বনি করে জানলার বাইরে উড়ে চলে গেল।

'সেখানে উপস্থিত বাদশাহের মন্ত্রী বলল:

'হলফ করে বলতে পারি হুজুর, যে পাখীটা আপনাকে ঠকিয়েছে, খাঁচায় আর ফিরে আসবে না ও।'

'হিংসুটে লোকেরা সদাই সন্দিগ্ধমনা হয়, হুজুর। কাউকে তারা বিশ্বাস করতে পারে না, ঐ উজীরটাও ছিল হিংসুটে।

'চল্লিশদিন কাটলে পাখীটা তার প্রতিশ্রুতিমত ফিরে এল। খুব খুশী হলেন বাদশাহ্‌, ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আমার জন্যে কি উপহার এনেছ, বন্ধু?'

'মুখ হাঁ করে পাখীটা বাদশাহের হাতে একটা ছোট বীজ দিল।

'বাদশাহ্‌ খুব অবাক হলেন কিন্তু পাখীটার জ্ঞান সম্পর্কে জানেন বলে বুড়ো মালীকে ডেকে বীজটা পুঁতে দিতে বললেন। একদিন বাদে সেই বীজটা থেকে একটা চমৎকার আপেল গাছ জন্মাল, দু'দিন বাদে কুঁড়ি দেখা দিল আর তিনদিন বাদে গাছটা সুগন্ধি ফলে ভরে গেল।

'সব থেকে লাল আপেলটা ছিঁড়ে মালী বাদশাহের কাছে নিয়ে চলল। কিন্তু পথে উজীর তাকে থামাল, মালীকে বকল হাতে করে আপেল নিয়ে যাবার জন্য আর বলল সোনার থালা নিয়ে আসতে। বুড়ো চলে গেলে সেই ফাঁকে উজীর আপেলটাতে বিষ মাখিয়ে রাখল তারপর মালীর সঙ্গে সঙ্গেই সেও বাদশাহের কাছে গেল। মালী বাদশাহকে সেই অপূর্ব গাছটির কথা বলে, আপেলসমেত থালাটি তাঁর সামনে রেখে বিদায় নিল, উজীর বলল:

'হুজুর, আপেলটি দেখতে খুবই সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য মানুষকে প্রায়ই প্রতারণা করে। আমার মনে হচ্ছে আপেলটি বিষাক্ত। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনো খুনী আসামীকে কারাগার থেকে এখানে আনতে বলুন, প্রথমে তাকে আপেলের একটুকরো খেতে দেওয়া হোক।'

'তার কথামতই কাজ করা হল। হাতপাবাঁধা দস্যুটাকে এনে একটুকরো আপেল খেতে বাধ্য করা হল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে সে মারা পড়ল।

'বাদশাহ্ ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে গেলেন। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে খাঁচা থেকে পাখীটাকে বার করে গলাটা মুচড়ে দিলেন তার।

'কয়েকদিন বাদে বাদশাহের ইচ্ছা হল আপেল গাছটিকে স্বচক্ষে দেখার। বাগানে বেরিয়ে তিনি মালীকে ডাকতে লাগলেন। একটি চমৎকার চেহারার তরুণ ছুটে এল তাঁর কাছে।

'কে তুই?' বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি আপনার মালী, হুজুর।'

'আমার মালী তো থুরথুরে বুড়ো ছিল!' বিস্মিত হলেন বাদশাহ্।

'যুবকটি বলল, 'আমিই সে, শাহানশাহ। আপনি যখন পাখীটাকে মেরে ফেললেন আমি ভাবলাম আমারও আর রক্ষা নেই, তাই কষ্টযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য একটা বিষাক্ত আপেল খাব ভাবলাম। একটা আপেল ছিঁড়ে একটু কামড়াতেই আমার তারুণ্য আবার ফিরে এল।'

'অভিভূত বাদশাহ্ যেন স্বপ্নের ঘোরে সেই অদ্ভুত গাছটার কাছে এগিয়ে গেলেন, একটা আপেল ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিলেন। কি এক অপূর্ব সুখের অনুভূতি বয়ে গেল তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে, অনুভব করলেন যে তিনি আবার যৌবনের শক্তিতে ভরপুর যেমন ছিলেন আঠার বছর বয়সে।

'তখন তিনি বুঝলেন যে বিশ্বাসী তোতাপাখীটাকে শুধু শুধুই মেরে ফেলেছেন, দুঃখে, অনুশোচনায় কেঁদে ফেললেন তিনি কিন্তু করার আর কিছু নেই তখন: কারুর জীবন নিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে রাজা-বাদশাহের কিন্তু ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তো নেই।'

বড় ভাইয়ের বলা শেষ হল। খান চুপ করে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন। তারপর তিনি ইঙ্গিতে মেজ ভাইকে বলতে আদেশ দিলেন। সে বলল:

'শাহানশাহ, আমিও আপনাকে একটি কাহিনী শোনাব। এও বহুদিন আগের ঘটনা, ঘটে অন্য দেশে, অন্য বাদশাহের জীবনে। ঐ বাদশাহ্ ছেলেবেলা থেকেই শিকার ভালবাসতেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তেজীঘোড়ায় চেপে তিনি স্তেপে বিভিন্ন বন্য জন্তু, পাখীর পিছনে ধাওয়া করে বেড়াতেন। বাদশাহের ছিল চমৎকার একটা শিকারী ঈগলপাখী যেমনটি আর কোন শিকারীর ছিল না, পাখীটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

'একদিন বাদশাহ্ একটা সাইগার* পিছনে ধাওয়া করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন

---

* সাইগা — হরিণ।

প্রাণহীন এক মরুভূমিতে। সূর্যের নির্মম উত্তাপ, একফোঁটা জলও নেই, বাদশাহের এদিকে তেষ্টায় বুক ফাটছে। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটা পাহাড়ের গা বেয়ে সরু একটা জলের ধারা নেমে আসছে। বাদশাহ্ সোনার পেয়ালা বার করে, তাতে সেই জল নিয়ে খেতে যাবেন এমন সময় ঈগলটা হঠাৎ পেয়ালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জলটা ফেলে দিল।

'বাদশাহ্ প্রচণ্ড রেগে গেলেন, চীৎকার করে উঠলেন ঈগলটার প্রতি, তারপর আবার একটু জল ধরলেন। কিন্তু পাখীটা আবার উড়ে এসে বুক দিয়ে পড়ল পেয়ালাটার ওপর, বাদশাহের হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল পেয়ালাটা। প্রচণ্ড রাগে বাদশাহ্ শূন্য পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে আঘাত করলেন পাখীটার মাথায়। পাখীটা মরে পড়ে গেল। তারপর তিনি আবার জলধারাটার কাছে গেলেন — আর ভয়ে জমে গেলেন: পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিরাট এক সাপ। জল নয়, মৃত্যু আনয়নকারী বিষ বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে! লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন বাদশাহ্। কিন্তু সেদিন থেকে তিনি বুঝলেন: তাড়াহুড়ো না করে সতর্ক হওয়াই ভাল, বাদশাহ্ বলেই যে তিনি সর্বনাশা ভুলের হাত থেকে রেহাই পাবেন তা নয়, আর ভাল মন্দের তফাৎ করতে পারেন কেবল পণ্ডিতেই, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নয়।'

'হয়েছে! চুপ কর!' হুঙ্কার দিয়ে খান উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমরা দু'জনেই ভাইয়ের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছ, এখন বদমাশটার ঘাড় থেকে সব দোষ নামিয়ে ওকে নিয়ে পালাতে চাও। তোমাদের কথা অনুযায়ী এই দাঁড়াচ্ছে যে, ওর কোন দোষ নেই আর আমি অন্যায়, অবিচার করছি ওর প্রতি। তাই যদি হবে তাহলে ও তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন আমার কাছে?'

'তা আমরা জানি না,' ভাইয়েরা বলল, 'ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

'বন্দীকে নিয়ে এস!' চীৎকার করে খান প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

ছোট ভাই এসে খানের আর উজীরদের সামনে দাঁড়াল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে খান জিজ্ঞাসা করলেন:

'সত্যি করে বল, কোনরকম ধূর্তামিই তোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না জানবি, — কি উদ্দেশ্যে তুই কাল রাতে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলি?'

'আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হুজুর,' ধীরভাবে বলল ছোট ভাই।

'তুই ছাড়া আর কে আমার মৃত্যু ঘটাতে পারত?'

'যে সাপটা আপনাকে ছোবল মারতে এসেছিল, যেটাকে আমি তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলেছি, সেটা।'

'সাপ? কি যা-তা বলছিস! আমার শয়নকক্ষে সাপ আসবে কোথা থেকে?' অবাক হলেন খান।

'আপনার বহুঅভিজ্ঞ উজীররা, যাদের ওপর আপনার অগাধ বিশ্বাস, তারাই এ প্রশ্নের উত্তর ভাল দিতে পারবে।'

খান নিজের শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকলেন, তারপর খানিক বাদে বেরিয়ে এলেন ধীর পায়ে, মাথা নীচু করে। জলভরাচোখে ভাইদের মধ্যে ছোটজনের কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন:

'তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, জীবনরক্ষাকারী, ক্ষমা কর আমায়। তোমাকে এমন কষ্ট দেবার বিনিময়ে তুমি যা চাও তাই দেব তোমায়, সবার সামনে শপথ করে বলছি যে তুমি আর তোমার ভাইয়েরা যা চাও তাই পাবে।'

তরুণটি তখন বলল:

'আমাদের তিনজনকে ছেড়ে দিন, শাহানশাহ্, আপনার কাজ থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের আবার ভ্রমণে বেরোবার অনুমতি দিন। আমাদের পথ এখনও শেষ হয় নি, সব থেকে বড় জ্ঞানভাণ্ডার জীবনের বইটা আধখানাও পড়া হয় নি আমাদের।'

এমন প্রার্থনা আশা করেন নি বাদশাহ্। আবার প্রচণ্ড রাগে মুখচোখ লাল হয়ে গেল তাঁর, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা রাখতেই হবে।

আবার পথে রওনা দিল তিন ভাই।

কাঠুরের মেয়ে

একসময় এক বুড়ো কাঠুরে তার ন'বছরের মেয়েকে নিয়ে থাকত এক ভাঙা কুঁড়েঘরে। থাকার মধ্যে ছিল কেবল তার একটা ভাঙা কুড়ুল, একটা খোঁড়া ঘোড়া আর বুড়ো একটা গাধা। কিন্তু কথায় বলে 'ধনীর সুখ তার ঘোড়াগুরুর পালের দিকে তাকিয়ে আর দরিদ্রের সুখ তার সন্তানদের দিকে তাকিয়ে।' সত্যিই, নিজের ছোট্ট মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে সব দুঃখকষ্ট ভুলে যেত।

মেয়ের নাম আয়না-কিজ। সুন্দরী বুদ্ধিমতী আর হাসিখুশী স্বভাব তার, একবার তাকে দেখলেই ভালবেসে ফেলে তাকে সবাই। দূরের দূরের ইয়ুরতা থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আসে তার সঙ্গে খেলা করার জন্য, দূর দূর গ্রাম থেকে বৃদ্ধেরা আসে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

একদিন বুড়ো কাঠুরে খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে কাঠের বোঝা চাপিয়ে মেয়েকে বলল:

'আয়না-কিজ, বাছা আমার, আমি বাজারে যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যা হবে। মন খারাপ করিস না। যদি কাঠ বিক্রী করতে পারি ভাল দামে তো তোর জন্য কিছু কিনে আনব।'

'যাও, কিন্তু সাবধান থেকো বাবা, ভালয় ভালয় ফিরে এস। কথায় বলে, বাজার অতি খারাপ জায়গা সেখানে একজনের থলি ভরে, অন্যজন নিঃস্ব হয়। তাড়াতাড়ি ফিরে এস, রান্না করে বসে থাকব আমি।'

খোঁড়া ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে রওনা দিল কাঠুরে।

বাজারে পেঁছে একপাশে দাঁড়িয়ে সে খরিদ্দারের অপেক্ষায় রইল। কিন্তু সময় যায় কেউ এগিয়ে আসে না বুড়োর দিকে।

ঐ সময় এক যুবক বাই* বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সবার সামনে তার কালো দাড়ি আর রেশমী আলখাল্লাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে। গরীব বুড়ো কাঠুরেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে নিয়ে মজা করার ইচ্ছা হল বাইয়ের।

'কি গো বুড়ো, কাঠ বেচবে ?' জিজ্ঞাসা করল বাই।

'বেচব,' বলল কাঠুরে।

---

* বাই — জমিদার

'কি দাম চাস ঐ কাঠের বোঝার জন্য ?'

'এক তাঙ্গা*।'

'ঐ একই দামে কি তুই যা যেমন আছে বেচবি ?'

খরিদ্দারের কথা ঠিক বুঝতে পারল না কাঠুরে, কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু নেই দেখে আবার উত্তর দিল, 'বেচব'।

'ঠিক আছে,' বলল বাই, 'এই নে পয়সা, চল আমার সঙ্গে।'

বাইয়ের বাড়ীর উঠোনে যখন তারা পেঁছিল, কাঠের বোঝা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাতে গেল বুড়ো কাঠুরে কিন্তু বাই তার বুকে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল :

'কি করছিস তুই, বোকা বুড়ো ? ঘোড়াটা নিয়ে যেতে চাস নাকি ? আমি তো তোর কাছে কাঠ কিনেছি 'যা যেমন আছে' এই ভাবে, তার মানে ঘোড়াটাও এখন আমার। দাম পেয়ে গিয়েছিস, ভেগে পড় শীগগির !..'

কাঠুরে প্রতিবাদ জানাতে লাগল কিন্তু বাই শোনে না কিছুই। হাত নাড়িয়ে চীৎকার করে আরো জোরে, শেষে বুড়োর জামা ধরে টেনে নিয়ে চলল তাকে কাজীর কাছে।

কাজী তাদের কথা শুনে দাড়িতে হাত বুলিয়ে তাকাল বাইয়ের রেশমী আলখাল্লার দিকে, ভাল পারিশ্রমিক পাবার আশায় ঘোষণা করল: কাঠুরে দাম পেয়েছে পুরোপুরি, যে ক্ষতি তার হয়েছে সে জন্য নিজেই দায়ী সে, খরিদ্দারের শর্তে রাজী হয়েছিল সে।

কাজীর বিচারের পরে বাই হা-হা করে হাসতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে এমন তামাসায় খুশী হয়ে আর বুড়ো কাঠুরে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে গুটি গুটি ফিরে চলল গ্রামের দিকে।

ওদিকে আয়না-কিজ বাবার অপেক্ষায় বারেবারে চুলায় কাঠ গুঁজছে। তারপর যখন বুড়ো এসে ঘরে পা দিল, তার চোখে জল দেখে মেয়ের বুকটা কেঁপে উঠল উদ্বেগে। ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হয়েছে। কাঠুরে সব কথা বলল মেয়েকে, মেয়ে বুড়ো বাবাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু বুড়োর চোখের জল থামে না কিছুতেই।

পরের দিন বুড়ো শোকে একেবারে বিছানা নিল। আয়না-কিজ বাবার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'বাবা, আজ তোমার শরীরটা খারাপ, আজ বিছানা থেকে উঠো না তুমি। অনুমতি দাও আজ আমি বাজার যাই। হয়ত আমি ভাল দামে কাঠ বেচতে পারব।'

বুড়ো কিছুতেই যেতে দেবে না মেয়েকে আর মেয়েও ছেড়ে দেবে না বুঝিয়েই চলে বাবাকে।

শেষে হাল ছেড়ে দিল বুড়ো।

'যা আয়না-কিজ, এতই ইচ্ছে যখন তোর, কিন্তু জানবি যতক্ষণে তুই না ফিরে আসবি ততক্ষণ মনে শান্তি থাকবে না আমার।'

---

* তাঙ্গা — ভারতবর্ষের পুরানো এক আনির সমান। — সম্পাঃ

আয়না-কিজ বুড়ো গাধাটার পিঠে কাঠ বোঝাই করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল শহরের দিকে।

বাজারে পেঁছে খানিক বাদেই সে দেখতে পেল সেই কালোদাড়ি, রেশমী আলখাল্লাপরা বাইকে ঘুরে বেড়াতে। নাক উঁচু করে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাই, কাঠ বেচতে আসা মেয়েটিকে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসে সে সোজা এগিয়ে গেল সেদিকে।

'এই মেয়ে, কাঠ বেচবি ?' জিজ্ঞাসা করল সে।

'বেচব।' বলল আয়না-কিজ।

'কত চাস এই বোঝার জন্য ?'

'দু' তাঙ্গা।'

'ঐ দামেই কাঠ যেমন আছে তেমন বেচবি নাকি ?'

'বেচব, যদি আমাকে পয়সা দাও যেমন আছে তেমন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' তাড়াহুড়ো করে বলল বাই, গোঁফের আড়ালে হেসে। 'চল আমার সঙ্গে।'

বাইয়ের বাড়ীর কাছে এসে আয়না-কিজ জিজ্ঞাসা করল:

'কোথায় বাঁধব, চাচা, 'তোমার' গাধাটা ?'

মেয়েটির বাধ্যতায় বিস্মিত হয়ে বাই উঠোনের মাঝখানে একটা খুঁটি দেখিয়ে দিল কোন কথা না বলে। গাধাটাকে বেঁধে রেখে আয়না-কিজ দাম চাইল এবার। বাই একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে দুটি পয়সা বাড়িয়ে ধরল তার দিকে, কিন্তু আয়না-কিজ তাকে বলল:

'চাচা, তুমি আমার কাছে কাঠ কিনেছ 'যেমন আছে তেমন,' তাই গাধা পেলে কাঠসমেত, কিন্তু তুমিও কথা দিয়েছিলে পয়সা দেবে যেমন আছে তেমন। দুটো তাঙ্গার সঙ্গে তোমার হাতটাও চাই আমি।'

মেয়েটির মুখে এমন কথা শুনে প্রথমটা হতবাক হয়ে গেল বাই, তারপর ভয় দেখাতে লাগল, গালিগালাজ করতে লাগল কিন্তু আয়না-কিজ ছেড়ে দেয় না কিছুতেই। তখন কাজীর কাছে গেল তারা।

কাজী তাদের কথা শুনে যতই দাড়িতে হাত বোলাক, যতই তাকাক বাইয়ের রেশমী পোশাকের দিকে কিছুই ভেবে বার করতে পারল না বাইকে বাঁচাবার জন্য। কাজী বলল, 'বাই দুটো তাঙ্গা দেবে মেয়েটিকে কাঠের দরুণ আর নিজের হাতের বদলে দেবে পঞ্চাশটা মোহর।'

রাগে অন্ধ হয়ে গেল বাই, কাঠ, খোঁড়া ঘোড়া, গাধা সবকিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

আয়না-কিজকে মোহর দিতে দিতে বলল বাই:

'তুই চালাকিতে আমাকে হারিয়েছিস রে মেয়ে, কিন্তু এ নিয়ে বড়াই করিস না যেন কারুর কাছে। চড়াই আর চিল এক হতে পারে না কখনও। যাই হোক না কেন আমার বুদ্ধি তোর চেয়ে বেশী। দেখতে চাস ? তবে আয় বাজী রাখা যাক। কাজীর সামনে আমরা বলব নিজের নিজের

জীবনের একটা করে বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য ঘটনা। যার কাহিনী কাজী বলবে বেশী ভাল সেই জিতবে। আরও মনে রাখিস যে অন্যজনের গল্পকে বিশ্বাস না করে, বলবে মিথ্যাবাদী সে হারবে, রাজী ? পাঁচশো মোহর বাজী রাখছি আমি, তুইও তোর পঞ্চাশটা মোহর বাজী রাখ...'

'আমি রাজী,' বলল আয়না-কিজ, 'নিজের মাথা বাজী রাখছি আমি।'

বাই কাজীর দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিত করে গল্প আরম্ভ করল:

'একদিন আমি জামার মধ্যে খুঁজে পেলাম তিনটি গমের দানা, জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিলাম সেগুলোকে। কিছুদিন বাদেই গমের ক্ষেত গজিয়ে উঠল আমার জানলার নীচে, আর তা এমন ঘন আর উঁচু যে উট, ঘোড়ার পিঠে যাওয়া লোকেরা পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াত তার মধ্যে কখনও কখনও কয়েকদিন ধরে পথ খুঁজত তারা। একবার এমন এক ঘটনা ঘটল: আমার চল্লিশটা সেরা ছাগল সেখানে গিয়ে হারিয়ে গেল। কত ডাকলাম তাদের, কত খুঁজলাম কিন্তু ছাগলগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। শরৎকালে গমে পাক ধরল। ফসল তুলল আমার লোকেরা কিন্তু ছাগলের হাড়গোড় দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। সেই গম ঝাড়াই-বাছাই করে ভাঙান হল: ছাগলগুলোর কথা তখন সবাই ভুলেই গেছে। একদিন স্ত্রীকে বললাম রুটি তৈরী করতে ঐ ময়দা দিয়ে তারপর বই পড়তে বসলাম। রুটি সেঁকে আমার দিকে এগিয়ে দিল স্ত্রী। একটুকরো রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলাম আমি। হঠাৎ আমার মুখের মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠল ছাগলের মত — বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেছে আমার... আর আমার মুখ থেকে টুক করে লাফিয়ে পড়ল একটা ছাগল, তারপর আর একটা, এমনি করে চল্লিশটা ছাগল, লাফালাফি আরম্ভ করে দিল বইয়ের ওপর। কি মোটাসোটা যে হয়েছে ছাগলগুলো প্রত্যেকে যেন একটা চারবছরের ষাঁড়।'

বাই থামল যখন এমনকি কাজীও অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়াল। কিন্তু আয়না-কিজের চোখের পাতাও একটু নড়ল না।

'চাচা গো !' বলল সে, 'তোমার গল্প দেখছি সম্পূর্ণ সত্যি। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের জীবনে আরো ভাল কিছু ঘটনা ঘটা উচিত। এবার আমার কাহিনী শোন।'

বলতে আরম্ভ করল আয়না-কিজ।

'একবার আমি আমাদের গ্রামের মাঝে একটা তুলোর বীজ পুঁতে দিই। কি ঘটল জান ? পরের দিন সেই জায়গায় তুলোগাছ গজাল একেবারে আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে, যতদূরে পর্যন্ত তার ছায়া পড়ে, তিন দিন ঘোড়ায় চড়ে গেলে তবে তার শেষ দেখা যায়। যখন তুলোয় পাক ধরল, তা কেটে পরিষ্কার করে বেচলাম আমি। সেই টাকায় কিনলাম চল্লিশটা ভালজাতের উট, তাদের পিঠে দামী দামী কাপড় বোঝাই করে আমার বড় ভাই রওনা দিল বুখারা। চলে গেছে ভাই, তিনবছর ধরে তার কোন খবরাখবর নেই, সম্প্রতি শুনতে পেলাম যে পথে তার মাল লুঠ করে পরে তাকে মেরে ফেলেছে একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক। আশা ছিল না যে খুনীকে খুঁজে পাব, কিন্তু ঘটনাচক্রে খুঁজে পেলাম তাকে: বুঝলাম এবার সেই খুনী — তুমি, কারণ তোমার অঙ্গে আমার হতভাগ্য ভাইয়ের আলখাল্লাটা।'

এ কথা শুনে কাজী লাফিয়ে উঠল, আর বাই বসেই রইল মেঝেতে। কি হবে এখন? যদি বলে মিথ্যা বলছে মেয়েটি তো শর্ত অনুযায়ী পাঁচশো মোহর দিতে হবে তাকে... আর যদি বলে মেয়েটি সত্যি বলছে তাহলে নিহত ভাইয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তাছাড়া দামী পণ্যভরা চল্লিশটা উট...

শেষে আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল বাই:

'জিভ খসে পড়ুক তোর, সব মিথ্যা বলছিস, সব মিথ্যা! নচ্ছার মেয়ে! এই নে পাঁচশো মোহর আর আমার আলখাল্লা কেবল চটপট ভেগে পড় এখান থেকে!'

আয়না-কিজ মোহরগুলো আলখাল্লায় মুড়ে নিয়ে দৌড় গ্রামের দিকে।

কাঠুরে ওদিকে মেয়ের আসতে দেরী দেখে চিন্তায় পথে বেরিয়ে পড়েছে। মেয়ে ছুটে কাছে আসতেই তাকে বুকে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল:

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে মা, আর বুড়ো গাধাটাই বা কই?'

মেয়ে বলল:

'বাবা, আমি তো ভালয় ভালয় ফিরে এসেছি, আর গাধাটা কাঠসমেত 'যেমন আছে তেমন' বেচে দিয়েছি কালোদাড়িওয়ালা লোকটাকে।'

'বেচারা,' বিষণ্ণ সুরে বলল কাঠুরে, 'নিষ্ঠুর বাইটা তোকেও ঠকিয়েছে... সর্বনাশ হল আমাদের, দোষ আমারই।'

'বাবা, মন খারাপ কোরো না, কাঠের জন্য ভাল দাম পেয়েছি আমি।'

বলে বাবার দিকে এগিয়ে দিল গোটান রেশমী আলখাল্লাটা।

'খুব সুন্দর, দামী পোশাক,' তেমনি বিষণ্ণ সুরেই বলল কাঠুরে, 'কিন্তু এমন পোশাক আমার কি কাজে লাগবে? ঘোড়াটা আর বুড়ো গাধাটা ছাড়া আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হবে।'

তখন আয়না-কিজ কোন কথা না বলে বাবার সামনে খুলে ধরল পোশাকটা, তার থেকে চকচকে মোহরগুলো পড়ে গেল মাটিতে। বুড়ো একবার দেখে মেয়ের দিকে, একবার মোহরগুলোর দিকে, বিশ্বাস হয় না, স্বপ্ন না সত্যি। মেয়ে তখন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে শহরে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল।

মেয়ের কথা শুনতে শুনতে কাঁদছে হাসছে কাঠুরে, শেষে আয়না-কিজ বলল:

'বাবা গো! যেখানে ধনী লুকিয়ে রাখে ধূর্ততা, সেখানেই গরীবের থাকে বুদ্ধি। কালোদাড়ি বাইয়ের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে আর এই মোহরগুলো দিয়ে আমরা সারা গ্রামের লোক সুখে শান্তিতে থাকতে পারব।'
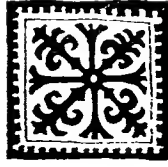
নূরজান আর তার ছেলেরা

কোনো এক সময়ে একজন ভাল লোক ছিল, নাম তার নূরজান। দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল সে, আর বার্ধক্যও আসে নি তার দেহে। যখন তার নিরানব্বই বছর পূর্ণ হল সে নিজের তিন ছেলেকে কাছে ডেকে বলল:

'আমার প্রিয় ছেলেরা, সাবিত, গাবিত, হামিত! সব পরিশ্রম, দায়িত্ব, দুঃখকষ্ট নিয়ে আমার দিন শেষ হয়েছে। রাত নামছে, চোখের সামনে অন্ধকারের আবরণ। এবার আমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। শেষঘুমে ঢলে পড়ার আগে তোমাদের কাছে বিদায় নিতে চাই আর কিছু উপদেশ দিতে চাই তোমাদের।'

'বল বাবা, আমরা মন দিয়ে শুনব!' বলল ভাই তিনজন।

বলে চলল নূরজান:

'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে গরুভেড়া, জমিজমা যা কিছু আমি রেখে গেলাম ভাগ করে নিও আর এমনভাবে ঘরসংসার কোরো যেন আত্মীয় বা পর কেউ তোমাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে না পারে। মনে রেখো, আমার মেষপালে একটা মেষশাবকও নেই আর ঘোড়ার পালে একটাও ঘোড়া নেই যাদের আমি শঠতা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অধিকার করেছি। ভেড়ার পালকে প্রহরা দেবে নেকড়ে যেন না হামলা করে, নিজের মনকে প্রহরা দেবে মিথ্যার বিরুদ্ধে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলেমিশে থাকবে, বিপদে একে অন্যকে ফেলে যেও না। আর যদি কখনও প্রচণ্ডভাবে বিপদের ফাঁসে আটকা পড়ই কোনদিন, তবে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় এই নাও।' বলে নূরজান কাঁপা-কাঁপা হাতে ছেলেদের দিকে এগিয়ে দিল সোনার মোহরভরা একটি চামড়ার থলি। 'নাও বাছারা, এতে মোহর আছে নিরানব্বইটি, যত বছর আমি এই আকাশের নীচে বেঁচে আছি, ঠিক ততগুলি। এগুলো একটা ভাল জায়গায় লুকিয়ে রাখ আর যতদিন তোমাদের সঞ্চয়ে এককণা খাবারও থাকবে ততদিন এ অর্থ ছুঁয়ো না। যখন তোমাদের চরম দুর্দশা আসবে, কেবল তখনই এই অর্থ তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিও। এই অর্থে মিশে আছে আমার পরিশ্রম, ঘাম, কষ্ট আর চোখের জল, এ তোমাদের মঙ্গলের কাজেই লাগুক।'

বলে বৃদ্ধ নূরজান শেষ নিঃশ্বাস ফেলল, মৃত্যু তার চোখের পাতা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিল।

ছেলেরা বাবার শেষকৃত্য করল যথাযোগ্য সম্মানসহকারে, রীতি অনুযায়ী যা যা করার সবই করল, কান্নাকাটিও করল খুব। সব থেকে বেশী কেঁদে লুটোপুটি খেতে লাগল ছোট ছেলে। যে সব লোকেরা গোটা এলাকা থেকে দেখতে এসেছিল নূরজানের শেষকৃত্য, তারা বলাবলি করতে লাগল:

'নূরজানের মত এমন করে যে ছেলে মানুষ করতে পেরেছে সে পিতা ধন্য। তিনজনই চমৎকার, কিন্তু তৃতীয়জন সবচেয়ে ভাল।'

শোকপালন শেষ হলে পরে ভাইয়েরা কোনরকম ঝগড়াঝাঁটি ছাড়াই সমস্ত সম্পত্তি সমান তিনভাগে ভাগ করে নিল, কেবল অনেকক্ষণ ধরে তারা একমত হতে পারছিল না মোহরের থলিটা কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় সেই বিষয়ে। তারা পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠে একটা গুহা খুঁজে পেল, সেখানে তাদের ধন রেখে গুহার মুখটা পাথর দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করে দিল যে খুব বুদ্ধিমান চোরও এখানে চুরি করতে আসায় কোন উৎসাহ পাবে না।

ভাইয়েরা শপথ নিল যে এই গোপনকথা কখনও কারুর কাছে প্রকাশ করবে না বা তাদের এই মিলিত ধনে হস্তক্ষেপ করবে না, তারপর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তারা বিভিন্ন পথে আলাদা আলাদাভাবে নীচে নেমে গেল।

দিন যায়, নূরজানের কবরের ওপর ঘাসলতাপাতা গজিয়ে উঠল। প্রথমে তিন ভাইয়ের মধ্যে বেশ ভাব, ভালবাসা ছিল, দূর দূর গ্রামের বাবামায়েরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের কাছে তাদেরকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরত। তারপর ছোট ভাইয়ের ভাব হল কতকগুলি অলস আড্ডাবাজ লোকের সঙ্গে, নেশা করতে লাগল, আরো নীচে নামল, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে ভোজউৎসব, ঘোড়ার দৌড়ের আয়োজন করতে লাগল, ঘোড়ায় চেপে খরগোস শিকারে যায়, ভেড়ার পাল অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে।

ভাইয়েরা তাকে বোঝাতে লাগল:

'তোর হল কি? বাবার কথাগুলো ভুলে গেলি। এখনও ফেরার পথ আছে, ভেবে দেখ। তা নাহলে শীঘ্রই একটা ছেঁড়া পোশাকও থাকবে না অঙ্গে।'

হামিত হেসেই উড়িয়ে দেয় সেকথা:

'কাল কি হবে তা কেউ বলতে পারে না।'

বড় ভাইয়েরা বলল:

'তা ঠিক, তবে সেই কালকের দিনটা যে রূপেই দেখা দিক না কেন, আমাদের এই উপদেশ অনুযায়ীই কাজ করতে হবে: যতক্ষণ না অন্ধকার নামে, কাজ করে যাও।'

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হল: শীঘ্রই হামিত একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়ল। গরুবাছুরের শেষ ক'টিও বিক্রয় করে দিয়ে সে এসে ভাইদের বলল যে ডাকাতরা তার গরুবাছুরের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। দুঃখে, হতাশায় মাথা নাড়তে লাগল বড় দুই ভাই,

কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বাবার বলা কথাগুলি মনে পড়ল তাদের, ভাইকে বকাবকি করল না তারা, নিজেদের গরুভেড়ার থেকে তাকে দিল কিছু, যাতে সে নিজের পরিবারকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সেই অঞ্চলের মেষপালকদের দারুণ দুর্দিন এল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত ঘাসলতা জ্বলে গেল। গরুভেড়ার পালের খাবার কিছু নেই। শরৎকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হল, সময়ের আগেই দারুণ শীত পড়ল, মাটি ঢেকে গেল বরফে। গরুভেড়া মরতে লাগল ক্ষুধায় আর রোগভোগে। চতুর্দিকে মরা জন্তুর দেহ পড়ে আছে। তখনই ভাইদের মনে পড়ল লুকিয়ে রাখা ধনের কথা।

গুহার কাছে এসে তারা পাথরগুলি সরিয়ে ভেতরে তাকাল: থলিটা যেখানে তারা রেখে গিয়েছিল ঠিক সে জায়গাতেই আছে, কিন্তু তার ভেতরে মোহর কমে গেছে। ভাইয়েরা মোহরগুলি টুপির মধ্যে ঢালল, তিন তিনবার গুণল, কিন্তু তাতে কি? কমে যে গেছে তা জলের মত পরিষ্কার: বাবা বলেছিলেন মোহর আছে নিরানব্বইটি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছেষট্টিটি।

নুরজানের ছেলেরা হতবুদ্ধি হয়ে মোহরগুলি নিয়ে বসে রইল আর আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

সাবিত বলল:

'অপরিচিত কোন লোক মোহর চুরি করেছে তা হতে পারে না, তাহলে সে সব মোহরই নিয়ে যেত, একটাও পড়ে থাকত না। আমাদের কেউই মোহর চুরি করেছে। কিন্তু কে?'

'শপথ করে বলছি আমি মোহর নিই নি,' বলল গাবিত।

'আমিও শপথ করে বলছি নিই নি,' বলল হামিত।

'তার মানে তোমরা মনে করছ আমি একাজ করেছি!' রাগে চীৎকার করে উঠল সাবিত।

'কি করে জানব, হতেও পারে!' প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে বলল গাবিত।

বড় ভাই মেজ ভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা চেপে ধরল, গুহার আধাঅন্ধকারে দুটি ছোরা বিদ্যুতের মত ঝকঝক করে উঠল।

হামিত চীৎকার করে বলল:

'দাঁড়াও ভাইয়েরা, তোমরা কি করছ! কয়েকদিন আগে তোমরাই না আমাকে খোঁটা দিলে যে আমি বাবার দেওয়া উপদেশ ভুলে গিয়েছি আর নিজেরা এখন কি করছ। শোন আমার কথা, এস আমরা ঝগড়াঝাঁটি না করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি। যতই আমরা ঝগড়া করি না কেন রহস্য উদঘাটিত হবে না তাতে। কি করে চুরিটা হল তা ভেবে দরকার নেই। এখনও যথেষ্ট মোহর আছে, সেগুলো আমরা সমানভাগে ভাগ করে নেব বাবার আদেশ অনুযায়ী।

ছোরা ফেলে দিল তারা, সাবিত হাঁফাতে হাঁফাতে বলল:

'তুই আমাদের বৃথা রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচালি, হামিত। একটা সোনার পাহাড়ও মানুষের রক্তের সমান দামী নয়। আমরা এখন পরস্পরের প্রতি আগের সে বিশ্বাস হারিয়েছি আর কি আমাদের মিল সম্ভব? কেবল বাবার বন্ধু জ্ঞানী বেলতেকেই আমাদের ঝগড়ার মীমাংসা করে দিতে পারেন। চল তাঁর কাছেই যাওয়া যাক মীমাংসা করার জন্য!'

পাহাড় থেকে নেমে এসে তারা ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল সেদিকে, যেখানে বেলতেকেইয়ের পরিবার শীতকাল কাটায়।

সব থেকে দূরের আর কষ্টকর পথও একদিন শেষ হয়। চল্লিশদিন পর তারা এসে পেঁছিল যশস্বী বেলতেকেইয়ের গ্রামে। বৃদ্ধ বেলতেকেই বন্ধুপুত্রদের আদর-অভ্যর্থনা জানাল, সুস্বাদু আহার্য আর কুমিস আনতে আদেশ দিল তাদের জন্য। তারপর বলল, 'কাল সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। কাল তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করা যাবে।'

রাত কাটল। ভোরবেলায় বেলতেকেই অতিথিদের প্রাতরাশ সারা হলে বলল:

'সারারাত ঘুমোই নি আমি, তোমাদের সমস্যার কথাই ভাবছিলাম। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার বন্ধু নুরেজানের ছেলেদের মধ্যে কেউ এ চুরি করেছে। তোমরা যে চুরি কর নি তা তোমাদের প্রমাণ করে দিতে হবে। একটাই পথ আছে প্রমাণ করার। এখনই তোমরা যাও বাবার কবরের কাছে। মাটি খুঁড়ে বাবার গাল থেকে একটি করে দাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে এস তিন ভাই। এইভাবেই কেবল তোমরা আমার কাছে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ভাইয়েরা। সাবিত প্রথম কথা বলল:

'আমি চুরি করি নি। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা আমি করতে পারব না তাতে যদি সমস্ত সন্দেহ আর চুরির অপরাধ আমার ওপর পড়ে তো পড়ুক।'

'আমিও চোর নই।' গাবিত বলল। 'কিন্তু আমিও আপনার কথামত কাজ করতে পারব না, সে আপনি বাবার বন্ধু আর বয়সে আমাদের তিনজনের দ্বিগুণ বড় বলেও না।'

আর হামিত বলল:

'ভাইরা দেখি সত্যকথা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছে। ওরা দু'জনে মিলেই চুরি করেছে নাকি ? আমিও চোর নই, সেইজন্যই এই মুহূর্তে রওনা দেব বাবার কবরের দিকে আপনার আদেশ সঠিকভাবে পালন করার জন্য। সত্যের জয় হোক !' বলে সে দরজার দিকে এগোল।

তখন পক্কশমশ্রু বেলতেকেই দু'হাত বাড়িয়ে তিরস্কারের সুরে বলল:

'দাঁড়াও, যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। সত্যেরই জয় হয়েছে। তুমি হামিত এ চুরি করেছ, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। যে বাবার কবরের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, সে সবকিছু করতে পারে: চুরি-ডাকাতি, নীচ প্রতারণা কি করে তুই এই লজ্জা আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবি ?'

হামিতের মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে। মাথা বুকে ঠেকিয়ে, চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে সে সব তিরস্কার শুনল, তারপর মুখের ওপর হাতচাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে আর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল দূরে কোথায়। সেই থেকে তাকে আর দেখা যায় নি গ্রামে বা পথে-ঘাটে, কোনো লোকের মুখেও তার নাম শোনা যায় না।

বড় ভাই দু'জন কৃতজ্ঞতা জানাল জ্ঞানীবৃদ্ধ বেলতেকেইকে সুবিচারের জন্য, তারপর মোহর নিয়ে ফিরে গেল যে যার পরিবারের কাছে। তাদের মধ্যে আর কখনও বিবাদ-বিসম্বাদ হয় নি, একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী মানুষ করে। এইভাবেই কাটতে লাগল তাদের দিনগুলি।

আদক

(পৌরাণিক কাহিনী)

খান আবলাই ছিল ভয়ংকর, ভয়ংকর, নিষ্ঠুর আর নির্দয়। লোকেরা তার নাম দিয়েছিল "কানিশের" অর্থাৎ রক্তপিপাসু। পেট তার সবসময় ভর্তি কিন্তু চোখে তার সর্বদাই ক্ষুধা, কোন বোঝা কখনই তার পিঠ নুইয়ে দিতে পারে নি কিন্তু তার স্বভাবের বোঝা ছিল পাহাড়ের চেয়েও ভারী, জন্ম থেকেই দেহটা তার ঠাণ্ডা কি জিনিস জানত না আর মনটা ছিল বরফের মতই ঠাণ্ডা। মায়ের বুক থেকে সে ছিনিয়ে নিত শিশুকে, স্ত্রীর কাছ থেকে তার স্বামীকে। অশ্বারোহীর অশ্ব কেড়ে নিত সে, পদযাত্রীর — লাঠি; শতচ্ছিদ্র টুপিটাও সে লোকের মাথা থেকে খুলে নিত আর টুপি না পরা লোকের মাথাটাই কেটে নিত। জ্যান্ত-মরা, কাছের-দূরের সবকিছুর ওপরই সে বসিয়েছিল দুঃসহ করের বোঝা, পশুর খাদ্য থাকলেও কর দিতে হত, না থাকলেও দিতে হত, আবহাওয়া ভাল হলেও, খারাপ হলেও কর দিতে হত ও কর দিতে হত উটের পায়ের ছাপ পড়লে, চুলার ধোঁয়া উঠলে। লোকেরা মনের দুঃখে বলত, 'ন্যায়পরায়ণ রাজার রাজ্য থেকে বসন্ত বিদায় নেয় না আর স্বেচ্ছাচারী রাজার রাজ্যে বসন্ত আসেই না।'

প্রায়ই আবলাই তার বিরাট সৈন্যদল নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলো আক্রমণ করত, সেইসব রক্তাক্ত অভিযানের পর বহুদিন পর্যন্ত ঘাস গজাত না মাটিতে।

অভিযানে জয়লাভের পরে দেশে ফিরে খান পরের বার অভিযানে যাওয়া পর্যন্ত সময়টা কাটাত ভোজউৎসবে, হুল্লোড়ের মধ্যে, ঘোড়দৌড় পশুশিকার, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। যেমন প্রজা বন্দীদের উৎপীড়নে, তেমনই আমোদপ্রমোদেও সে কোন সীমা পরিসীমা জানত না।

একবার কাল্মিক স্তেপে সাফল্যজনক আক্রমণের পরে খান পাহাড়ের পাদদেশে স্বচ্ছজলের হ্রদ বরাবাইয়ের তীরে গিরিখাত কক্‌চেতাউতে ইয়ুরতা খাটিয়ে দলবল নিয়ে বিজয়উৎসব আরম্ভ করল। হাজারটা মোটাসোটা ঘুড়ী আর হাজার দশেক ভেড়া কাটা হল ভোজউৎসবের জন্য, ফেনা ওঠান কুমিসের স্রোত বইল পাহাড়ী নদীর মত। চটুকারদের জিভ ফুলে গেল অনর্গল

খানের স্তুতি করে, খানের বন্দনাগান গেয়ে গেয়ে গায়কদের গলা ভেঙে গেল, দোম্বরা আর কবিজগুলিতে* নতুন তার লাগাতে হল চল্লিশবার, তবুও আবলাইয়ের আর মন ভরে না, আরো নতুন কোন ফুর্তি জমাবার ইচ্ছা হল তার।

আমোদউল্লাস যখন খুব জমে উঠেছে আবলাই দামী গালিচা থেকে উঠে নিজের ইয়ুরতাতে গিয়ে ঢুকল, হাত ধরে বার করে নিয়ে এল বন্দিনী এক কালমিক যুবতীকে।

মেয়েটিকে দেখে যোদ্ধাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, তার থেকে চোখ সরাতে পারছে না তারা।

খান চীৎকার করে বলল, 'কে একে বিয়ে করতে চায় ? বল !'

ভীড়ের মধ্যে আলোড়ন উঠল, হাজারটা হাত এগিয়ে এল খানের দিকে, তাদের চীৎকার ছড়িয়ে পড়ল দূরে দূরান্তরে, যেন একপাল উট ডেকে উঠল।

'আমাকে ! আমাকে ! খান, আমায় দিন মেয়েটিকে !' চীৎকার করে উঠল যোদ্ধারা, প্রত্যেকেই চেষ্টা করছিল অন্যের থেকে বেশী জোরে চীৎকার করতে।

কেবল একজন সৈন্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণচোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। চোখে তার স্বচ্ছদৃষ্টি, পুরুষত্বব্যঞ্জক চেহারা, অতি সাধারণ পোশাকপরা। সৈন্যদলের মধ্যে তারই বয়স সব থেকে কম, রাখালের ছেলে, নাম তার — আদক।

হাত তুলল খান, সবাই চুপ করে গেল।

'একটি কনের জন্যে পাত্রের সংখ্যা বড় বেশী দেখছি !' হা-হা করে হেসে বলল খান, তারপর বন্দিনীর দিকে ফিরে বলল:

'তুই নিজেই তোর বরকে বেছে নে, আমরা এখুনি তোর বিয়ে দেব।'

মেয়েটির মুখচোখ বিষণ্ণ, কিন্তু একটুও দ্বিধা না করে দৃঢ়স্বরে সে তখুনি উত্তর দিল:

'আমি চাই হুজুর, যে সবার চেয়ে শৌর্যবান ও বুদ্ধিমান সেই আমার স্বামী হোক !'

'কি করে তা' জানা যাবে ?'

'হ্রদের তীরে যে পাহাড়টা সব থেকে উঁচু সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটা সরু লাঠির ডগায় সাদা নিশান টাঙিয়ে দিতে আদেশ দিন, হুজুর। যে একবার তীর ছুঁড়েই নিশানটা পেড়ে ফেলবে সেই সবচেয়ে শৌর্যবান। তারপর আমি একটা গল্প বলব যে সেই গল্পের প্রকৃত অর্থ বলে দিতে পারবে সেই সবার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।'

'ঠিক আছে,' বলল খান।

সেই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নিশান উড়তে লাগল পতপত করে, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর গিয়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে, কিন্তু একটাও লক্ষ্যে গিয়ে পড়ল না।

খান প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েটির চুলের বেনী ধরে মাটিতে ফেলে মারতে লাগল তাকে:

'আমার সৈন্যদলের নামে কলঙ্ক দেওয়ার ইচ্ছে ! কোন বীরপুরুষই নেই পৃথিবীতে যার তীরটা অত উঁচুতে গিয়ে পেঁছতে পারে।'

---

* দোম্বরা, কবিজ — কাজাখ বাদ্যযন্ত্র।

এমন সময় একটা করুণ চীৎকার শোনা গেল আকাশ থেকে। সবাই মাথা তুলে দেখল: ভয়ার্ত একটা বুনো হাঁস উড়ে চলেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আর তার পিছনে ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে এক রক্তপিপাসু ঈগলপাখী। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কার যেন তীর শাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সেই মুহূর্তে সাদা পতাকাটা ফেঁড়ে দিয়ে আরো উঁচুতে উঠে গিয়ে ঈগলটার ঘাড়ে গিয়ে বিঁধল। ঈগলটার রক্ত পড়তে লাগল, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে হ্রদের মধ্যে গিয়ে পড়ল সেটা, অক্ষত হাঁসটা আকাশের নীলে মিলিয়ে গেল।

'কে ছুঁড়ল তীরটা?' বিস্মিত খান জিজ্ঞাসা করল।

সব সৈন্যরা একসঙ্গে উত্তর দিল:

'আদক!'

'এগিয়ে এস, আদক! আমি দেখতে চাই তোমার মত বীরপুরুষকে।'

যুবকটি কাছে এলে খান তাকে আলিঙ্গন করে বলল:

'তুমি সত্যিই বীর, আদক। আমি তো এতদিন জানতামই না যে তুমিই আমার সৈন্যদলে সব থেকে শৌর্যবান যোদ্ধা। বন্দিনী তোমার! নাও একে।'

'প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নি, হুজুর,' বলল আদক, 'ও তো আমাদের গল্প শোনাতে চেয়েছিল।'

খান তাকাল যুবতীর দিকে, মেয়েটি জামার হাতায় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে গল্প আরম্ভ করল:

'একদিন এক চিল এক পায়রার বাসা ভেঙে ফেলল, পায়রার ছানাকেও মেরে ফেলতে যাচ্ছিল। পায়রাটা কাঁদতে কাঁদতে উড়ে যাবার সময় এক বাজপাখীর দেখা পেল। বাজপাখী পায়রার দুঃখের কথা শুনে চিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা টুকরো টুকরো করে ফেলল।

'তুমি আমাদের জীবন রক্ষা করলে, এর প্রতিদান কিভাবে দেব?' জিজ্ঞাসা করল পায়রা।

বাজপাখী বলল: 'তোর মেয়ের পাখনার জোর যখন আর একটু বাড়বে তখন ও যেন আসে আমার কাছে, ওর বুকের থেকে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নেব আমি।'

অনেকদিন গেল। বাজপাখী বহুদিনই এ ঘটনার কথা ভুলে গেছে কিন্তু মাপায়রা সেকথা একদিনের জন্যও ভোলে নি, মেয়ে বড় হচ্ছে দেখে চিন্তায় সে ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগল। মেয়ের রূপও ওদিকে ফুলের মতই ফুটে উঠল, পাখীদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী।

এক নির্ভীক শ্যেনপাখী তাকে ভালবাসল, মেয়েটিও তাকে ভালবেসে ফেলল।

'চিরকালের জন্য আমার হও তুমি!' প্রার্থনা জানাল শ্যেনপাখী।

কিন্তু সুন্দরী পায়রাটি বলল:

'প্রথমে বাজপাখীর কাছে ঋণমুক্ত হতে হবে আমায়।' তার জীবন রক্ষা পাওয়ার কাহিনী সে বলল শ্যেনপাখীকে।

শ্যেনপাখী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'যাও তুমি রওনা দাও। আমাদের সুখের থেকে বেশী প্রয়োজন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। তোমাকে ধরে রাখতে পারব না আমি।'

চোখের জলে ভেসে তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিল, আর পায়রা উড়ে চলল দূরে সেই বাজপাখীর সন্ধানে।

পথে সে পড়ল এক শিকারীপাখীর খপ্পরে। পাখীটা তাকে ঠুকরোতে চাইল কিন্তু পায়রার কাহিনী শুনে সেও মাহাত্ম্য দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

তারপর তিনটি ঈগল-পেঁচা ধরল তাকে কিন্তু তার কথা শুনে, তাকে শিকারীপাখী ছেড়ে দিয়েছে জেনে তারাও তাকে চলে যেতে দিল।

পায়রাটা শেষ পর্যন্ত বহু দূরের এক গ্রামে বাজপাখীকে খুঁজে পেল।

'কে তুই ?' সুন্দরী পায়রাকে বাজপাখী জিজ্ঞাসা করল।

পায়রা তাকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল। বাজপাখী বলল:

'তোর মত এমন সুন্দর আর পরিষ্কার মনের পাখী আর দেখি নি। কিন্তু আমি ঠাট্টা করে তোর মাকে ওকথা বলেছিলাম। তুই যখন বড় হয়ে উঠবি তখন মেরে ফেলব বলে শিশুবয়সে তোকে বাঁচাই নি। যা, নিজের ভাবী স্বামীর কাছে ফিরে যা ঠিকমত।'

মনে অপরিসীম আনন্দ নিয়ে পায়রা ফিরে চলল, প্রায় নিজের বাসার কাছে পেঁাছে গেছে এমন সময় হঠাৎ এক নির্দয় ঈগলপাখী তাকে ধরে নিয়ে চলল অন্য দেশে, পায়রার প্রার্থনা কান্না কিছুতেই তার মন গলল না। কে জানে, তার নিষ্ঠুর কবলে পড়ে বেচারী পাখীটার কি দশা হল...'

যতক্ষণ মেয়েটি গল্প বলছিল কেউ কথাটি বলে নি, শেকলের আওয়াজ শোনা যায় নি, হ্রদের জলও ছলাৎছলাৎ করে নি, স্তেপের ঘাসও দোল খায় নি। আর খান গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

'বেশ জটিল তোর গল্পটা,' শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল খান। 'তুই এ গল্পের অর্থ বুঝিস, আদক ?'

যুবকটি বলল, 'বুঝি হুজুর, কিন্তু তার আগে আপনি আপনার সব যোদ্ধার সামনে কথা দিন যে আমি যা বলব তার জন্য এই বন্দিনীকে বা আমাকে কোন সাজা পেতে হবে না।

'কথা দিলাম,' বলল খান, গল্পটির অর্থ জানবার জন্য খানের মন ছটফট করছে। 'বল শীগগির।'

আদক বলতে আরম্ভ করল:

'এতক্ষণ আপনারা যা শুনলেন তা আসলে গল্প নয়, সত্যঘটনা। বন্দিনী নিজের জীবনের কাহিনীই বলেছে গল্পের মধ্য দিয়ে। যখন সে ছোট ছিল তখন একদিন তাদের ইয়ুরতায় হানা দেয় এক দস্যু, এক মহৎহৃদয় বীরপুরুষ ঘটনাচক্রে সেখানে এসে পড়েন, তিনি শিশুটিকে রক্ষা করেন এবং দস্যুটিকে দণ্ড দেন। বীরপুরুষটি ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে মেয়েটি বড় হয়ে যেন তাঁর কাছে আসে, তিনি তাকে নিজের স্ত্রী করবেন। দিন যায়। বড় হয়ে উঠল মেয়েটি এমনি সুন্দর হয়ে যেমন আপনারা দেখছেন। তারই উপযুক্ত এক যুবককে ভালবাসল সে। কিন্তু যুবকটি তার পাণিপ্রার্থনা করলে মেয়েটি সমস্ত কথা খুলে বলল তাকে, তখন যুবকটি বলল যে সৎলোকের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

'অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করতে হল মেয়েটিকে বীরপুরুষটির কাছে পেঁাছবার জন্য।

একদিন সে এক পরদেশীর কবলে পড়ল, কিন্তু তার সেই অদ্ভুত যাত্রার কথা শুনে ছেড়ে দিল সম্মান দেখিয়ে, কোন ক্ষতি করল না, তারপর জনহীন স্তেপের মধ্যে তিনটি চোর তাকে ধরে। মেয়েটির সাহস ও দৃঢ়তায় অভিভূত হয়ে তারাও তাকে ছেড়ে দিল আর বলল:

'আমরা কি বন্য জন্তুর থেকেও অধম যে নির্ভীক এই মেয়েটির ক্ষতি করব, যাকে এমনকি অজানা পরদেশীও ছেড়ে দিয়েছে!'

'বহুদিন ধরে পথচলার পরে মেয়েটি সেই বীরপুরুষের বাসস্থান খুঁজে পেল। উদার সেই লোকটি মেয়েটিকে দেখে কি বলল তা আপনারা গল্পেই শুনেছেন।

'যখন মেয়েটি ফিরে আসছে তার প্রিয়তমের কাছে, তখনই আপনি ওকে দেখেন, নির্দয় ঈগলপাখীর মত ওকে ধরে নিয়ে আসেন। কে জানে আপনার হাতে ওর শেষ পর্যন্ত কি হবে।'

'আদক ঠিক বলেছে?' খান মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, খান, আদক ঠিকই বলেছে,' উত্তর দিল মেয়েটি।

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি আর রাগ চেপে খান বলল, 'ওর ভাগ্য নিয়ে আর ভাবার দরকার কি, ওর ভাগ্য তো নির্দ্ধারিত হয়েই গেছে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে আদক তুমিই ওকে জয় করেছ। তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি একে, তোমার স্ত্রী হোক ও।'

অন্য যোদ্ধারা চোখে ঈর্ষা নিয়ে তাকাল আদকের দিকে আর বন্দিনীও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন কি প্রত্যাশা নিয়ে। আদক একটু হেসে বলল:

'এতদিন পর্যন্ত আপনি আমার বীরত্ব জানতেন না হুজুর, আর আপনার ধারণাও ছিল না যে আপনার দরিদ্রতম যোদ্ধার মাথায় বুদ্ধি আছে, আর আমার মনের মধ্যে কি আছে তা আপনি এখনও জানেন না। যা আমার নয় তা আমি নেব কি করে? অসহায়ের সর্বস্বঅপহরণকারী চোরগুলোর মায়া হয়েছে এর প্রতি, আমি কি তাদের চেয়েও হীন হব? আপনি যখন বন্দিনীকে আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন তখন ওর ভাগ্য নির্দ্ধারণ করার অধিকার আমার আছে। আর তুমি, মেয়ে, আমার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দাও প্রিয়জনের কাছে, তোমার এই যাত্রা সুখের হোক!'

অন্যান্য যোদ্ধারা তার এই কথা শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। খানও চুপ করে রইল। আর মেয়েটি নত হয়ে আদককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উত্তেজনাকম্পিত কণ্ঠে বলল:

'ধন্যবাদ তোমায়, মানবশ্রেষ্ঠ আদক, তোমার দয়ার জন্য! স্বীকার করতে বাধা নেই তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চাইতে বরাবাইয়ের জলে ঝাঁপ দিয়ে তার হিম তলদেশে আশ্রয় নিয়ে তোমার হাত থেকে বাঁচতাম। কিন্তু তুমি আমার জীবন ফিরিয়ে এনেছ। তোমাকে আমার ভাই বলে ভাবতে দাও আর তুমি আমার এই পথের সঙ্গী আর আমাদের বিয়েতে অতিথি হও!'

আদকের আচরণে মুগ্ধ হয়ে সবাই তাকে আলিঙ্গন করতে লাগল আর খানকে তারা অনুরোধ করতে লাগল আদককে মেয়েটির সঙ্গে যাবার অনুমতি দিতে।

আদক আর কালমিকসুন্দরী লাফিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে লাগামে টান দিল, দমকা হাওয়ার মত ছুটে চলল তারা স্তেপের ওপর দিয়ে।

চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প

এক লোভী ও নিষ্ঠুর খান ছিল।

যুদ্ধঅভিযান, ভোজউৎসব, শিকার, উদ্দাম খেলাধুলা সবেতেই তার বিরক্তি ধরে গেল। তখন সে এক অদ্ভুত বার্তা দিয়ে দূর দূরান্তরে লোক পাঠাল।

'যে খানকে চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প বলতে পারবে একটুও না থেমে আর একটাও সত্যি কথা না বলে, সে থলিভর্তি মোহর পাবে। কিন্তু যে গল্প বলতে বলতে একটুও থামবে বা একটাও সত্যি কথা বলবে তাকে অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হবে, অনাহারে মৃত্যু হবে তার।'

লোকে বলে সোনার জন্য সৎ ও ধার্মিক লোকও ন্যায়ের পথ ত্যাগ করে। দলে দলে কবি, গল্পকার, হাস্যরসপ্রিয় লোক আসতে লাগল খানের তাঁবুর দিকে।

কিন্তু তাদের কেউই খানকে খুশী করতে পারল না: হাজার হাজার লোক স্থান পেল অন্ধকার কারাকক্ষে। শেষ পর্যন্ত খানকে গাঁজাখুরি গল্প শোনাবার লোক আর কেউ রইল না।

নিজের বিশ্রামাগারে খান বিবিধ অলংকরণে অলঙ্কৃত পালঙ্কে শুয়েছিল মুখ অন্ধকার করে। তার চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা উজীররা একটু নড়তেচড়তেও ভয় পাচ্ছিল। ভৃত্যেরা সোনার থালায় বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য খাদ্যপানীয় সাজিয়ে নিয়ে এসে দূরে দাঁড়িয়ে থাকছিল।

খান ইঙ্গিতে আহার্য ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলছিল আর মাঝেমাঝে চারপাশে এমন তাকাচ্ছিল যে হাত-পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল সবার।

এমন সময় খানের সুন্দর, সাজানো ইয়ুরতার কাছে এসে হাজির হল একটি হাসি-খুশী ছেলে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকপরা, খালি পা, রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা, হাতে একটা ছেঁড়া থলি।

'এখানে তুই ঘোরাঘুরি করছিস কেন? কি চাই?' প্রহরীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

'আমি খানকে চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প শোনাতে এসেছি,' চটপটে উত্তর দিল ছেলেটি।

জীবনে অনেক রক্ত দেখেছে এই প্রহরীরা, তাদেরও মায়া হল ছেলেটির জন্য।

'সময় থাকতে পালা বলছি। তোকে ছাড়াই কারাগার ভর্তি হয়ে গেছে। নাকি বাঁচতে ইচ্ছে নেই তোর?'

'ছ' দিন না মরে বাঁচার থেকে একদিন ভাল করে বাঁচা ভাল।' প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ভিখারী ছেলেটি।

'খানকে তুই ভয় পাস না ?' অবাক হয়ে প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করল তাকে।

'যে সাহসী তাকে ডাইনীবুড়ীও ছোঁয় না !' হাসিমুখে উত্তর দিল ছেলেটি।

প্রহরীরা তাকে খানের ইয়ুরতার মধ্যে নিয়ে গেল।

ছেঁড়া টুপিপরা, কালো কালো পায়ে ডিঙি মেরে চলা এই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রাগে খানের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'এই ছেঁড়াকানি পরে আমার সামনে আসার সাহস হয় তোর ? তোকে নখে টিপে মেরে ফেলব আমি !'

'উত্তেজিত হবেন না হুজুর,' ভিখারী ছেলেটি খানের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল। 'তাড়াহুড়ো করলে কোন কাজই ভালভাবে শেষ করা যায় না। তার থেকে আমার আষাঢ়ে গল্প শুনে মোহরের থলিটা দিয়ে দিতে হুকুম দেন যদি তো ভালই হবে।'

প্রচণ্ড রাগে খান বালিশে হেলান দিয়ে বসে হিসহিস করে বলল:

'বল তাহলে। শুনছি আমি।'

আরম্ভ করল ছেলেটি:

'আমার জন্মাবার বছর সাতেক আগে আমি আমার বারোনম্বর নাতির ঘোড়ার পাল চরাতাম।

'একদিন গভীর রাতে ঘোড়ার পালকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেলাম আমি। সূর্যের রোদে উজ্জ্বল চারদিক, আর এত গরম যে পাখীর ডানা থেকে ধোঁয়া উঠছিল আর তাদের লেজগুলো জ্বলছিল। তাই যখন আমি দেখলাম যে হ্রদের জল একেবারে নীচে পর্যন্ত জমে গেছে তখন একটুও আশ্চর্য হলাম না।

'কুড়ুল দিয়ে বরফটা ভাঙব ভাবলাম। কিন্তু প্রথমবার আঘাত করতেই কুড়ুলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, বরফ কিন্তু একচুলও নড়ল না। কি করি এখন, ভাবলাম আমি। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

'কাঁধ থেকে মাথাটা খুলে নিয়ে ঘাড়টা শক্ত করে ধরে কপাল দিয়ে ঠুকতে লাগলাম বরফের উপর। কিছুক্ষণ পরে একটা গর্ত খুঁড়তে পারলাম শেষ পর্যন্ত। আর এমন বড় যে কড়ে আঙুলটা ভালভাবেই ঢুকে যায় সেখানে। সেই গর্তটা থেকেই তো আমার পালের হাজারটা ঘোড়া প্রাণভরে জল খেল।

'জল খেয়ে ঘোড়াবা বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল, ঘাস ছিঁড়তে লাগল। আর আমি ঘোড়ার পালের দিকে পিছন ফিরে বসে ঘোড়াগুলোকে গুণতে লাগলাম সব ক'টা অক্ষত আছে কিনা। দেখি — একটা ঘোড়া কম পড়ছে, কোথায় গেল সেটা ?

'ঘোড়া ধরবার জন্য ফাঁস লাগান লাঠিটা বালির মধ্যে গুঁজে দিয়ে তার ওপরে উঠে চারদিক দেখতে লাগলাম ঘোড়াটাকে দেখা যায় কিনা।

'না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'লাঠিটার আগায় ছুরি গুঁজে দিয়ে আরো উপরে উঠলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

'এমন সময় মনে পড়ল ছোটবেলা থেকেই আমার ছুঁচ চিবানোর স্বভাব। দাঁতের ফাঁক থেকে একটা ছুঁচ বার করে ছুরির হাতলে ফুটিয়ে দিলাম — যা হয় হবে আরো উপর উঠলাম।

'কষ্টে উপরে উঠেছি একদিন কি একমাস ধরে, কিন্তু যেই ছুঁচের গর্তের মধ্য দিয়ে তাকালাম অমনি হারিয়ে যাওয়া ঘোড়াটাকে দেখতে পেলাম: ভয়ংকর সমুদ্রের মাঝে একটা পাহাড় মাথা তুলেছে, কাঁটার মত ছুঁচাল তার চূড়াটা, সেই পাহাড়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘোড়াটা আর তার বাচ্চাটা পাহাড়ের চারদিকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

'বেশীক্ষণ চিন্তাভাবনা না করে লাঠিটার ওপর চড়ে বসলাম, আর ছুরিটাকে দাঁড় করে বাইতে লাগলাম। এইভাবে চললাম সমুদ্র দিয়ে। চলছি তো চলছিই কিন্তু জায়গা ছেড়ে একটুও নড়তে পারছি না। তখন আমি ছুরির ধারাল অংশটার ওপর বসলাম আর লাঠিটা দিয়ে সমুদ্রের তলে চাপ দিয়ে সেই ধাক্কায় এগিয়ে চললাম, পর মুহূর্তেই পেঁৗছে গেলাম সেই পাহাড়টার কাছে। লাঠিটা ওদিকে লোহার মত ডুবে গেল সমুদ্রে।

'লাঠিটা ছাড়া ঘোড়াটাকে ধরব কি করে? বালিকে পাক দিয়ে দিয়ে একটা ফাঁসদড়ি তৈরী করলাম, সেটাকে ঘোড়ার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে পেছন দিকে মুখ করে ঘোড়ায় উঠে বসলাম, নিজের সামনে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়ে ফিরে চললাম সমুদ্র বেয়ে।

'অর্ধেক পথ পেরিয়ে আসার পরে ঘোড়াটা হঠাৎ ঢেউতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ডুবে যেতে লাগল।

'ভাবলাম ওঃ সেই প্রবাদবাক্যটাই সত্যি হতে চলেছে 'যদি অভাগার নিমন্ত্রণ হয় ভোজে তো সেই দিনই সে অসুখে পড়ে।' আমি কিন্তু দিশা না হারিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম বাচ্চা ঘোড়াটার পিঠে আর বড় ঘোড়াটাকে টেনে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছোটালাম।

'তীরে পেঁৗছে ঘোড়াটাকে সবে একটা গাছে বেঁধেছি, হঠাৎ গাছের ডাল থেকে আমার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল একটা খরগোস। খরগোসটার পেছনে তাড়া করলাম আমি। খরগোসটা বাঁ দিকে দৌড়ল আর আমি দৌড়লাম ডান দিকে, খরগোসটা খুব জোরে দৌড়চ্ছে আমি আরো জোরে।

'ছুটতে ছুটতেই তীর নিয়ে ছুঁড়তে থাকি, তীরের ধারাল ফলাটা গিয়ে লাগল খরগোসের নাকে, কিন্তু ফসকে পড়ে গিয়ে তীরটা আবার ফিরে এল আমার হাতে।

'তখন আমি তীরের ভোঁতা দিকটা সামনের দিক করে ছুঁড়লাম। একদিন বাদে তীরটা খরগোসটার কাছে পেঁৗছে তাকে একটা পাথরে বিঁধে ফেলল।

'খরগোসটার ছাল ছাড়িয়ে, তার চর্বিটা জড়ো করতে লাগলাম আর ঘুঁটে কুড়াতে লাগলাম জামার কোঁচড়ে, আগুন জ্বালাব বলে।

'এমন সময় — আরে ও কি? আমার ঘোড়াটা হঠাৎ চিঁহি করে ডেকে উঠে ছটফট করতে

লাগল আর ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরোতে লাগল তার মুখ দিয়ে, ওপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমশ ঘোড়াটা।

'প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি, তারপর বুঝলাম ঘোড়াটাকে আমি গাছের সঙ্গে বাঁধি নি, বেঁধেছি রাজহাঁসের গলায়।

'ঘুঁটেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রাণপন দৌড় দিলাম বেচারী ঘোড়াটাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। ঘুঁটেগুলো ওদিকে হিস্‌হিস করতে করতে ডানা ঝাঁকিয়ে একেবারে মেঘের ওপরে উড়ে চলে গেল। বুঝলাম, কোঁচড় ভরে আমি তুলেছিলাম বটের আর ভারুই পাখি।

'আগুন জ্বালাবার মত কোন জ্বালানি না থাকলেও শেষ পর্যন্ত আগুন জ্বালালাম আমি। একটা নতুন তামার কড়াইতে খরগোসের চর্বিটা রেখে আগুনে বসালাম আমি। দেখি — নতুন কড়াইটা থেকে চর্বি পড়ে যাচ্ছে, কড়াইটার গা ভেদ করে এমনভাবে চর্বি পড়ছে যে শীগগিরি আর কিছুই থাকবে না ওটাতে। বাধ্য হয়ে ফুটো কড়াইটাতেই চর্বিটা ঢাললাম। তখন অবশ্যই চর্বি আর এক ফোঁটাও পড়ল না। মনে আছে আমার দশটা গরুর মশক ভরে নিয়েছিলাম সেই গলান চর্বিতে।

'ভাবলাম চর্বি ঘষে আমার জুতোগুলো চকচকে করে নেব। কিন্তু একটা জুতোতে মাখাতেই সব চর্বি শেষ হয়ে গেল, অন্যটার জন্য আর রইল না।

'রাতের বেলায় কড়াইয়ের নিচে বসে তন্দ্রায় ঢলে পড়লাম। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ শুনি হৈ-চৈ! ঝগড়াঝাঁটি! ভয়ে লাফিয়ে উঠে দেখি আমার দুই জুতো মারপিট বাধিয়ে দিয়েছে। চর্বি-না-মাখানো জুতোটা অন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্দয়ভাবে মারছে আর বলছে:

'লোভী, আর কখনও লোভ করবি? আমার জন্যে একটুখানি চর্বিও রেখে দিতে পারলি না?'

'ওদের ঝগড়া থামাতে লাগলাম আমি:

'ছেড়ে দে ওকে, হিংসুটে! একেবারে ক্ষেপে উঠেছে! কথায় বলে: দু'জন বুদ্ধিমান লোকের দেখা হলে — দু'জনেরই লাভ হয়, আর দু'জন বোকার দেখা হলে — চোখ কানা হয় তাদের।'

'কষ্টে তাদের শান্ত করলাম। জুতোগুলোকে পাশে রাখলাম — একটাকে বাঁপাশে, অন্যটাকে ডানপাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

'সকালে ঘুম ভেঙে দেখি চর্বি-না-মাখান জুতোটা নেই, কথা শুনল না, রাগ করে চলে গেছে। অন্য জুতোটা দু'পায়ে পরে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া জুতোটাকে খুঁজতে বেরোলাম।

'দিন যায়, বছর যায় — খুঁজেই বেড়াই অন্য জুতোটাকে। খুঁজতে খুঁজতে একটা গ্রামে এসে পেঁছিলাম। গাদা গাদা লোক এসে জমায়েত হয়েছে সে গ্রামে। আরো আসছে: কেউ ষাঁড়ের পিঠে, কেউ গুবরে পোকায় চড়ে, কেউ বা সজারুর পিঠে, কেউ ঢোঁড়া সাপে, কেউ পাহাড়ী ছাগল, কেউ বা সারসে চেপে।

'ভোজউৎসব আরম্ভ হচ্ছে।

'কিসের ভোজউৎসব ?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'উৎসব নয়, শোকপালন হচ্ছে।'

'কার জন্য ?'

'জমিদারের ছেলের। বছর সাতেক আগে সে ছাগলের পাল নিয়ে চরাতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি, কেউ তার খবর কিছু জানে না।'

'এমন সময় ভৃত্যেরা থালায় করে করে মাংস নিয়ে আসতে লাগল, সেই ভৃত্যদের মধ্যে — আরে এযে দেখি আমার পালিয়ে যাওয়া জুতোটা।

'আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম, আমার গলা শুনে ফিরে তাকাল সে, এমন হকচকিয়ে গেল যে আর একটু হলে থালাটা পড়ে যেত হাত থেকে।

'পালিয়ে যাওয়ার জন্য তার কপালে মার খাওয়া জুটবে এই ভয়ে সে আমার সামনে একটার পর একটা থালা সাজিয়ে দিতে লাগল আর বলতে লাগল:

'তুমি আমাকে খরগোসের চর্বি দিতে পারলে না একটুও, আমার কিন্তু তোমাকে সবকিছু দিয়ে দিতেও একটুও কষ্ট হবে না।'

গাদা গাদা খাবার এনে রাখতে লাগল সামনে।

'খুশী হলাম খুব — নিজের জন্য আর সব আত্মীয়স্বজনের জন্যে এমন করে পেটভরে খেতে আর কবে পাব ! দু' হাত ভরে মাংস নিয়ে বিরাট একটা হাঁ করতে যাব এমন সময় মনে পড়ল, আরে আমার মুখ কেন গোটা মাথাটাই তো নেই — মাথাটাকে ভুলে ফেলে এসেছি হ্রদে জমা বরফের মধ্যে গর্তটার কাছে...

'জুতোগুলোকে বললাম: 'লক্ষ্মী সোনা, যাও ছুটে গিয়ে আমার মাথাটা নিয়ে এসো, না বলো না ... তোমাদের এ উপকার আমি মনে রাখব।'

'জুতোগুলো চলে গেল আমার মাথা আনতে আর আমি বসে বসে অপেক্ষা করছি। আমি বসে আছি এদিকে অন্যদের মুখের বিরাম নেই, সব মাংস থালাবাটিশুদ্ধু খেয়ে নিল তারা, এককণাও পড়ে রইল না আমার জন্য। যার ভাগ্য খারাপ বৃষ্টিহীন দিনেও সে ভিজে গোবর হয়ে যাবে।

'মাথাটা ঠিকঠাক করে নেওয়ামাত্রই হঠাৎ আকাশে মেঘ ভীড় করে এল আর খরমুজ পড়া আরম্ভ হল আকাশ থেকে। একটা খরমুজ কাটব ভাবলাম, বিঁধিয়েও দিলাম ছুরিটা, কিন্তু ছুরিটা খরমুজের মধ্যে পড়ে গেল কিছু বোঝার আগেই।

'ছুরিটা খুঁজে বার করবই, তার জন্যে যদি নিজের পেটের মধ্যে ঢুকতেও হয় সেঁও ভি আচ্ছা,' বললাম আমি।

'কোমরবন্ধনীটা খুলে নিয়ে তার প্রান্তটা ধরে মাথা নীচুদিকে করে ঝাঁপ দিলাম খরমুজের মধ্যে।

• 'খুঁজতে খুঁজতে বেশ কয়েকদিন কাটল, জুতো, কোট সবকিছুই ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ছুরিটা কিন্তু আর খুঁজে পাই না কিছুতেই।

'হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম একদিন।

'কি করছিস এখানে?' জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

'ছুরি খুঁজছি।'

'পাঁঠা তুই একটা, গাছপাঁঠা!' চীৎকার করে উঠল লোকটা। 'মাথায় কিসসু নেই! ছুরি খুঁজছে! এখানে সাতবছর ধরে আমি খুঁজছি আমার ছাগলের পাল, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না, আর...'

'সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম এ হল সেই জমিদারের ছেলে যার শোকপালন হতে দেখেছি আমি।

'শুধু শুধু ঝগড়া বাধাচ্ছ কেন? ছাগল খোঁজা ছেড়ে শোকার্ত বাবামার কাছে ফিরে গেলেই তো পার।' বললাম আমি।

'ছাগলের চেয়ে আমার বাবামা বেশী হল তোর কাছে!' বলে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুঠি করে ধরল আমার দাড়ি।

'আমিও আর সহ্য করতে পারলাম না। দু'জনে জাপটাজাপটি করে মারপিট আরম্ভ হল।

'আমাদের ধস্তাধস্তিতে খরমুজটা নড়ে উঠল তারপর গড়িয়ে চলল মাটির ওপর দিয়ে। গড়াতে গড়াতে গিয়ে উঠল এক উঁচু পাহাড়ের ওপর, পাহাড়টার একেবারে চূড়োয় উঠে ফেটে দু'টুকরো হয়ে গেল খরমুজটা।

'জমিদারের ছেলে পাহাড় থেকে কোথায় গিয়ে পড়ল দেখতে পেলাম না, আমি দুম করে গিয়ে পড়লাম সেই হ্রদের কাছে যেখানে আমার ঘোড়ার পাল রেখে গিয়েছিলাম। এমন জোরে পড়লাম যে মাটিটা বসে গেল খানিক! আমার কিন্তু একটুও লাগল না। হঠাৎ ভীষণ তেষ্টা পেয়ে গেল। বোধহয় খাওয়ানদাওয়ানের ঐ চর্বিওলা মাংসটার জন্য যেটা শেষ পর্যন্ত আমার আর খাওয়া হয়ে ওঠে নি।

'বরফজমা হ্রদের গর্তের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল খেতে লাগলাম। গোটা হ্রদের জলই খেয়ে ফেললাম কিন্তু তেষ্টা মিটল না। উঠবার চেষ্টা করি কিছুতেই পারি না। প্রথমটায় বুঝতে পারলাম না কি ব্যাপার, আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ — যখন আমি জল খাচ্ছিলাম তখন আমার গোঁফে এসে আটকে গেছে ষাটটা বুনো হাঁস আর সত্তরটা পাতিহাঁস।

'এতগুলো পাখী নিয়ে আমার কি হবে?' ভাবলাম আমি।

'সব পাখীগুলোকে জামার নীচে রেখে দিলাম পরে সেগুলোকে পরিণত করলাম একটা সারসপাখীতে। আর হুজুর, ঐ সারসটা উটের থেকে অনেক লম্বা হলেও ঘাড় একটুও না নুইয়ে কূয়োর জল পান করে...'

'ঐ কূয়োটা তাহলে একেবারেই অগভীর!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল খান, গল্পের একেবারে শেষেও অন্তত ছেলেটির বলায় বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

'হতে পারে কূয়োটা অগভীর কিন্তু ভোরবেলায় তার ভেতরে একটা পাথর ছুঁড়ে ফেললে পাথরটা জলে গিয়ে পড়ে কেবলমাত্র রাত্রিবেলায়।' একটুও না ভেবে উত্তর দিল ছেলেটি।

'তার মানে সে সময়ে দিন ছোটো ছিল।' লাফিয়ে উঠে বলল খান।

'হ্যাঁ, দিনগুলোকে ছোটাই বলতে হবে যদি ভেড়ার পাল স্তেপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পেঁৗছে যায় এমন এক দিনের মধ্যেই,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর তৈরী ছেলেটির।

খানের মুখচোখের চেহারা বদলে গেল, ঠোঁট কামড়াল সে। আর ভিখারী ছেলেটা এই বলে শেষ করল, 'আপনার ইচ্ছামত আপনাকে চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প শোনালাম, হুজুর। এবার আমার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন আপনার প্রতিশ্রুতিমত। আরো অর্থব্যয় করতে যদি কষ্ট না হয় আপনার তো আরো চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প বলতে পারি এখুনি। কথার থেকেই তো কথার উৎপত্তি যেমন ভালকাজের থেকেই আরো ভালকাজের উদ্ভব।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে খান মাথা নাড়িয়ে উজীরদের ইঙ্গিত করল, উজীররা বস্তায় মোহর ভরতে লাগল। বস্তাটা যত ফুলে উঠতে লাগল, লোভে খানের মন ততই জ্বলতে লাগল।

বস্তাটা প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে এমন সময় ভিখারী ছেলেটা নোংরা হাত তুলে বলল:

'হুজুর, আমার মোহর চাই না। তুমিই রাখ সে মোহর। তার বদলে তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখ, তোমার কারাগারে বন্দী হয়ে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের মুক্তি দাও।'

এই কথা শুনে পাগলের মত চীৎকার করে উঠে খান ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহরের বস্তাটার ওপর ঠিক যেমন শকুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে মরা জন্তুর মৃতদেহের ওপর। সারা শরীর দিয়ে চাপা দিয়ে ফেলল বস্তাটাকে।

উজীররা বুঝল খান কোনটা চান। চাবি ঝনাৎ ঝনাৎ করতে করতে তারা কারাগারের দরজাগুলি খুলে দিতে লাগল।

সব কারাকক্ষই শূন্য হয়ে গেল, চল্লিশটা গাঁজাখুরি গল্প বলা সেই গরীব ছেলেটাও কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

এদিকে খানকে কিন্তু নড়ান গেল না সেই বস্তাটার ওপর থেকে। তিন দিন বাদে সেই অবস্থায়ই খান মারা গেল।
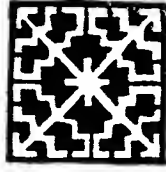
দুই ঠগের গল্প

বহুদিন আগে দু'জন আমুদে ঠগ ছিল: একজন থাকত সির-দরিয়ার স্তেপ অঞ্চলে, অন্যজন সারি-আরকার স্তেপ অঞ্চলে। তাদের কীর্তিকলাপের কাহিনী বহুদূর অবধি পৌঁছেছিল আর তারা দু'জনেই পরস্পরের কথা বহুবার শুনেছে।

শেষে দু'জনেই মনে মনে ভাবল দু'জনের দেখা হলে বেশ হয়, তাদের চাতুরী আর ধূর্ততার পরিমাপ করা যায় তাহলে।

জুতোয় ভাল করে চর্বি মাখিয়ে, পোশাকের প্রান্তটা গুটিয়ে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল পথে। চলতে চলতে একদিন তাদের দেখা হল পথে সম্প্রতি তৈরী হওয়া একটা মাজারের কাছে। পুরনো বন্ধুর মত পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাল, আলিঙ্গন করল।

'খবর আছে?' জিজ্ঞাসা করল সির-দরিয়ার ঠগটি।

'আছে খবর।' বলল সারি-আরকার ঠগ। 'এই নতুন মাজারটা দেখছ? কিছুদিন আগে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে এক নামকরা জমিদারকে। গরুবাছুর, সোনাদানা অঢেল রেখে গেছে, সেসবই পেয়েছে তার বোকাসোকা ছেলেটা।'

সির-দরিয়ার ঠগ বলল:

'জমিদার তার সম্পত্তি দিয়ে দেবে না তাই গরীবের সময় অমনি নষ্ট করা উচিত নয়... চল আমরা জমিদারের ছেলেটাকে ঠকিয়ে একশ' মোহর বার করে আনি, দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেব।'

সারি-আরকার ঠগ বলল:

'মুখে তোর মাখন পড়ুক। আমি রাজী। কিন্তু কি ভাবে করব?'

ঠগে ঠগে, মনের মিল হতে কি বেশী সময় লাগে? একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল তারা, বিড়ি টানল, তারপর বিভিন্ন ধরণের চাতুরী ভেবে দেখল, শেষে সিদ্ধান্ত নিল।

সির-দরিয়ার ঠগটা মাজারের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল। আর সারি-আরকার ঠগটা মাথায় সবুজ পাগড়ী* পরে পথিকের বেশে এসে ঢুকল মৃত জমিদারের গ্রামে।

জমিদারের ছেলেকে ঠগ বলল:

'বাছা, একসময় তোমার বাবা আমার কাছে একশ' মোহর নিয়েছিল, বলেছিল, "বেঁচে থাকলে নিজেই ফিরত দেব আর বেঁচে না থাকলে আমার ছেলে দিয়ে দেবে।" এবার সেই ধার শোধ করার সময় হয়েছে। বাবার দেওয়া কথা তোমার তো রাখা উচিত।'

জমিদারের ছেলের মুখ হাঁ এমন কথা শুনে। নেবার সময় ছ'টা মোহরও কম আর দেবার সময় পাঁচটাও বেশী। একটু চিন্তা করে সে বলল:

'তুমি কি করে প্রমাণ করবে যে ঠকাচ্ছ না?'

ঠগটি হতাশভাবে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'যদি তুই সবুজ পাগড়ী দেখেও বিশ্বাস করছিস না তো বাবার সমাধির কাছে যা, হয়ত তোর বাবাই তোকে সত্যকথা বলবে।'

উদ্বিগ্ন তরুণ জমিদার মাজারের কাছে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল:

'বাবা, সবুজ পাগড়ীপরা পথিক কি সত্যকথা বলছে যে তুমি ওর কাছে একশ' মোহর নিয়েছিলে?'

তখন সির-দরিয়ার ঠগটা মাজার থেকে রুদ্ধ স্বরে বলল:

'সত্য সত্য বলছে ও, বাছা আমার। ঐ ঋণের জন্যই এখানে আমাকে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে ওকে ফিরিয়ে দে মোহরগুলো, যাতে আমার হাড়গুলো শান্তি পায়।'

সারা শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে জমিদারের ছেলের, তক্ষুনি বাড়ীতে গিয়ে কোন কথা না বলে সে ঠগকে একশ' মোহর দিয়ে দিল।

সারি-আরকার ঠগ সে মোহরের থলিটি পোশাকের নীচে লুকিয়ে রেখে ভাবল:

'বন্ধুটি আমার মাজারে বসে থাক যতক্ষণ না বিরক্তি ধরে যায়, স্তেপে পথভুল হবে না আমার।'

দিনের পর দিন যায়। সে নিজের ইয়ুরতাতে ফিরে এসে চুপিচুপি চুলার নীচে মোহরগুলো পুঁতে রাখল আর স্ত্রীকে আদেশ দিল:

'যদি এখানে এরকম এরকম চেহারার লোক আসে বলবে, আমি হঠাৎ মারা গেছি, প্রথা অনুযায়ী আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তাকে তাড়াতাড়ি করে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, যতদিন ও এখানে থাকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গর্তের মধ্যে খাবার নিয়ে আসবে আমার জন্য, ও চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকব আমি।'

সির-দরিয়ার ঠগ ওদিকে অন্ধকার মাজারে অপেক্ষা করে আছে বন্ধুর জন্য, অনেকক্ষণ

---

* মক্কার পবিত্র তীর্থস্থান ঘুরে আসার পর মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা সাধারণত সবুজ পাগড়ী পরত মাথায়।

অপেক্ষা করার পর বুঝল সে ঠকেছে। কোনরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সারি-আরকার দিকে তাকিয়ে বলল:

'স্তেপ বিশাল বড়, কিন্তু মানুষও তেমনি তৎপর! খোঁটার মাথায় বরফ জমে থাকে না এ কথা যদি সত্যি হয়, বন্ধু, তবে তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না। একটু অপেক্ষা কর চাঁদ, কড়াইতে যা দিয়েছ তুমি, তোমার হাতাতে তাই উঠবে!'

এই বলে সে কোমর বেঁধে পথে বেরিয়ে পড়ল অন্য ঠগকে খোঁজার জন্য। দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, এগিয়ে চলে অনেক গ্রাম, পথ পেছনে ফেলে। অবশেষে পেল খুঁজে তার ইয়ুরতা, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে।

অজানা লোকটিকে দেখামাত্রই সারি-আরকার ঠগটির স্ত্রী বিলাপ করে কাঁদতে আরম্ভ করল:

'হায় রে, আমার স্বামী বেচারা মারা গেছে, তিনদিন হল তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। পরদেশী, তুমি যেই হও না কেন আমাকে আমার দুঃখের সময়ে একা থাকতে দাও!..'

'শুধু শুধুই ঠাণ্ডা লোহা পেটাচ্ছ,' মনে মনে ভাবল সির-দরিয়ার ঠগ, কিন্তু চোখের জলে ভেসে বলল, 'তুমি আমার বুকটা ভেঙে দিলে এ খবর দিয়ে, আমার বন্ধু আর নেই। হা কপাল! তার জন্য যথাযথ শোকপালন না করে, কেঁদে বুকহালকা না করে চলে যেতে পারি নাকি আমি তার বাড়ী ছেড়ে! খোদার কসম এখানে চল্লিশবছর ধরে বসে বসে কাঁদব যতদিনে না আমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়।' কাঁদতে কাঁদতেই সে বেশ আরাম করে বসল।

দিনের পর দিন যায়, সির-দরিয়ার ঠগ সেই ইয়ুরতাতে থাকে আর বন্ধুর জন্য শোকপালন করে তারই ভেড়ার মাংস আর কুমিস খেয়ে। বন্ধুর স্ত্রী যে রোজ সন্ধ্যাবেলায় একটা পেটমোটা বস্তা নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় তা তার দৃষ্টি এড়াল না। একদিন সে চুপিচুপি তার পেছন পেছন গিয়ে কোথায় ঠগটি লুকিয়ে আছে তা দেখে নিল।

এরপর একদিন ঠগের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করল প্রতিবেশীরা। ভাল পোশাকআশাক পরে সেজেগুজে সে সারাদিনের মত চলে গেল, ফিরল সন্ধ্যাবেলায়। সির-দরিয়ার ঠগটি এ সুযোগ নষ্ট হতে দিল না। সারি-আরকার ঠগের স্ত্রীর পোশাক পরে নিল সে, তারপর একটা থলি ভর্তি করে নিল বিভিন্নরকমের খাবারদাবারে আর যেই সন্ধ্যে নামল এসে হাজির হল সারি-আরকার ঠগের কাছে।

সারি-আরকার ঠগটি কিছুই লক্ষ্য করল না খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর জিজ্ঞাসা করল:

'ঠগটা চলে যাবার উদ্যোগ করছে নাকি?'

গলার স্বর বদলে সির-দরিয়ার ঠগটি উত্তর দিল:

'না নড়ার কোন লক্ষণ দেখছি না, ভাণ করছে যেন দুঃখে ভেঙে পড়েছে। আর সব সময় কি যেন খোঁজে, লক্ষ্য করে। তুমি ওর থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছ নাকি? হয়ত ও তোমার লুকিয়ে রাখা জিনিসটা খুঁজে বার করবে।'

সারি-আরকার ঠগ হেসে বলল:

'ভয় পাস না রে, বোকা মেয়েছেলে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেলেও খুঁজে পাবে না ও। যাই হোক চুলাটা দেখাশোনা করিস একটু, তেমন কোন কিছু দেখলে আমায় জানাবি।'

'আচ্ছা,' বলল সির-দারিয়ার ঠগ আর মনে মনে ভাবল, 'চুলার পেছনে — বটে !'

যখন সারি-আরকার ঠগের স্ত্রী ফিরল দেখে সির-দারিয়ার ঠগ যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বসে বসে চোখের জল ফেলছে আর কুমিস খাচ্ছে একটু একটু করে।

তাড়াতাড়ি করে থলিতে খাবার ভরে স্বামীর কাছে নিয়ে চলল সে, ভয় হল স্বামীর কাছে বকুনি খেতে হবে দেরী করার জন্য।

সারি-আরকার ঠগ স্ত্রীকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলল:

'শীগগির বল্ কি হয়েছে ? আবার এসেছিস কেন ?'

স্ত্রী বলল:

'ষাট, ষাট, তোমার কি হয়েছে বল দেখি ? আমি আজ এই তো প্রথমবার এলাম।'

'ওরে নির্বোধ মেয়েছেলে, তুই আমার মাথা খেলি !' চীৎকার করেই ঠগ প্রাণপণ দৌড় দিল নিজের ইয়ুরতার দিকে।

দেখে যেখানে সে মোহর পুঁতে রেখেছিল সেখানে হাওয়া খেলছে।

কথায় বলে: "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।"

একটুখানি ভেবে সারি-আরকার ঠগ বলল:

'জীবনে সাফল্য ব্যর্থতা দুই-ই আছে। ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পড়লে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। ঘোড়া যদি ছুটতে না চায় তো ধীরগতিতেই যেতে হবে !'

স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে সে শিংভাঙা একটা ষাঁড়ের পিঠে উঠে বসল, লাঠি পিটিয়ে ষাঁড়টাকে চালাতে লাগল সির-দারিয়ার স্তেপের দিকে।

সেই সময় যখন সারি-আরকার ঠগ পথ জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছে স্তেপের মধ্য দিয়ে, সির-দারিয়ার ঠগ ইতিমধ্যে বাড়ী পেঁছে স্ত্রীকে বলল সারা গ্রামে তার হঠাৎ মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে দিতে, আর নিজে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল মরার মত। স্বামীর কথামত সবকিছুই করল তার স্ত্রী। তার কান্নাকাটিতে আশেপাশের ইয়ুরতা থেকে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হল, আহা-উহু করতে লাগল, তারপর মরাদেহটাকে রেখে এল এক পরিত্যক্ত মাজারে আর নিজেরা শোকপালনের আয়োজন করতে লাগল।

ঠিক এমনি সময়েই সারি-আরকার ঠগ তার শিংভাঙা ষাঁড়ে চড়ে এসে পেঁছাল সেই গ্রামে। কিসের ভোজ, কার উদ্দেশ্যে সব জানতে পেরে, সবকিছু বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গেই। "হে-হে, পুরনো সুর ধরেছে," ভাবল সে, তারপরে এ খবরে সে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে জোরে কেঁদে উঠল:

'আমার বন্ধুই যদি নেই তো আমিও আর বাঁচতে চাই না ! বন্ধু ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, কোন সুখ নেই সে জীবনে, আমার একটা কেবল অনুরোধ: আমাকে বন্ধুর পাশেই শুইয়ে দিও, মৃত্যুর পরে অন্তত: যেন বিচ্ছেদ ঘটে না আমাদের।'

এই কথা বলে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে মরে যাওয়ার ভাণ করল।

তাকেও তখন নিয়ে গিয়ে মাজারে তার বন্ধুর পাশে শুইয়ে দেওয়া হল।

লোকজন সবাই চলে গেলে যখন কেবল দুই ঠগ রইল মাজারে, সারি-আরকার ঠগ আস্তে করে বলল: 'সালাম!'

'সালাম,' তেমনি আস্তে করে উত্তর দিল অন্য ঠগটি।

'মোহরগুলো এবার ভাগ করে নিলে হয় না?' বলল সারি-আরকার ঠগ।

'করা যায় বোধ হয়...'

তারা এমনি কথাবার্তা আরম্ভ করামাত্রই হঠাৎ বাইরে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ, হৈ-চৈ, ঠুনঠান শোনা গেল, আর চল্লিশজন ভয়ংকর খুনী ডাকাত এসে ঢুকল মাজারে।

গোল হয়ে বসে ডাকাতরা লুঠের মাল ভাগ করতে লাগল। উনচল্লিশজনের ভাগে পড়ল একগাদা করে মোহর আর বাকী একজনের ভাগে একটা পুরান তরবারি। কিন্তু ডাকাতদের কেউই তরবারি নিতে চাইল না, সবাই মোহর নিতে চায়। তর্ক আরম্ভ হল। ডাকাতসর্দার বলল:

'আরে বোকার দল, ভাল তরবারি একগাদা মোহরের থেকে বেশী দামী। বীরপুরুষ তরবারি দিয়েই নিজের জীবন রক্ষা করে আর ধনসম্পত্তি লাভ করে। আর এই পুরান তরবারিটা প্রকৃত বীরের সেবায় লাগার জন্যেই। দেখ এই দুটো মড়াকে এক কোপে আধখানা করে ফেলব এখনি।' বলে সে তরবারিটা খাপ থেকে খুলে নিল।

আর দেরী না করে দুই ঠগ সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে উঠল আর চীৎকার করে বলল:

'ওরে নীচ, পাপী, রক্তপিপাসুর দল! জীবন্ত মানুষের চোখের জল দেখে আশ মেটে না, এবার মরামানুষের দিকে হাত বাড়াচ্ছ! তৈরী হও তোমাদের মৃত্যুর সময় এসেছে!'

এরপর যা হল তা দেখার মত! "পাগল হয়ে যাওয়া হাঁস লেজ দিয়ে ডুব দেয় জলে..." সোনাদানা সব ফেলে রেখে ডাকাতরা যে যেদিকে পারল লাফ দিল: কেউ দরজা দিয়ে বেরোতে পারল কেউ বা মাথা দিয়ে ঠুকে দেয়াল ভেঙে বেরোবার পথ করে নিল। মুহূর্তমধ্যে তারা মাজার থেকে তিনদিনের পথের দূরত্বে পেঁছে গেল।

তখন দুই ঠগ গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে মোহরগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল আর প্রাণভরে হাসল নিজেদের কীর্তিকলাপ নিয়ে. তারপর যে যার পথে চলে গেল একজন সির-দরিয়ার স্তেপের দিকে অন্যজন সারি-আরকার স্তেপের দিকে।

•

সাহসী গাধা

বোঝা টেনে টেনে বিরক্তি ধরে গেল গাধার। একদিন সে তার বন্ধু উটকে বলল:

'আরে উটভায়া, বোঝা টেনে টেনে আর পারি না যে, গোটা পিঠে তো কড়া পড়ে গেছে। চল মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাই আমরা, দু'জনে মিলে স্বাধীনভাবে থাকব যেমন খুশী।'

উট একটু চুপ করে ভেবে বলল:

'আমাদের মালিক লোক ভাল না, সেকথা ঠিক: খেতে দেয় না ভাল করে, খাটায় প্রচণ্ড। পালাতে পারলে আমিও বাঁচি, কিন্তু পালাব কি করে?'

গাধার উত্তরও তৈরী। বলল:

'আমি সব ভেবে রেখেছি, চিন্তা কোরো না। কাল মালিক আমাদের পিঠে নুন চাপিয়ে শহরে নিয়ে যাবে। প্রথমে আমরা বেশ বাধ্য হয়েই চলতে থাকব, তারপরে যেই পাহাড়ে উঠব অমনি পড়ে যাব, আর ভাণ করব যেন একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছি। মালিক আমাদের গালাগালি করবে, লাঠি দিয়ে খোঁচাবে আমরা কিন্তু নড়ব না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে যখন বাড়ী ফিরে যাবে সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে তখনই আমাদের মুক্তি — যেদিকে চাও দৌড় লাগাও, কেবল হোঁচট খেয়ে না পড়লেই হল।'

খুশীতে নেচে উঠল উট:

'দারুণ ফন্দী করেছ, চমৎকার! তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনই করব আমরা!'

সকাল হল। মালিক তাদের পিঠে নুনেবোঝাই বস্তা চাপিয়ে নিয়ে চলল শহরে।

অর্ধেক পথ তারা পেরিয়ে গেল বরাবরের মত: উট প্রথমে, তারপরে গাধা আর সব শেষে লাঠিহাতে মালিক। কিন্তু যেই পাহাড়ে উঠল তারা, অমনি গাধা আর উট দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেল আর ভাণ করতে লাগল, যেন একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়েছে তারা উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই।

মালিক গালগালাজ করতে লাগল:

'তবেরে কুঁড়ের বাদশারা! এখনি ওঠ বলছি নাহলে লাঠিপেটা খাবি!'

তারা কানেও নিচ্ছে না, শুয়ে আছে যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মালিক তাদের পিঠে মারতে লাগল লাঠির বাড়ি।

উটটাকে মারল উনচল্লিশ বার — নড়ে না, যেই মেরেছে চল্লিশবার অমনি হাউমাউ করতে করতে উঠে দাঁড়াল উট।

'কেমন রে,' বলল মালিক, 'আরো আগেই উঠে দাঁড়ান উচিত ছিল!' বলে এবার গাধাটাকে নিয়ে পড়ল। চল্লিশবার মারল গাধাটাকে — একটু টুঁ আওয়াজও করল না, পঞ্চাশবার মারল — একটু কাঁপলও না, ষাটবার মারল — গাধাটা যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে রইল।

মালিক বুঝল ব্যাপার ভাল না, গাধাটা মরতে বসেছে। এত বড় ক্ষতি, কিন্তু কি আর করা।

গাধার পিঠ থেকে বোঝাটা খুলে নিয়ে উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল।

ঐ বোঝা নিয়ে পা টেনে টেনে কোনরকমে চলেছে উট, আর গাধাকে গাল দিচ্ছে:

'শয়তান গাধা, তোর জন্যই এমন মার খেতে হল, দ্বিগুণ বোঝা বইছি।'

গাধাটা ওদিকে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না মালিক উটকে নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়, তারপর উঠে কোনদিকে না তাকিয়ে দে দৌড়।

তিনদিন ধরে দৌড়াল সে, তিনটি পাহাড়, তিনটি উপত্যকা পেরিয়ে অবশেষে এক স্রোতস্বিনী নদীর তীরবর্তী বিস্তৃত উপত্যকায় এসে পেঁছাল।

উপত্যকাটা পছন্দ হল গাধার, সেখানেই রয়ে গেল সে। সেই উপত্যকাটার অধীশ্বর ছিল শক্তিশালী এক ব্যাঘ।

একদিন বাঘ ভাবল নিজের রাজ্য দেখতে যাবে। সকালবেলায় পথে বেরিয়ে দুপুরবেলায় সে গাধার কাছে পেঁছাল।

গাধাটা ওদিকে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে, লেজ নাড়ছে, ঘাস খাচ্ছে।

বাঘ ভাবল, 'এ আবার কি জন্তু? আগে কখনো দেখি নি তো।'

আর গাধা বাঘকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, ভাবল, 'এবার আমার দফা রফা।' মনে মনে স্থির করল, 'বাঁচার কোন চেষ্টা না করেই শুধু শুধু মরার কোন অর্থ হয় না, এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটাকে আমার বীরত্বই বরং একটু দেখানো যাক।'

লেজ তুলে, কান নাড়িয়ে, মুখ ব্যাদান করে গাধা গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে এমন জোরে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে ডেকে উঠল! বাঘ চোখে অন্ধকার দেখল। পিছনে ফিরেই টানা দৌড়, সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়চ্ছে ভয়ে পিছনদিকে দেখছে না পর্যন্ত।

পথে নেকড়ের সঙ্গে দেখা:

'কি দেখে ভয় পেলে, মহারাজ?'

'ভয় পেলাম একটা জন্তু দেখে, তার থেকে ভয়ংকর জন্তু আর হতে পারে না, কানের বদলে দুটো ডানা, মুখের হাঁ অন্তহীন বিশাল আর এমন ডাকে যে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, আকাশ দপ দপ করে ওঠে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' নেকড়ে বলল, 'গাধাকে দেখ নি তো তুমি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাধাই হবে। ঠিক আছে, কাল তুমি আর আমি ওকে ফাঁসদড়ি লাগিয়ে মেরে ফেলব।'

পরের দিন নেকড়ে একটা ফাঁসদড়ি যোগাড় করল, দড়িটার একপ্রান্ত বাঘের গলায় জড়িয়ে দিল, অপরপ্রান্ত নিজের গলায় জড়াল, এইভাবে তারা উপত্যকার দিকে রওনা দিল।

নেকড়ে চলেছে আগে আগে, বাঘ পিছনে — পিছিয়ে পড়ছে কেবলই।

গাধা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেল আবার আরম্ভ করল: লেজ উঁচিয়ে, মুখ হাঁ করে আগের থেকেও জোরে ডেকে উঠল।

তখন বাঘ নেকড়েকে বলল:

'আরে ভাই, তুমি দেখছি আমাকে নিয়ে চলেছ ঐ দানবটাকে খাওয়াতে!' এমন জোরে বাঘ টান দিল উল্টো দিকে যে নেকড়ের মুণ্ডু ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম!

গুহায় ফিরেও বাঘ অনেকক্ষণ ধরে হাঁফাতে লাগল।

এমন সময় একটা ছাতারেপাখী উড়ে এল তার কাছে, কিচমিচ করল। ফরফর করে ওড়াউড়ি করল, বাঘকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল সবকিছু, তারপর বলল:

'দাঁড়াও আমি উড়ে গিয়ে দেখে আসছি কি জন্তু ওটা, কি করছে। সবকিছু দেখে এসে তোমায় জানাব।'

উড়ে গেল ছাতারেপাখী উপত্যকায়।

গাধাটা দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল পা ছড়িয়ে দিয়ে, যেন মরে গেছে।

ছাতারেপাখী নীচে তাকিয়ে দেখে খুশী হল: ভয়ঙ্কর জন্তুটা মরেছে তাহলে!

গাধার দেহের ওপর নেমে এল সে, চলাফেরা করতে লাগল তার দেহের ওপর দিয়ে এদিক ওদিক চলতে লাগল, আর ভাবতে লাগল বাঘকে কিভাবে নিজের বীরত্ব নিয়ে গল্প বানিয়ে বলা যায় যে সেই জন্তুটাকে মেরেছে। হঠাৎ পোড়া কপাল তার, একটা কামিনীদানা চোখে পড়ল, ঠোঁটে তুলে নিতে যাবে দানাটা এমন সময় পা ফসকে পড়ে মাথাটা তার পড়ল গিয়ে গাধার দুই হাঁটুর মাঝে।

গাধাটাও অমনি বেঁচে উঠল। দুই হাঁটুর মাঝখানে পাখীটাকে শক্ত করে চেপে ধরে খুব করে লেজের ঝাপটা মারতে লাগল। এমন মারতে লাগল যে পাখীটার পালক উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। তারপর খুর দিয়ে এমন এক লাথি মারল যে পাখীটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে উপত্যকার শেষ প্রান্তে। শুয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে কোনরকমে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে উড়ে ফিরে চলল।

দূর থেকেই চেঁচিয়ে বাঘকে বলল:

'এখান থেকে পালাও, যতক্ষণ প্রাণে বেঁচে আছ! জানোয়ারটা আমাকে চিরকালের মত পঙ্গু করে দিয়েছে! দেখো তোমার কপালেও যেন এমনটি না হয়।'

আরো ভয় পেয়ে গেল বাঘ। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে অন্য দেশে চলে গেল।

সাহসী গাধাটা আজও সেই উপত্যকায় বাস করে।

তিন বন্ধু

সত্যি মিথ্যে, জানি না, লোকে বলে এক ছাগলছানা, এক মেষশাবক আর এক গরুর বাছুরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়।

একবার ছাগলছানা দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল:

'তোমাদের মধ্যে কে দেখেছে ভাই, সন্ধ্যেবেলায় সূর্য কেমন করে পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়?'

'আমি দেখেছি,' বলল মেষশাবক।

'আমিও দেখেছি,' বাছুর বলল।

'তাহলে চল আমরা তিনজনে মিলে গিয়ে দেখব রাতের বেলায় সূর্য কোথায় লুকায়?' বলল ছাগলছানা।

সেইদিনই তারা তিনজন চুপিচুপি পাল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

স্তেপের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে। পাহাড়টা ক্রমশঃই কাছে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ তাদের সামনে পড়ল একটা নালা। কেমন করে পার হওয়া যায়? ছাগলছানা বলল:

'ঠিক পেরিয়ে যাব।'

'আমার ভয় করছে,' বলল মেষশাবক।

'আমারও ভয় করছে,' বলল বাছুর।

'ধ্যাৎ, ভীরু কোথাকার,' হাসতে লাগল ছাগলছানা। 'আমি কেমন একটুও ভয় পাই নি।'

ছুটে গিয়ে সে এক লাফে নালার অন্য পাড়ে পড়ল।

তারপরে মেষশাবকও লাফ দিল, বেশ চমৎকারই লাফাল, পেছনের পাগুলো কেবল একটু ভিজে গেল।

আর বাছুর সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে লাগল, করার কিছু নেই, লাফ দিল সেও, আর জলে পড়ল ঝুপ করে, ডুবে যাচ্ছিল প্রায় কিন্তু বন্ধুরা টেনে তুলল তাকে।

ছাগলছানা বলল, 'বাছুর, তোর জীবন বাঁচিয়েছি আমরা। তোকে এর প্রতিদান দিতে হবে। আমাদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবি তুই পাহাড় পর্যন্ত।'

বসল তারা বাছুরের পিঠে, যাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে।

খানিকক্ষণ বাদে বাছুর নালিশ জানাল:

'কষ্ট হচ্ছে আমার, আমি তো আর উট নই। ঐ যে সাদা পাথরটা দেখা যাচ্ছে ঐ পর্যন্ত নিয়ে যাব, তারপরে নেমে পড়বে তোমরা।'

পাথরটা পর্যন্ত গিয়ে দেখা গেল, সেটা মোটেই পাথর নয় — একটা ঠাসবোঝাই করা বস্তা মাটিতে পড়ে আছে। বোধহয় কোন ভোলা লোক ফেলে গেছে। বস্তার মুখটা খুলে তারা দেখল তাতে আছে চারটে পশুর চামড়া: চিতাবাঘের, ভালুকের, নেকড়ে আর শিয়ালের।

'কাজে লাগবে, বেশ হল,' বলল ছাগলছানা।

বস্তাটা নিয়ে তারা এগিয়ে চলল। পাহাড়টার কাছে প্রায় পেঁছে গেছে। দেখে পাহাড়ের নীচে একটা সাদা রংয়ের ইয়ুরতা, ইয়ুরতার মধ্যে থেকে হৈ-চৈ, গান, দোম্বরা বাজানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারা তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ চাওয়াচায়ি করল — যা হয় হবে, দরজা খুলল তারা ইয়ুরতার।

দেখে: সেখানে ভোজউৎসব চলছে। চিতাবাঘ কুমিস খাচ্ছে, মোটা ভালুকটা মিষ্টি চুষছে, ধূসর রংয়ের নেকড়ে বাউরসাক* গিলছে, আর লালচে রংয়ের শিয়ালটা দোম্বরা বাজিয়ে গাইছে:

ত্রিং ড্রিং ত্রিং ড্রিং দোম্বরা আমার
এখন সবাই মোরা সখা,
কাল মোরা শত্রু আবার
যে যার পিঠ বাঁচা!

তিন বন্ধু ঢুকে পড়ল ইয়ুরতাতে হুড়মুড় করে আর দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ হয়ে, বুঝল যেচে বিপদে এসে পড়েছে তারা। আর জন্তুগুলো ওদিকে অপ্রত্যাশিত এই অতিথিদের যেই দেখল, চোখ চকচক করে উঠল: এমন চমৎকার খাবার আপনা থেকে তাদের মুখে এসে পড়ল! ধূর্ত শিয়াল অন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে জিভ চাটল তারপর মিষ্টিসুরে বলল:

'এস, এস, ভেতরে এস অতিথিরা। আল্লাহ্ নিজে তোমাদের পাঠিয়েছেন এই ভোজে অংশগ্রহণ করতে। আগুনের কাছে বোস, বাছারা। এখনই তোমাদের খাবার সাজিয়ে দেব... ততক্ষণ তোমরা দোম্বরা বাজিয়ে একটু গান শোনাও না আমাদের।'

মেষশাবক চুপ করে রইল। বাছুরও পিছিয়ে গেল কোন কথা না বলে। ছাগলছানা তার কোঁকড়ান লোমগুলোকে একটু ঝেড়ে নিয়ে বলল:

'দাও, শিয়ালভায়া দোম্বরাটা! গান গেয়ে শোনাই তোমাদের।'

দোম্বরাটার তার টেনে গান ধরল:

---

* বাউরসাক — ময়দা দিয়ে তৈরী খাবার।

ট্রিং ট্রিং ট্রিং ট্রিং দোম্বরা বাজাই
কোন শত্রুর নেই রেহাই
ডোরাকাটা চিতাবাঘকে নেইকো মোদের ভয়
হোঁৎকা ভালুককে নেইকো মোদের ভয়
আর নেকড়েকেও নেইকো মোটেই ভয়
আর শিয়ালকেও নেইকো মোটেই ভয়
মোরা তিনজন ঝাঁপিয়ে
বদমাশদের ছাল নেব ছাড়িয়ে।

শুনছে জন্তুরা গান: কি আশ্চর্য সাহস!

'কে তোমরা?' গরগর করে বলল চিতাবাঘ।

'আমরা স্তেপে শিকার করে বেড়াই,' বলল ছাগলছানা।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' হুমহুম করে জিজ্ঞাসা করল ভালুক।

'বাজারে মাল বেচতে যাচ্ছি।'

'কি মাল?' বিড়বিড় করে বলল নেকড়ে।

'জন্তুর চামড়া।'

'কোথায় ওগুলো পেলে তোমরা?' খেঁউ খেঁউ করে বলল শিয়াল।

'তোমাদের আত্মীয়স্বজনের গায়ের থেকেই ছাড়িয়ে নিয়েছি,' বলে ছাগল বস্তা থেকে ঝেড়ে বার করে দিল চারটে চামড়াই।

দাঁতাল শয়তানগুলো ভয়ে পাথর হয়ে গেল প্রথমটায়, তারপর হাঁক ছেড়ে যে যার পথে দৌড় লাগাল, পিছন ফিরে আর তাকাল না। তিন বন্ধু রয়ে গেল সেই ইয়ুরতায়, পেটভরে খেয়ে নিল তারা, বিশ্রাম করল খানিক, তারপর ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়।

ছাগলছানা বলল:

'ওদের আমরা ভয় পাইয়ে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ওরা যখন বুঝতে পেরে ফিরে আসবে তখন আর রক্ষা থাকবে না, আমাদের হাড় চিবিয়ে খাবে। বিপদের অপেক্ষায় বসে না থেকে ভালয় ভালয় এখনি পালাই, চল নিজেদের পালে। পালে আমাদের কোন জন্তুর ভয় নেই।'

বন্ধুদের আর বেশী বুঝিয়ে বলতে হল না ছাগলছানাকে।

'ঠিক কথা ভাই,' বলল মেষশাবক।

'ঠিকই বলেছ,' বলল বাছুরও।

এক মুহূর্তেই তারা সাদা ইয়ুরতা থেকে অনেক দূরে পেঁাছে গেল আর পাহাড় থেকেও অনেক অনেক দূরে। প্রথমে দৌড়চ্ছে ছাগলছানা, তার পেছনে মেষশাবক আর সবশেষে বাছুর।

সন্ধ্যার মুখে তারা পালে পেঁাছাল। রাখালরা তাদের দেখে এত খুশী হল যে একটুও বকাবকি করল না। সবকিছু ভালয় ভালয় মিটে গেল।

কিন্তু তিন বন্ধুর আর জানা হল না সূর্য কোথায় ঘুমোতে যায়।

গাধার গান

বড় অদ্ভুত এই দুনিয়া কত বিভিন্ন রকমের লোকই যে আছে এই দুনিয়ায়, আর তাই আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, কোন এক সময়ে কোন এক গ্রামে ছিল এক গল্পেবুড়ো জাক সিবাই। একটা গাধা ছিল তার। চেহারাটা তার অন্যান্য গাধার মতই কিন্তু গলাটা তার এমনি ছিল যে যখন সে আস্তাবলে দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ত, এমনকি পাশের গ্রামের লোকেরাও কানে হাত চাপা দিত।

একবার জার্কাসিবাই প্রাচীন শহর তুর্কেস্তানে এল, প্রথমেই সে গেল সেখানকার বাজারে। গাধাটাকে বাজারে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আলখাল্লার প্রান্তটা তুলে ধরে গিয়ে ঢুকল এক চাখানায়। চাখানা ভাল হলে সেখানে সব সময় লোক গিজগিজ করে, যেখানেই অনেক লোক সেখানে অনেক গল্প, কথা, অনেক কথা বলতে বলতেই তর্ক বেধে যায় আর তর্ক বা কথায় জার্কাসিবাইয়ের সঙ্গে কেউ কখনই পেরে উঠবে না। কথায় বলে 'বাচালের মুখে আগল নেই...'

গাধাটা ওদিকে মালিকের জন্য অপেক্ষা করে আছে। রোদের তাপ, মশা ভোঁভোঁ করছে, ডাঁশের কামড় খেতে হচ্ছে। খিদেতেষ্টা পেয়ে গেছে গাধাটার। কি করবে সে ? তার জাতের অন্য সবাই এই পরিস্থিতিতে যা করত সেও তাই করল: লেজ উঁচিয়ে, কান সামনে বাড়িয়ে, নাক ফুলিয়ে, মুখ হাঁ করল আর... সমস্ত শক্তি দিয়ে গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল।

যে সব লোকেরা কাজে অকাজে ভীড় করেছিল বাজারে, তারা কেঁপে উঠে ফিরে তাকাল সেদিকে।

'গলা বটে ! এমন গলা তুর্কেস্তানে কখনও শোনা যায় নি !' বলল গোটা বাজারটা।

'ভাল কথা দেখি,' খুশী হয়ে বলল গাধা। 'এতদিনে বুঝলাম নিজের গুণ। গোটা তুর্কেস্তান আমার কদর বুঝেছে।'

সেই মুহূর্ত থেকেই গাধার বিশ্বাস হল যে সত্যিই সে জন্মেছে এক বিরাট গায়ক হয়ে।

গাধাটা ভাবল: 'জার্কাসিবাইয়ের কাছে আর কাজ করব না। যশখ্যাতি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। পিঠে বোঝা বয়ে বেড়ালে যশখ্যাতি আসবে কি করে ?'

এইসব ভেবে সে প্রচণ্ড টানাটানি করে দাঁড়লাগাম ছিঁড়ে ফেলে দৌড় লাগাল শহরের বাইরে। গল্পেবুড়ো জার্কাসবাই, বিদায়! প্রাচীন শহর তুর্কেস্তান, বিদায়!

খাঁ-খাঁ জনহীন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে গাধা, রোদের তাপ আরো বেড়েছে, মশাগুলো আরো বেশী জ্বালাচ্ছে, ডাঁশগুলো ভীষণ হুল ফোটাচ্ছে। খিদেতেষ্টা আর ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়ল সে। ধারেকাছে একটুও ছায়া নেই, নেই এককণা সবুজের চিহ্ন বা একফোঁটা জল।

'যশ পেতে গেলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়,' ভাবল গাধা। 'কিন্তু আল্লাহ্ যাকে বেছে নিয়েছেন তাকে এভাবে মরতে তিনি দেবেন না,' ভেবে সে এগিয়ে চলল আবার।

হঠাৎ সামনে দেখে এক বিরাট বাগান, মাটির পাঁচিল ঘেরা। একজায়গায় পাঁচিলটা একটুখানি ভেঙে পড়েছে, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছায়াবহুল গাছ, চমৎকার সবুজ ঘাসঢাকা জমি, স্বচ্ছজলের নালা। এ প্রলোভন সামলাতে পারল না গাধা, শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে সেই গর্ত দিয়ে অজানা বাগানে ঢুকে পড়ল সে। দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়ে ঘাসপাতা জল খেতে আরম্ভ করে দিল লোভীর মত। ফুলগাছ, ঘাসপাতা মাড়িয়ে দলে অনেকক্ষণ ধরে সে ঘুরল বাগানে যতক্ষণে না বুঝল যে পেট ভর্তি হয়ে গেছে গলা পর্যন্ত। একটু থামল সে বিশ্রাম নেবার জন্য, মুখ তুলতেই... চমকে টলে উঠল।

ঝোপের থেকে বেরিয়ে তার দিকেই আসছে এক হরিণী, বেহেশতের হুরীর মতই অপরূপ। হরিণীটিও চুপিসারে ঢুকেছে বাগানে। সকাল থেকে স্তেপে ছুটোছুটি করে তারপর বাগানের কাছে এসে লাফিয়ে পাঁচিল পেরিয়ে বাগানে ঢুকে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। গাধাটার ঘাড়ের ওপর পড়ে ভয়ে হিম হয়ে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

গাধাটা ওদিকে হরিণীকে দেখামাত্রই গভীরভাবে তার প্রেমে পড়েছে। ভয় পাওয়া ইঁদুরের মত ছটফট করতে লাগল তার হৃদয়, চোখ বড় বড় করে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল, 'অহো! ভাগ্য সত্যিই আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে: এমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর দিয়েছে আমায়, এমন চমৎকার বাগানে পেঁছে দিয়েছে, এবার এই অপরূপ সুন্দরী এনে দিয়েছে আমার সঙ্গিনী হিসাবে।'

লম্বা কানগুলোকে দুলিয়ে মিষ্টিসুরে সে বলল, 'সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তুমি তোমার অপরূপ সৌন্দর্যে বশ করে ফেলেছ আমায়। তোমায় একটা গান শোনাতে চাই আমি। আমার মিষ্টি গলায় গান শুনে তুমি এই মহান গায়কের ভালবাসাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

হরিণী চারপাশ দেখে নিয়ে নীচুস্বরে বলল:

'আরে গাধা, কথা না বলে চুপ করে থাকলেই কি ভাল হয় না? তোর চেঁচামেচিতে আবার কিছু হয় না যেন আমাদের দেখিস, যেমন হয়েছিল সেই সাতটা চোরের।'

এই বলে সে একটা গল্প আরম্ভ করল:

'একরাতে এক ধনীর বাড়ীতে হানা দিল সাতজন চোর। তারা মাটির নীচে কুঠুরীতে মদের বড় বড় পিপের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে সে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়বে যাতে তারা চুরি করতে পারে। কিন্তু মদের গন্ধে তাদের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল,

তারা আঁজলা করে নিয়ে খেতে লাগল সেই দামী মদ। শেষে এমন হল যে মাতাল হয়ে গিয়ে ভুলে গেল যে কোথায় আছে, চীৎকার করে গান গাইতে আরম্ভ করে দিল তারা মনের খুশীতে। চীৎকার শুনে ধনীর প্রহরীরা এসে তাদের ধরে বেদম মার দিল। তুমি আর আমি এই বাগানের মালিকের নিমন্ত্রণ পেয়ে এখানে আসি নি, তার উদারতায় আমরা এমন সুস্বাদু ঘাস পেটভরে খাই নি।'

তার উত্তরে গাধা বলল:

'তুমি অপূর্ব সুন্দরী হরিণী, কিন্তু তুমি স্তেপের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, সভ্যতা দেখ নি, ভাল গান গাওয়ার ক্ষমতা থাকার মূল্য বোঝ না। আমি সারাজীবন মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছি, তুর্কেস্তানে গিয়েছি কতবার আর বলতে পারি যে সঙ্গীতকলা আমি পুরোপুরি রপ্ত করেছি। আমি যদি গাইতে একবার আরম্ভ করি তুমি নিজেই বলতে থাকবে যেন আমি গান না থামাই।'

কিন্তু হরিণী বলল, 'তবুও সাবধান হওয়াই উচিত না কি? যে সাবধান না হয় তার বিপদ হবেই হবে যেমন হয়েছিল সেই বোকা কাঠুরেটার।' হরিণী একটা গল্প বলতে আরম্ভ করল:

'এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে বাড়ী ফেরার কথা যখন ভাবছে এমন সময়ই সন্ধ্যা নামল। গভীর বন। হঠাৎ শুনতে পেল কাছেই কারা যেন জোরে জোরে কথা বলছে। কাঠুরে তাড়াতাড়ি একটা গাছের ওপর উঠে ঘন ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তিনটে জিন এসে হাজির। গাছের তলায় বসে একটা দামী পাত্র সামনে রেখে তারা খাওয়াদাওয়া আরম্ভ করল। যেই জিনদের কেউ পাত্রটাকে ছুঁচ্ছে হাত দিয়ে অমনি পাত্রটা সুগন্ধী কুমিসে কানায় কানায় ভরে উঠছে। এমন চমৎকার কুমিস জিনরা ছাড়া আর কেউ কখনও খায় নি।

'ভোরবেলায় জিনরা পাত্রটা গাছের তলায় লুকিয়ে রেখে যে যার পথে চলে গেল। কাঠুরে অমনি নেমে এসে পাত্রটা নিয়েই বনের বাইরে যাবার জন্য দৌড় দিল। ঘরে ফিরে আত্মীয় প্রতিবেশীদের ডেকে তাদের সামনে খুব বড়াই করতে লাগল পাত্রটা নিয়ে। যেই সে পাত্রটা ছোঁয় অমনি সুগন্ধী কুমিসে ভরে যেতে থাকে পেয়ালার পর পেয়ালা। কাঠুরে আনন্দে এমন মত্ত হয়ে উঠল যে পাত্রটা মাথার ওপর বসিয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল। হঠাৎ সে হোঁচট খেল, পাত্রটা মাথা থেকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তেমনি, গাধা, তোর বোকামির জন্য এমন মিষ্টি ঘাস খেতে পাওয়ার সুযোগ যেন হারাতে না হয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাধা হতাশসুরে বলল:

'হরিণী, প্রকৃতি তোমায় অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু হৃদয় তোমার ভরিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুরতায়। যাই হোক, আমার গানের মধুর সুর হয়ত তোমার রুক্ষ মনকে নরম করবে, উদাত্ত করবে।'

হরিণী গাধাকে বোঝাবার চেষ্টা করেই চলল:

'এখনও বলি ভেবে দেখ গাধা, তুর্কেস্তানের বাজারেই গাইবি। অনেক সময়েই একটা ছোট্ট শব্দও অসময়ে করা হলে তা আমাদের বিপদের কারণ হয়। অল্পবয়সী সওদাগরটি সেকথা ভাবে নি বলে পরে তাকে অনুতাপ করতে হয়।'

বলে হরিণী আরো একটি গল্প আরম্ভ করল:

'এক তরুণ সওদাগর ভোজসভায় আনন্দউল্লাস করার পর মাঝরাতে শহরের অন্ধকার রাস্তা ধরে ঘরে ফিরছিল। দু'পকেট তার ভর্তি মোহরে। 'লুঠেরারা যদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু লুঠে নেয়?' ভয় হতে লাগল তার। মনে জোর আনবার জন্য নিজেকেই নিজে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'ব্যাটা ডাকাতগুলো কাছে আসুক দেখি একবার!.. ভাল করে মজা টের পাইয়ে দেব!.. স্বয়ং শয়তানকেও ডরাই না আমি!' একটা ভবঘুরের দল সামনের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পথিকদের উপর লক্ষ্য রাখছিল। সওদাগরের কথা শুনতে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা তার টাকাপয়সা জামাকাপড় সব নিয়ে তাকে নগ্ন করে রাস্তায় ছেড়ে দিল। আমাদেরও এখন নিজেদের বিপদ ডেকে আনা উচিত নয়, আজেবাজে কথা বন্ধ করে চুপিচুপি এবার এই বাগান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের।'

গাধা বলে উঠল, 'অয়ি হৃদয়হীনা হরিণী! কেমন করে তুমি আমায় বল গান না গাইতে যখন প্রেমিকার উদ্দেশ্যে গান স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে আমার হৃদয় থেকে?।'

এই বলে সে চোখ বুজল, যেমন সব প্রখ্যাত গায়করাই করে থাকে, মুখ ব্যাদান করল, সব গাধারাই যেমন করে থাকে, আর প্রচণ্ড চীৎকারে ফেটে পড়ল। হরিণী চমকে সরে গেল তারপর একলাফে পাঁচিল পেরিয়ে হাওয়ার গতিতে ছুট লাগাল স্তেপের দিকে। গাধা কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করল না, চীৎকার করেই যেতে লাগল।

বাগানের মালিক এদিকে একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে গাধাটার পিঠে এমন জোরে মারল যে আরো জোরে চীৎকার করে উঠল সে আর আধমরা অবস্থায় কোনো রকমে বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল। মাথা নীচু করে পাগুলোকে টানতে টানতে এগিয়ে চলল গাধা।

রাত নামল। পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল আকাশে। তখন স্তেপের সমস্ত নেকড়েরা ঘাড় উঁচু করে, তাদের বাপ-পিতামহদের রীতি অনুযায়ী, বিভিন্ন সুরে ডেকে উঠল।

গাধা কখনও নেকড়ের ডাক শোনে নি। দাঁড়িয়ে পড়ে ভাল করে শুনল সে তারপর বলল:

'একে গান গাওয়া বলে নাকি! আমি গান ধরলে ওদের সবার গলা চাপা পড়ে যাবে।'

খুব ভাল করে দম নিয়ে সে এমন জোরে চীৎকার করে উঠল যে তার নিজেরই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। নেকড়েগুলো তখুনি চুপ করে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল স্তেপের মধ্যে মাঝরাতে গাধা এল কোথা থেকে? তারা রাস্তায় বেরিয়ে এল দলবেঁধে, শিকার চোখে পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই... এখানেই গাধার গল্প শেষ হল। যদি আপনাদের জানতে ইচ্ছে হয় জার্কিসবাইয়ের কি হল তবে এখুনি ছুটে যান প্রাচীন শহর তুর্কেস্তানে, সেখানকার বড় বাজারটা খুঁজে বার করুন, সবচেয়ে বেশী ভীড় বাজারের যে চাখানাটায়, নির্ভয়ে সেটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। হয়ত জার্কিসবাই নিজের গাধার কথা ভুলে গিয়ে এখনও সেখানে নরম গদীর ওপর বসে আছে, পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাচ্ছে, বিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য নানারকমের গল্প বলে চলেছে। নিজের কথা সে আপনাকে ভাল করেই বলবে — শুনুন এবার।
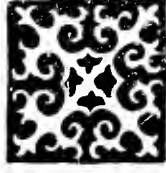
দোয়েলপাখীর লেজ চেরা কেন

বহুদিন আগে পৃথিবীর অধিপতি ছিল এক ভয়ংকর সাপ আইদাহার। সে জীবনধারণ করত কেবল রক্ত পান করে। কারুর প্রতি তার দয়ামায়া ছিল না। পাজী মশা তার হুকুম খাটত।

একদিন সাপটা মশাকে ডেকে বলল:

'সারা পৃথিবী ঘুরে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর রক্ত চেখে আয় গোপনে। ফিরে এসে বলবি কার রক্ত সব থেকে মিষ্টি। যার কথা বলবি তাকেই খাব।'

উড়ে চলল মশা। সাপের হুকুম পালন করে ফিরে আসছে, এমন সময়ে পথে এক দোয়েল-পাখীর সঙ্গে মশার দেখা।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'আমার মনিব আইদাহারের হুকুমে সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম, কার রক্ত সবচেয়ে মিষ্টি জানার জন্য।'

'কি জানলে?'

'মানুষের রক্ত সবচেয়ে মিষ্টি,' পিনপিন করে বলল মশা।

দোয়েলপাখীটা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল:

'সাপকে সত্যি কথা বোলো না, মশা। মানুষ দয়াশীল, তাকে হত্যা কোরো না।'

'বলব!'

দোয়েলপাখীটা আবার বলে:

'আমার অনুরোধ, মানুষের ক্ষতি কোরো না — মানুষ আমার বন্ধু।'

মশা বলল, 'বলব।'

উড়ে এল মশা আইদাহারের কাছে, দোয়েলপাখীও সেখানে এসে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল।

সাপ হিস-হিস করে বলল, 'বল, কি দেখলি। একটা কথাও যেন মিথ্যা বলিস না, দেখিস!'

'মালিক, হুজুর,' আরম্ভ করল মশা, 'সত্যকথাই বলব আপনাকে, কিছুই গোপন করব না, সবচেয়ে সুস্বাদু, মিষ্টি রক্ত হল...'

বলতে চেয়েছিল, 'মানুষের,' কিন্তু পারল না। দোয়েলপাখীটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারাল ঠোঁট দিয়ে মশার জিভের ডগাটা কেটে দিল।

মশাটা ছটফট করে উড়তে লাগল সাপটার উপর দিয়ে ভুঁ ভুঁ করে, কিন্তু বলতে কিছুই পারছে না।

দোয়েল তখন মজা করে বলল:

'আমি জানি আইদাহার তোমার অনুচর কি বলতে চাইছিল, ও বলতে চাইছিল: পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্টি ভুজঙ্গের রক্ত!' .

সাপটা দোয়েলের ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিয়ে মুখ হাঁ করে এক লাফ দিল আকাশে। কিন্তু দোয়েল তো খুব চালাক, চটপটে পাখী, তাই সে একপাশে সরে গেল, আইদাহার কেবল তার লেজটা ধরতে পারল। উড়ে পালিয়ে গিয়ে দোয়েল ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

আর ভয়ঙ্কর সাপটা তিনটে পালক মুখে নিয়ে সেই উঁচু থেকে মাটিতে পড়ল। মাটিতে পড়ে পাথরে ঠুকে গিয়ে তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

সেই থেকেই দোয়েলের লেজ চেরা আর সেই থেকেই তাকে এত ভালবাসে লোকে।

দিব্যদর্শী

বহুদিন আগে বহু দূরের এক গ্রামে এক গরীব লোক বাস করত। থাকার মধ্যে তার ছিল কেবল দুটি জিনিস: কানঢাকা শিয়ালের চামড়ার একটা টুপি আর দ্রুতগামী একটা ঘোড়া। টুপিটা একেবারেই পুরনো হয়ে গেছে — হাজারটা ফুটো তাতে, কিন্তু তার ঘোড়াটার মত ঘোড়া আর একটিও ছিল না পৃথিবীতে, তার সৌন্দর্যে সূর্যেরও আর দ্রুতবেগে হাওয়ার হিংসা হয়।

অন্য এক গ্রামে থাকত গরীব লোকটির বড় দুই ভাই — তারা দু'জনেই ধনী। তাদের ছিল ত্রিশটা ঘোড়ার পাল, ত্রিশটা ভেড়ার পাল, বাস করার জন্য গালিচা, বাসনপত্র আর অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি তিরিশটা তাঁবু।

কিন্তু তবুও তাদের মনে একটুও আনন্দ নেই। এক মুহূর্তের জন্যও তারা ভুলতে পারছে না যে তাদের ছোট ভাইয়ের এমন একটি ঘোড়া আছে যা সারা পৃথিবীতে দুটি নেই, তারা সবসময় ভাবত কি করে ঐ ঘোড়াটাকে শেষ করা যায়।

একদিন ছোট ভাই তার শতছিদ্র টুপিটা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বড় দুই ভাইয়ের কাছে এসে হাজির।

তারা ছোট ভাইকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল, রাগে তাদের মুখ কালো হয়ে উঠল। ছোট ভাই নীচু হয়ে সালাম জানিয়ে বলল:

'ভাইরা! অভাব একেবারে শেষ করে ফেলল আমায়, খেতমজুরের কাজ নিতে চাই কারো কাছে, তা ঘোড়াটা পায়ের বেড়ি। শরৎকাল পর্যন্ত তোমরা যদি ওকে নিজেদের পালে রাখ তো উপকার হয়। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না আর আমারও দুশ্চিন্তা থাকবে না। শরৎকালে যে ভাবে তোমরা বলবে সেভাবেই এর প্রতিদান দেব তোমাদের।'

ধনী দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, তারপর মিষ্টি সুরে ভাইকে বলল:

'তোকে সাহায্য করতে সবসময়ই রাজী আমরা, ভাই। ঘোড়াটা আমাদের পালে রেখে যা। শরৎকাল পর্যন্ত ঘুরে ফিরে বেড়াক। এর জন্য কোনকিছুই দিতে হবে না তোকে।'

বড় ভাইদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঘোড়াটাকে তাদের পালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে হাল্কা, খুশীমনে ফিরে গেল ছোট ভাই।

বসন্তকাল গিয়ে গ্রীষ্মকাল এল। ছোট ভাই খেতমজুরের কাজ করছে, নিজেরও পেটভরে খাওয়া জুটছে আর ঘোড়াটার জন্যও ভাবনা নেই, তাই নিশ্চিন্ত সে।

একদিন এক অপরিচিত লোক তার কাছে এসে বলল যে সে গোপনে ছুটে এসেছে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে।

যখন তারা দু'জন একটা নির্জন জায়গায় গেল, লোকটি জানাল যে সে তার ভাইদের আস্তাবলের সহিস। সে বলল:

'শোন বন্ধু, তোমার ঘোড়াটা তো মরতে বসেছে। ওকে ছুটিয়ে ছুটিয়েই মেরে ফেলল তোমার ভাইরা, মনে হচ্ছে আর তিনটে দিনও বাঁচবে না। তোমার জন্য কষ্ট হল আমার, তাই তোমাকে এ খবর জানাতে এলাম। তুমি কিন্তু ভাইদের কাছে বলে দিও না আমার কথা। যদি ওরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে কে তোমাকে সব কথা বলেছে তো তুমি বলবে:

'আমার দিব্যদৃষ্টি আছে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে আমি সব দেখতে পাই।'

এই বলে লোকটি চলে গেল। মনের দুঃখে কেঁদে ফেলল গরীব ছেলেটি, তারপর রওনা দিল বড় ভাইদের কাছে।

রাস্তাতেই তার দেখা হল ভাইদের সঙ্গে, সে কাঁদতে কাঁদতে তাদের লজ্জা দিতে তিরস্কার করতে লাগল:

'গরীব বেচারীকে মনে কষ্ট দিতে বিবেকে বাধে না তোমাদের? আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি, কি জন্যে তোমরা আমার ঘোড়াটাকে মেরে ফেললে?'

ধনী দুই ভাই বুঝল যে ছোট ভাই সব জেনে ফেলেছে, তারা তখন অস্বীকার করতে লাগল:

'তোর দেখছি মাথাটার গণ্ডগোল হয়েছে, নয়ত মাতাল তুই। আজেবাজে বকছিস? তোর ঘোড়া বেঁচে আছে, ভাল আছে, নিশ্চিন্তে আছে আমাদের পালে।'

গরীব ভাই বলল, 'ঠকিও না আমাকে, ছুটিয়ে ছুটিয়ে মেরে ফেলেছ ঘোড়াটাকে, তিন দিনও বাঁচবে না আর।'

'কে তোকে বলল?' জিজ্ঞাসা করল ভাইয়েরা।

'কেউ আমায় কিছু বলে নি। আমি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি। পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে সব দেখতে পাই আমি এখন,' বলল গরীব ভাই।

ক্রমশ তাদের চারপাশে লোক জড় হল, তারা জানতে চাইল কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে।

গরীব ভাই তাদের সেসব কথা বলল যা তাকে ভাইদের আস্তাবলের সহিস বলেছিল। তখন লোকেরা তাদের ঘোড়ার পাল দেখতে চলল ছোট ভাই বড় ভাইদের নামে বাজে কথা রটাচ্ছে কিনা পরখ করতে। আস্তাবলে এসে তারা দেখল যে গরীব ভাই সত্যকথাই বলেছে, তার ঘোড়াটা মৃতপ্রায়, মাটিতে পড়ে ধুঁকছে, তার পাঁজরার কাছে ঘায়ে ভরে গেছে।

তখন লোকেরা হুমকি দিয়ে বড় দুই ভাইকে বলল গরীব ভাইকে তার ঘোড়ার বদলে তাদের দশটি শ্রেষ্ঠ ঘোড়া দিয়ে দিতে।

ধনী ভাইদের দশটি শ্রেষ্ঠ ঘোড়া দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন গতি রইল না। কিন্তু সেই

থেকে তার প্রতি ঘৃণা বেড়ে গেল তাদের, তাকে মেরে ফেলার সুযোগ খুঁজতে লাগল কেবল।

একদিন সেই দেশের খানের এক মস্ত বড় অমূল্য সোনার বাট চুরি গেল।

খান সারারাজ্যময় ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন, যে বলে দিতে পারবে সোনা কোথায় লুকান আছে তাকে হাজারটা বাছাইকরা ভেড়া আর তিনশো দুগ্ধবতী ঘুড়ী দেওয়া হবে।

যখন ধনী ভাইয়েরা একথা শুনল খানের কাছে গিয়ে তারা বলল:

'হুজুর, আমাদের ছোট ভাই বলে যে সে দিব্যদর্শী। আমরা শুনেছি ও নিজের বন্ধুদের কাছে অহংকার করে বলছে যে ও একরাতের মধ্যেই চোর ধরে দিতে পারে কিন্তু তা সে করবে না। ওকে যদি আপনি মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখান তো সকালবেলায়ই সোনা আপনার হাতে পৌঁছে যাবে।'

তাদের কথায় বিশ্বাস করে খান তখুনি গরীব ছেলেটিকে ধরে আনতে আদেশ দিলেন।

সে এসে পৌঁছলে খান বললেন:

'শুনলাম তুই নাকি নিজেকে দিব্যদর্শী বলিস। জানতে চাই একথা সত্যি কিনা। কাল ভোরবেলার মধ্যে যদি সোনার বাট খুঁজে দিতে পারিস তো আমি ঘোষিত পুরস্কার ছাড়াও একপাল উটও দেব তোকে। আর যদি তুই আমার আদেশ পালন না করিস তো পাগলা ঘোড়ার লেজে বেঁধে তোকে স্তেপের মধ্যে ছেড়ে দেব।'

গরীব ছেলেটি তখনই বুঝল ভাইদের শয়তানীর কথা, বলল:

'হুজুর, আপনার লোকদের আদেশ করুন যেন স্তেপের মধ্যে একটা তাঁবু খাটায় আমার জন্য। সেখানে আমি রাতের বেলায় একা বসে ঝাড়ফুঁক করব, হয়ত ভোরবেলায় সোনাটা খুঁজে পাব।'

আর মনে মনে ভাবল, 'স্তেপের মধ্যে তাঁবু হলে মাঝরাতে পালাতে পারব।'

স্তেপের মাঝে তার জন্য চমৎকার এক তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হল, গরীব ছেলেটি একা রইল সেখানে। ঠিক মাঝরাতে তার শতছিদ্র টুপিটা কপালের ওপর টেনে নামিয়ে দিয়ে সাবধানে দরজার দিকে এগোতে লাগল।

ঐ সময়ই তাঁবুর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল সেই চোরটা, যে খানের সোনা চুরি করেছে। এমন চমৎকার একটা তাঁবু দেখে সে ভাবল এখানেও আবার কিছু চুরি করা যায় নাকি। চোরটা যেই দরজা খুলতে যাবে অমনি দরজাটা আপনা থেকেই খুলে গেল আর চোরটা টাল সামলাতে না পেরে গরীব ছেলেটির পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে গেল।

গরীব ছেলেটি একটুও চিন্তা না করেই চোরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা চেপে ধরল।

চোরটা তখন কেঁদে বলল:

'ছেড়ে দাও আমাকে, মেরে ফেলো না, আমি তোমাকে খানের কাছ থেকে চুরি করা সোনার বাটটা দিয়ে দেব।'

গরীব ছেলেটি বলল, 'ঠিক আছে, তোকে ছেড়ে দেব, আগে বল সোনার বাটটা কোথায় লুকান আছে?'

‘এখান থেকে যদি পূর্বদিকে যাও, সেখানে উঁচু ঢিবি একটা দেখতে পাবে, সেই ঢিবিটার ওপর একটা বড় কালো পাথর আছে। ঐ পাথরটার নীচেই সোনা পোঁতা আছে।’

চোরটাকে ছেড়ে দিয়ে সে এবার খানের কাছে চলল কারণ ইতিমধ্যে ভোর হতে আরম্ভ করেছে।

তারপর খানকে নিয়ে সে চলল পূর্বদিকে আর তাদের পিছন পিছন চলল খানের অনুচর ভৃত্যের দল।

যখন তারা কালো পাথরের কাছে পেঁছিল গরীব ছেলেটি খানের ভৃত্যদের আদেশ দিল সেখানকার মাটি খুঁড়তে, মাটি খুঁড়ে তারা সোনার বাটটা পেল।

‘তুমি দেখছি সত্যিই দিব্যদর্শী,’ বলল খান, ‘তোমাকে আমার কাজে লাগবে।’

এত খুশী হল খান যে তখুনি তাকে হাজারটা ভেড়া, একশোটা দুগ্ধবতী ঘুড়ী আর একপাল উট দিতে আদেশ দিল তারপর তাকে বাড়ী ফিরে যেতে অনুমতি দিল।

এর কিছুদিন বাদে আবার সেই চোরটাই খানের প্রিয় ঘোড়াটা চুরি করল। দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল খান। আবার গরীব ছেলেটিকে ডাকিয়ে এনে বলল:

‘যদি তুই দিব্যদর্শী তো বল আমার ঘোড়া কোথায়, আগের বারের চেয়েও বেশী পুরস্কার দেব তোকে। আর যদি তুই উত্তর দিতে অস্বীকার করিস বা ঠিক উত্তর দিতে না পারিস তো তোর মাথা কাটা পড়বে।’

ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ছেলেটির, খানের কথার প্রতিবাদ করতে সাহস হল না, আবার বলল স্তেপের মাঝে তাঁবু খাটিয়ে দিতে। খানের আদেশমত তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হল।

একা তাঁবুতে বসে গরীব ছেলেটি ভাবতে লাগল কি করে মৃত্যুর হাত এড়ান যায়। মাঝ-রাত পর্যন্ত বসে বসে ভাবল সে। তারপর চুপিচুপি তাঁবু থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল যেদিকে দুচোখ যায়।

দৌড়তে দৌড়তে এসে পেঁছিল দুটো উঁচু পাহাড়ের মাঝে একটা নিভৃত নির্জন জায়গায়, একটা গাছের নীচে শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

চোরটাও ওদিকে খানের ঘোড়াটা চুরি করে ঐ গিরিখাতেই এসেছে। চারদিক দেখেশুনে সে ভাবল এখানে তার ভয়ের কিছু নেই, এখানেই রাতটা কাটাবে সে।

ঘোড়াটাকে গাছে বেঁধে রেখে, নিজে সেই গাছের নীচেই শুয়ে পড়ে গোটা জায়গাটা কাঁপিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল, লক্ষ্যও করল না যে সেখানে আর একজন লোক ঘুমিয়ে আছে।

সেই ভয়ঙ্কর নাকডাকার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল গরীব ছেলেটির, প্রথমে সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুঝতে পারল না কোথা থেকে আসছে আওয়াজটা। তারপর দেখতে পেল তার কাছেই একজন লোক শুয়ে আছে আর গাছে একটা ঘোড়া বাঁধা। সন্দেহই রইল না যে, এই সেই চোর আর খানের দ্রুতগামী ঘোড়াটা। ভয়ে আনন্দে তার বুক ধকধক করে উঠল।

পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘোড়াটাকে খুলল গাছের থেকে, এক লাফে তার পিঠে চড়ে রওনা দিল খানের ছাউনির দিকে।

ভোরবেলায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে খান যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই ছুটে বেরিয়ে এল ছাউনির থেকে, নিজের প্রিয় ঘোড়াটাকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। খান কাছে এগিয়ে গেলে ঘোড়াটা চিঁহিঁ করে উঠল তখন খান বুঝল যে এটা তারই ঘোড়া। আনন্দে খান যা যা গরীব ছেলেটিকে দেবার কথা ছিল তা তক্ষুণি দিয়ে দিতে আদেশ দিল আর বিশেষ সৌজন্যের চিহ্ন হিসাবে তাকে এক পেয়ালা কুমিস খেতে আমন্ত্রণ জানাল।

ভৃত্যেরা ছাউনির ভিতর থেকে রেশমীকাপড়ে মোড়া বালিশ নিয়ে এল খানের জন্য আর সোনার পেয়ালাভরা নেশাধরান কুমিস দিল খানের হাতে। গরীব ছেলেটি খানের থেকে একটু দূরে মাটিতেই বসল, ভৃত্যেরা তাকে কাঠের পেয়ালায় ঢেলে দিল ভেড়ার দুধ মেশান টাটকা কুমিস।

যখন খান কুমিস প্রায় শেষ করে এনেছে তখন একটা বিরাট ফড়িং লাফিয়ে পড়ল তাঁর পেয়ালার মধ্যে। খান ধরতে চাইল ফড়িংটাকে কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে মাটিতে পড়ল সেটা। হাত দিয়ে চেপে ধরতে চাইল খান সেটাকে কিন্তু আবার লাফিয়ে পেয়ালার মধ্যে পড়ল। এবার খান কায়দা করে ধরতে পারল ফড়িংটাকে, ধরে রেখে দিল হাতের মুঠোয়।

গরীব ছেলেটি এসব কিছুই দেখে নি।

খান তাকে বলল:

‘এই দিব্যদর্শী, তোকে আমি শেষবারের মত পরীক্ষা করতে চাই: বল দেখি কি আছে আমার হাতে ?’

গরীব ছেলেটি ভাবল, ‘ব্যাস ! এবার আমার হয়ে গেল ! এবার আর ছাড়ান নেই।’ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোরে জোরে বলল:

‘একবার পালায়, দুবার পালায়, তিনবারের বার মরতে হয়।’

খান ভাবল ছেলেটি ফড়িংয়ের কথা বলছে, তাই বলল, ‘সাবাস ! ঠিক বলেছিস !’

গরীব ছেলেটির উত্তরটা মনে করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল খান, তারপর তাকে দামী দামী উপহার দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলল।

সেই থেকে ছেলেটির আর কোন কিছুরই অভাব নেই আর তার দুই ধনী ভাই তার এমন সুদিনের কথা শুনে মনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দু’জনেই একই দিনে মারা গেল।
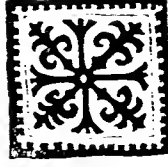
ভাল ও মন্দ

প্রাচীনকালে দু'জন মানুষ ছিল পৃথিবীতে — জার্কাসিলিক (ভাল) আর জামানদিক (মন্দ)।

জামানদিক একদিন দূরের পথে পাড়ি দিল। পথ চলতে চলতে সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় তার পেছনে একজন লোককে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল। এ আর কেউ নয়, স্বয়ং জার্কাসিলিক। তারা দু'জনেই একই পথে যাচ্ছে।

'আমাকে সঙ্গে নাও,' জামানদিক তাকে বলল, 'তোমার ঘোড়াটা ভাল, আমাদের দু'জনকে নিয়ে যেতে পারবে। একসঙ্গে যেতেও আমাদের ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে, আমি রাজী,' বলল জার্কাসিলিক, 'কিন্তু একটা সর্তে, আমরা পালা করে ঘোড়ায় চড়ব। ঐ যে, দেখছিস দূরে গাছগুলো ? ঐখানে ঘোড়াটা রেখে তুই হেঁটে যাবি আর আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব। তারপর আবার তুই ঘোড়ায় চড়ে যাবি। আর আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে, তুই নিজেই ভেবে দেখ, ঘোড়াটা তুলতেই পারবে না।'

জামানদিক জানাল সে রাজী, ঘোড়ায় চড়ে সে রওনা দিল।

চলছে জার্কাসিলিক অনেকক্ষণ ধরে। দিন এদিকে ফুরোতে চলেছে, রাস্তার দুদিকে গভীর বন শুরু হয়েছে, কিন্তু জামানদিক বা ঘোড়া কেউ কোথাও নেই।

জামানদিক বন্ধুকে ঠকাল নাকি।

হ্যাঁ তাই, জার্কাসিলিকের চোখের আড়ালে চলে গিয়ে জামানদিক যেখানে তার যাওয়া দরকার সেদিকেই রওনা দিয়েছে। 'যাক, ঘোড়ার পেট ভরা থাকলে খুব জোরে ছোটে,' ভাবল জার্কাসিলিক।

যেতে যেতে সে বনের মধ্যে এক পরিত্যক্ত কুটির দেখতে পেল, ঢুকল সেটার ভেতর বিশ্রাম নেবার জন্য।

কুটীরটায় মানুষজন নেই, খাঁ-খাঁ করছে। কেবল কুটিরের মাঝখানে আগুনের ওপর এক বিরাট কড়াই বসান, আর কড়াইতে মাংস রান্না হচ্ছে। জার্কাসিলিক অবাক হয়ে ভাবল, 'এমন সুস্বাদু গন্ধ বেরোচ্ছে রান্নার কিন্তু কাউকে তো দেখছি না। কে থাকে এখানে ?'

'আচ্ছা, একটু চেখে দেখি তো,' বলে জাকসিলিক কড়াইতে আঙুল ডুবিয়ে তারপর চুষল আঙুলটা, 'বাঃ বেশ!' ভাবল সে। কিন্তু খেতে আরম্ভ করল না, কুটীরের মালিকের অপেক্ষা করতে লাগল।

ছাদের ওপর একটুখানি সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল জাকসিলিক।

একটু পরে কুটীরে এসে ঢুকল এক নেকড়ে, এক শিয়াল আর এক সিংহ। ক্ষুধার্ত নেকড়ের চোখগুলো মশালের মত জ্বলছে, সিংহ কেশর ফুলিয়ে গরগর করছে আর শিয়াল যাচ্ছে না তো যেন ভেসে চলেছে, কেবল হাওয়ায় নাকটা ভাসিয়ে রেখেছে।

'হায় হায় কেউ আমাদের খাবার চেখে দেখেছে।' কড়াইয়ের কাছে না গিয়েই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল শিয়াল।

'কি বলছিস শিয়াল, কে এখানে আসবে, আমাদের খাবার চাখবে। এ তোর মনের ভুল!'

আশ্বস্ত হল শিয়াল। তারপর তারা কড়াইয়ের চারদিকে বসে খেতে আরম্ভ করল।

খাওয়া শেষ হলে তারা বলতে আরম্ভ করল সারাদিন তারা কে কি করেছে।

'কোথায় তুই গিয়েছিলি শিয়াল, কি দেখলি, কি মজার খবর শুনলি?' সিংহ আর নেকড়ে শিয়ালকে জিজ্ঞাসা করল।

শিয়াল কিন্তু বেশী কথা বলতে চাচ্ছে না:

'এ ক'দিন আমি রোজই যাই সেই পোড়ো জায়গাটাতে। সেখানে রুপোর মোহরভরা একটা ছোট্ট কলসী পোঁতা আছে। ভাল লোকের জন্য আমি সেই কলসীটা পাহারা দিয়ে রাখছি।'

নেকড়েরও ইচ্ছে হল নিজের উদারতা জাহির করার কিন্তু তেমন মনের জোর নেই তার:

'প্রতিদিন প্রতিরাতেই আমি জমিদারের ভেড়ার পালগুলির কাছে যাই,' বলতে আরম্ভ করল নেকড়ে। 'পালে আছে একটা চকরা বকরা রংয়ের খুব সুন্দর ভেড়া। ওটাকেই কখনও ছুঁই না আমি। ঐ ভেড়াগুলির মালিকের এক সুন্দরী মেয়ে আছে। কয়েকবছর ধরেই সে অসুখে ভুগছে, কেউই তার সে অসুখ সারাতে পারছে না, আর মেয়ের রোগ যে সারাতে পারবে তার হাতেই মেয়েকে তুলে দেবে তার বাবা, কিন্তু সারাবে কে, রোগ সারাবার ওষুধই তো কেউ জানে না। ওষুধ কিন্তু আছে একটা। ঐ চকরা বকরা ভেড়াটার হৃৎপিণ্ডটা কেটে সেটাকে রান্না করে মেয়েটিকে যদি খাওয়ান যায়, তাহলে এক মুহূর্তেই ও সেরে উঠবে। পালের মালিক বেশ কয়েকবার ফাঁসদড়ি দিয়ে আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে, ওর ওপর আমার রাগ আছে তাই ওই ভেড়াটার কথা আমি কাউকে বলব না।'

সিংহ স্বীকার করল:

'প্রতিরাতে আমি জমিদারের ঘোড়ার পালের কাছে চুপিসারে যাই, একটা ঘোড়া মেরে সরিয়ে নিয়ে আসি, তারপর সেটাকে খেয়ে ঘরে ফিরি। ঘোড়ার পালের মালিক জানে না কে প্রতিরাতে ঘোড়া নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগে সে গ্রামবাসীদের ডেকে অনেকক্ষণ কথা বলেছে, আর যে চোর ধরে দিতে পারবে তাকে ঘোড়ার একটা পাল দিয়ে দেবে বলেছে। আমি কিন্তু

মোটেই ভয় পাই নি। জমিদারের একটা ঘোড়াও আমাকে ধাওয়া করে নাগাল পেতে পারবে না। পালে একটা বাচ্চা ঘোড়া আছে বটে তার কপালে সাদা একটা ছাপ আছে, সেটাই কেবল আমার নাগাল পেতে পারে। কিন্তু মালিক তো আর তার কথা জানে না।'

কথাবার্তা বলার পরে তারা তিনজন বসে বসে ঢুলতে লাগল। একটু পরে ঘুম ভেঙে উঠে তারা যে যার কাজে চলে গেল।

জার্কাসিলিক ছাতে শুয়ে শুয়ে মন দিয়ে শুনছিল তিনজনের কথাবার্তা, তারপর যেই শিয়াল, নেকড়ে আর সিংহ কুটীর থেকে বেরিয়ে গেল, সেও উঠে বেরিয়ে গেল।

হাকিমের পোশাক পরে জার্কাসিলিক সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে চলল. যে গ্রামের জমিদারের মেয়ে অসুস্থ। হাকিমকে দেখে জমিদার কেঁদে পড়ল:

'স্বয়ং খোদা আপনাকে আমাদের গ্রামে পাঠিয়েছেন! পোশাকেআশাকে আপনি দরিদ্র হলেও, জ্ঞানে বুদ্ধিতে আপনি ধনী! আসুন একবার আমার মেয়েকে দেখুন!'

কোন কথা না বলে জার্কাসিলিক সম্মতি জানাল তারপর মেয়েটিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল:

'এর কোন চিকিৎসা করান নি কেন?'

'চিকিৎসা করিয়েছি, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কেবল এমন কোন ওষুধ পাই নি যা ওর অসুখ সারাতে পারে। হয়ত আপনি দয়া করে ওর অসুখ সারাতে পারবেন!'

'তোমার মেয়েকে সারিয়ে তুলব আমি কিন্তু তার বদলে ওর বিয়ে দিতে হবে আমার সঙ্গে,' বলল জার্কাসিলিক।

রাজী হল জমিদার।

'একটা কথা কেবল মনে রেখ,' আরো বলল জার্কাসিলিক, 'তোমার আজকের অতিথি এক বিশেষ সম্মানিত অতিথি, তাই বেসবারমাক তৈরী করার জন্য ঐ চকরা বকরা ভেড়াটাকে কাটবে।'

কেঁপে উঠল লোভী জমিদার যেন ছুঁচ ফুটল তার গায়ে: ওটা তার পালের সব থেকে বড় ভেড়া। কিন্তু কি আর করে, ঐ ভেড়াটা কাটতে হুকুম দিল আর বলল মাংসটা রেখে দিয়ে ভেড়ার নাড়ীভুঁড়ি রান্না করে দিতে অতিথির জন্য।

জমিদারের চালাকি ধরতে পারল জার্কাসিলিক, এটাই তার দরকার ছিল।

মেয়েটিকে হৃৎপিণ্ডটা খাইয়ে জার্কাসিলিক তাকে সারিয়ে তুলল, আর তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল।

তারপর শিয়াল যে পোড়ো জায়গাটার কথা বলছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বার করে মাটি খুঁড়ে রুপোর মোহরভরা কলসটা তুলে নিয়ে যে জমিদারের প্রতিরাতে ঘোড়া চুরি হচ্ছে তার কাছে চলল।

'প্রতিরাতে যে তোমার ঘোড়া চুরি করছে সেই চোরকে যদি ধরতে পারি আমি তার বদলে তুমি আমাকে কি দেবে?' জার্কাসিলিক জিজ্ঞাসা করল সেই জমিদারকে।

'যদি তুমি চোর ধরতে পার, আমি তোমাকে একপাল ঘোড়া দেব।'

'ঠিক আছে।' বলল জার্কাসিলিক।

ঘোড়ার পালের মধ্যে গিয়ে কপালে সাদা ছাপওয়ালা বাচ্চা ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁৎ পেতে রইল সে।

সিংহটা এসে যেই একটা ঘোড়া ধরেছে অমনি জার্কাসিলিক লাফিয়ে বাচ্চা ঘোড়াটার পিঠে উঠেই ধাওয়া করল সিংহের পিছনে। একটু পরেই সিংহটাকে ধরে মেরে ফেলল।

পরের দিন পুরস্কার পাওয়া একপাল ঘোড়া নিয়ে সে ঘরে ফিরে গেল।

এই সব ঘটনার পরে অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন তার দেখা হল জামানদিকের সঙ্গে।

নিঃস্বর মত চেহারা জামানদিকের। পুরনো, ছেঁড়া একটা পোশাক গায়ে, সেইরকমই ছেঁড়া তার টুপিটা, নোংরা তুলোর টুকরো চারদিকে বেরিয়ে আছে সেটা থেকে।

'হায় রে জার্কাসিলিক, সেবার আমি তোর অমন ক্ষতি করলাম,' বলল জামানদিক, 'কিন্তু সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেল দেখছিসই তো! বল দেখি, তুই এমন ধনী হলি কি করে? আমিও তোর মত ধনী হতে পারব নাকি?'

জার্কাসিলিক যা যা ঘটেছিল সবকিছুই বলল তাকে — কেমন করে সে সেই কুটীরটায় গিয়ে পড়ে, কেমন করে সিংহ, নেকড়ে আর শিয়ালের কথাবার্তা শুনতে পায় আর তারপর সে কি করে।

'চেষ্টা করে দেখ তুই,' শেষে বলল জার্কাসিলিক, 'কেবল সতর্ক করে দিই, যখন কুটীরের মধ্যে ঢুকবি, সাবধান, যদি কড়ায় মাংস রান্না হতে থাকবে তো মাংস তোর খাওয়া উচিত নয়, একটা আঙুল ডুবিয়ে চেখে দেখবি কেবল। তারপর ছাতে উঠে অপেক্ষা করবি কুটীরের বাসিন্দাদের ফিরে আসার। তারপর তারা ফিরে এসে যখন কথা বলবে তুই সেসব কথা ভাল করে শুনবি আর মনে রাখবি।'

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে জামানদিক জার্কাসিলিকের কাছে বিদায় নিয়ে বনের দিকে চলল। কুটীরটা খুঁজে পেল বিনাকষ্টেই, কুটীরে ঢুকে দেখল সবকিছু ঠিক তেমনই আছে যেমন জার্কাসিলিক বলেছিল।

কুটীরের মাঝখানে আগুনের ওপর কড়াই বসান, আর তাতে মাংস রান্না হচ্ছে। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত জামানদিক খুশীই হল যে কুটীরে কেউ নেই।

'কুটীরের মালিকরা ধারেকাছে নেই, কিছুই জানবে না ওরা,' এই ভেবে জামানদিক কড়াইয়ের কাছে বসল। কড়াই থেকে কয়েকটা মাংসর টুকরো তুলে নিয়ে চটপট খেয়ে নিল, তারপর কুটীরের চালে উঠে বসল সে।

মাংসটা পেটে পড়ায় জামানদিকের সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে অমনি শিয়াল আর নেকড়ে একে ঢুকল। কড়াইয়ের দিকে তাকিয়েই শিয়াল চীৎকার করে বলল:

'আরে! কে আমাদের খাবার খেয়েছে দেখছি।'

নেকড়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল:

'কে আর খাবে আমাদের খাবার। নিজেই ভেবে দেখ: এমন গহীন বনে আমাদের কুটীর, যে আমরা নিজেরাই অতি কষ্টে কুটীরে ফেরার পথ খুঁজে পাই।

'না, না, এবার আর আমাকে ভুল বোঝাতে পারবে না। এস এদিকে, দেখ। টেংরিটা তো নেই কড়াইতে ? আর পাঁজরাটাই বা গেল কোথায় ? নেই তো ! এখন আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব,' ধূর্ত শিয়াল বলল, 'ঘুমের মধ্যে দেখতে পাব কে এসেছিল আমাদের ঘরে।'

শুয়ে পড়ল শিয়াল, একটু নাক ডাকাতে লাগল যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর জামানদিক এদিকে আধমরা হয়ে পড়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে মাংস খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে নি বলে।

ঘুম ভেঙে শিয়াল বলল:

'শোন বন্ধু, আমাদের চালে কে যেন আছে। ওই মাংস খায় নি তো ?'

শিয়াল আর নেকড়ে চালে উঠে জামানদিককে দেখতে পেল। তাকে নীচে টেনে নামিয়ে তারা দু'জনে আধাআধি ভাগ করে নিল তাকে।

ধনী ও দরিদ্র

নীল পাখী

অনেকদিন আগে দুই ভাই ছিল। ছোটভাইয়ের কোনো ছেলেপিলে ছিল না, বিরাট ব্যবসা তার, বেশ প্রাচুর্যের মধ্যেই থাকত। বড় ভাই দীনজীবন যাপন করত, তার জীবনের একটাই আনন্দ তার দুই ছেলে — হাসেন আর হুসেন।

গ্রীষ্মকালে ফলে যেই পাক ধরত, হাসেন আর হুসেন ফল তুলতে যেত আর তাদের মা সেই ফল বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচত। এভাবেই তাদের পরিবারের খাওয়াপরা চলত।

একদিন দুপুরবেলায় চারদিক যখন নিস্তব্ধ, সূর্য ঠিক মাথার ওপর, রোদের তেজে চোখে এমন ধাঁধাঁ লাগে যে নদীর জল বইছে কি বইছে না বোঝা যায় না, এমন সময় হাসেন আর হুসেন নদীর পাড়ের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের পায়ের কাছ থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল এক অপূর্ব সুন্দর নীল পাখী। তারা ভাল করে দেখে ওঠার আগেই পাখীটা অনেক উঁচুতে উড়ে চলে গিয়ে তারপর মিলিয়ে গেল। তখন হাসেন আর হুসেন পাখীটার বাসা খুজতে লাগল, খুঁজে পেলও বাসাটা। দেখে বাসায় রয়েছে ডিম কয়েকটা। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল তাদের তাই ডিমগুলো দেখে খুশী হল তারা। কিন্তু ভীষণ ছোট ডিমগুলো তাই হাসেন হুসেন ভাবল, 'এগুলো খেলে পরে কিছু কাজই হবে না। তার থেকে বড়োলোক চাচার কাছে নিয়ে যাই।' বাড়ীতে না গিয়ে তারা গেল সোজা চাচার কাছে, ডিমগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল সেগুলো চাচা কিনবে নাকি।

'কোথায় পেলে এগুলো ?' জিজ্ঞাসা করল চাচা।

'মাঠে, আমরা যেখানে কালোজাম কুড়োচ্ছিলাম, সেখানে।' দুই ভাই বলল।

চাচা ডিমগুলো নিয়ে একশো রুবল দিল তাদের হাতে, তারা তো অবাক। চাচা বলল: 'যদি তোরা পাখীটাকে ধরতে প্যারিস তো আরো দুশ' রুবল দেব তোদের।'

চাচার নীল পাখীটার দরকার কেন, তা হাসেন হুসেন বুঝল না, কিন্তু তারা চিন্তাভাবনা না করে পাখী ধরার জাল নিয়ে চলল সেই জায়গায় যেখানে তারা পাখীটাকে দেখেছিল। পাখীটার বাঁসার ওপর জালটাকে বিছিয়ে দিয়ে নিজেরা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল।

একটু পরেই উড়ে এল পাখীটা, চারদিক তাকিয়ে বাসায় নামল যেই অমনি জালে আটকা

পড়ল। অপূর্ব সুন্দর পাখীটাকে দেখে ছেলেদুটির খুব মায়া লাগলেও সেটাকে চাচার কাছে নিয়ে গেল তারা। অমন যে কিপটে চাচা এবারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দিল দু'শো রুবল, চিনি আর জামাকাপড় (পাখীটার বেশ দাম আছে তার কাছে দেখা গেল)। দুই ভাই সে সব নিয়ে বাড়ী গেল।

কিন্তু তাদের পরিবারে সুখ টিঁকল না।

নীল পাখীর হৃৎপিণ্ড

হাসেন হুসেন বা তাদের বাবা কেউই জানল না যে চাচা পাখীটাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, কেটে তার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল:

'সন্ধ্যাবেলায় ফিরব আমি, এটাকে রান্না করে রেখো আমার জন্যে। দেখো, এই মাংসের একটা টুকরোও কাউকে দিও না যেন। কেমন ?'

তার স্ত্রী ভাবল, 'এটুকু মাংসতে কি হবে, একটা গোটা ভেড়া খেয়ে নেয় কর্তা যেখানে ?' কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে পাখীটার পালক ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে কড়াইতে চাপিয়ে জল দিয়ে আগুনে বসাল। আর নিজে পাশের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে গল্পে জমে গেল।

এমন সময় হাসেন আর হুসেন কৌতুহলবশত চাচার বাড়ীতে গেল পাখীটাকে নিয়ে চাচা কি করল দেখার জন্য। ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে কেউ নেই। উনুনে বসান কড়াই থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছে।

'আমাদের পাখীটা সেদ্ধ হচ্ছে নাকি ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল হাসেন।

'হবে হয়ত,' হুসেনও সমান বিস্মিত।

কড়াইটার ঢাকা খুলে তারা দেখল যে সেই পাখীটা রান্না হচ্ছে।

'আয়, পাখীটার মাংস কেমন একটু চেখে দেখি,' বলল হাসেন।

'নিশ্চয়ই চেখে দেখব,' বলল হুসেন।

হাতায় করে তারা পাখীটার হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিয়ে আধাআধি করে খেল দু'জনে, তারপর চলে গেল।

চাচার স্ত্রী এদিকে ঘরে ফিরে হাতা দিয়ে মাংসটা নাড়তে গিয়ে দেখে হৃৎপিণ্ডটা নেই। 'কর্তার কাছে বকুনি খেতে হবে এখন। এমন করে গল্পে জমে যাবার কি দরকার ছিল।' নিজের ওপর রাগ হল তার।

কিন্তু শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভিজবে না। বাইরে বেরিয়ে উঠোনে মোরগটাকে ধরে, কেটে তার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে কড়াইতে ফেলে দিল, তবে স্বস্তি হল তার।

সন্ধ্যাবেলায় কর্তা বাড়ী ফিরল। মাংস খুব ভাল রান্না হয়েছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে কর্তা চোখ টিপে হেসে স্ত্রীকে বলল:

'এবার, গিন্নী, খোদা আমাদের সৌভাগ্য দিয়েছেন! সকালবেলায় ঘুম ভেঙে আমরা বালিশের নীচে মোহর পাব।'

গিন্নী চুপ করে রইল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে বালিশের নীচে কিছু নেই। গোটা বিছানাটা উল্টে হাঁটকেও কিছু পেল না।

বনের মধ্যে

হাসেন আর হুসেন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বালিশের নীচে একটা করে থলিভরা মোহর দেখে ভীষণ অবাক হল। তাদের বাবামাও তা দেখে কম অবাক হল না, তাদের বাবা জীবনে এই প্রথম এত মোহর দেখে ভয় পেয়ে গেল, দৌড়ল ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চাইবার জন্য।

'হায়, হায়, ভাই রে, এ আমার কি হল? সকালে আমার ছেলেদের বালিশের নীচে থেকে এক থলি করে মোহর পাওয়া গেছে। এ ভাল না মন্দ বুঝছি না।'

ধনী ভাইয়ের চোখ হিংসায় জ্বলে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে মুখ নামিয়ে ভীষণ স্বরে বলল:

'খারাপ, খুবই খারাপ! জিন ভর করেছে নিশ্চয়! মোল্লার সঙ্গে কথা বলেছিলাম একবার, তিনি বলেছিলেন — 'অশুভ জিন মানুষের ক্ষতি করে। এই অশুভ জিনকে দূর করতে হবে।' ছেলেদের দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল, ওরা বেঁচে থাকলে তোমার জীবনে ভাল কিছু হবে না। আর মোহরগুলো আমায় দিয়ে দাও।'

মুখ অন্ধকার করে হাসেন হুসেনের বাবা বাড়ী ফিরল। অনেক ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করল, 'না, নিজের ছেলেদের মেরে ফেলতে আমি পারব না। অনেক দূরে বনের মধ্যে ওদের রেখে দিয়ে আসব যাতে আমি ওদের দেখতে বা ওদের কথা শুনতে না পাই।'

পরের দিন সকালবেলায় প্রতিবেশীর ঘোড়ার গাড়ীটা চেয়ে নিয়ে ছেলেদের তাতে বসিয়ে বলল:

'এখন আমি তোমাদের নিয়ে যাব এমন এক জায়গায় যেখানে অনেক অনেক ফল আছে। সন্ধ্যাবেলায় নিতে আসব তোমাদের ততক্ষণে যেন তোমরা জাম কুড়িয়ে একবস্তা করতে পার।'

অনেক পথ পেরিয়ে এক গভীর বনের কাছে এসে পেঁছাল তারা। বড় বড় গাছগুলির গুঁড়িগুলোর মাঝে ঝোপ গজিয়ে উঠেছে, হাসেন হুসেন সেই ঝোপের মধ্যে অনেক জাম ফলে আছে দেখতে পেল।

'বেশ, তোমরা এখান থাক তাহলে, ফল তোল।'

আর কোন কথা বেরোল না তাদের বাবার গলা দিয়ে, পিছন ফিরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেল ঘোড়ার দিকে। বাড়ী ফিরে মোহরগুলো নিয়ে ভাইকে দিয়ে এল, এইভাবে অশুভ জিনের হাত থেকে রেহাই পেল সে।

অনেকক্ষণ ধরে জাম কুড়াল হাসেন আর হুসেন, বস্তা ভর্তি করে ফেলল। তারপর বসে বিশ্রাম করতে লাগল, বাবা আসার অপেক্ষা করতে লাগল। বাবা কিন্তু এলো না। বনেই রাতটা কাটাতে হল তাদের দু'জনকে।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে দেখে তাদের মাথার নীচে আবার এক থলি করে মোহর। মোহর ছুঁলোও না তারা, বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল তারা যেদিকে দুচোখ যায়। পথে তাদের দেখা হল ঘোড়ায় চড়া এক বৃদ্ধ শিকারীর সঙ্গে।

'সালাম, দাদু,' দু'ভাই বলল একসঙ্গেই।

'সালাম, বাছারা! কোথা থেকে আসছ তোমরা আর যাচ্ছই বা কোথায়?'

'কোথা থেকে আসছি জানি না, বনটা তো বিশাল, আর যাচ্ছি পথে প্রথম যে লোকের সঙ্গে দেখা হবে তার কাছেই। তার যদি ছেলে না থাকে আমরা তার ছেলে হয়ে থাকব।'

'আমার ছেলে-মেয়ে নেই, আমার ছেলে হবে তোমরা। যাবে আমার সঙ্গে?'

'যাব!' রাজী হল দু'ভাই।

তাদের দু'জনকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে বুড়ো বলল, 'আমার ঘরের কাছে ঠিক তোমাদের পেঁাছিয়ে দেবে ঘোড়াটা।'

ভাই দু'জন বুড়োকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, 'দাদু, যেখানে আমরা ঘুমিয়েছি রাত্রে সেখানে দুই থলি সোনার মোহর আছে।'

... হাসেন হুসেন বুড়ো শিকারীর কাছে রইল অনেকদিন, সেখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তীর ছোঁড়া শিখল, অভিজ্ঞ, সাহসী শিকারী হয়ে উঠল। গরীব বুড়োও সেই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনীতে পরিণত হল।

হাসেন হুসেন যখন বড় হয়ে উঠল, তাদের বালিশের নীচে মোহর পাওয়া যায় না আর। একদিন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পুরনো দিনের কথা মনে করতে লাগল।

হাসেন বলল, 'জানিস হুসেন, কথায় বলে, 'কুকুর যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন, ঘুরেফিরে আসবে ঠিক সেখানেই যেখানে সে কখনো মাংস পেয়েছে, আর মানুষের মন টানে সব সময়ই সেইদিকে যেখানে তার জন্ম হয়েছে।' চল, বাবা-মার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি।

'আমার ভাইয়ের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা — অভিন্ন। তুই যেখানে যাবি, আমিও সেখানে যাব। চল রওনা দেওয়া যাক।' বলল হুসেন।

বুড়োর কাছে বিদায় নিতে গেল তারা। বুড়ো শিকারীর মায়া হল তাদের জন্য, বলল:

'একপাল গরু উপহার দিতে পারতাম তোমাদের কিন্তু তোমাদের দেখছি কিছুই দরকার নেই। যাত্রা শুভ হোক আর সাফল্য কামনা করি তোমাদের।'

তাদের দু'জনকে দুটো ভাল ঘোড়া দিল বুড়ো, রওনা হয়ে গেল দু'ভাই।

সাতমাথাওয়ালা সাপ

একমাস ধরে পথ চলে তারা এমন একটা জায়গায় এসে পেঁাছাল যেখানে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

'এখানে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে,' বলল হাসেন, 'তুই যাবি ডানদিকে আর আমি বাঁদিকে।'

'তাই হোক,' হুসেন বলল, 'এখানেই আমরা এসে মিলিত হব ফেরার পথে।'

সেই জায়গাটায় কাঠের হাতলওয়ালা একটা ছুরি তারা মাটিতে পুঁতে দিল।

'আমাদের মধ্যে কে বেঁচে আছে বা মরে গেছে দেখিয়ে দেবে এই ছুরিটা।' বলল হাসেন। 'যদি আমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে তার পথের দিকে ছুরির হাতলের যে আধখানা আছে তা পুড়ে যাবে।'

পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে দু'ভাই দু'দিকে রওনা দিল।

হুসেন তার নিজের পথ ধরে যেতে থাকুক, হাসেন কোথায় গিয়ে পেঁছায় এখন দেখা যাক।

কয়েকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে হাসেন যখন খোলা মাঠে পড়ল, দেখল তার সামনে এক বিরাট শহর।

শহরের যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল হাসেন ততই অবাক হচ্ছিল: চারদিকে দেখা যাচ্ছে কালো পতাকা উড়ছে, বাড়ীগুলো কালো কাপড় দিয়ে মোড়া।

'শহরে এ শোকপালন কি জন্য ?' প্রথম যে বুড়ীর দেখা পেল তাকেই জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি এ শহরের লোক নও দেখছি,' বলল বুড়ী, 'যদি শুনতে চাও তো বলি, আমাদের শহরে দেখা দিয়েছে এক সাতমাথাওয়ালা রাক্ষস সাপ। প্রতিদিন তার খাওয়া চাই একটি মেয়ে আর একটা খরগোস। আজ রাজার মেয়েকে খাবার পালা এসেছে। রাজা চারদিকে ঘোষণা করেছেন যে সাপটাকে মেরে রাজকন্যাকে বাঁচাতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। কেবল শহরে তেমন কোন সাহসী লোককে পাওয়া যায় নি। তাই রাজা আদেশ দিয়েছেন চারদিকে কালো পতাকা টাঙিয়ে দিতে।'

হাসেন সোজা রওনা দিল রাজার কাছে। রাজার সঙ্গে দেখা হল না, রাজার বিশ্রামকক্ষের পাশে একটা ঘরে দেখল একটা খরগোস বাঁধা রয়েছে আর এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কালো চুলের বেনীটা তার উজবেকিস্তানের রেশমের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তার চোখের দৃষ্টি সূর্যরশ্মির মতই ধাঁধাঁ লাগায় চোখে। হাসেনকে দেখে কেঁপে উঠল রাজকন্যা।

'ভয় পেও না,' হাসেন তাকে আশ্বাস দিল। 'আমি তোমায় রক্ষা করব সাপের কবল থেকে। কিন্তু তার প্রতিদানে তুমি আমায় কি দেবে ?'

'যদি তুমি আমাকে রক্ষা করতে পার তবে তোমার স্ত্রী হব আমি।'

হাসেন একটু চিন্তা করে বলল:

'আমি অনেক দূর থেকে আসছি, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব আমি, যখন সাপ আসবে ডেকে দিও আমায়।'

হাসেন গভীর ঘুমে ডুবে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ধুপ-ধাপ, দুম-দাম আরম্ভ হল আর দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। দরজায় সাপটার প্রথমে একটা মাথা, তারপর আর একটা, তারপর আরো একটা মাথা দেখে রাজকন্যার বুক ভয়ে হিম হয়ে গেল।

হাসেন ওদিকে গভীর ঘুমে মগ্ন। মেয়েটির চীৎকারেও তার ঘুম ভাঙল না। সাপটা

এদিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। রাজকন্যা হাসেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে লাগল। তার চোখের জলের উষ্ণ ফোঁটা হাসেনের মুখের ওপর পড়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

চোখ মেলে হাসেন দেখে সামনেই সাপটা। কোমরে লাগান খাপ থেকে ভারী তরোয়ালটা তুলে এক কোপেই সাপটার সাতটা মাথা কেটে ফেলল।

রাজকন্যা নিজের আঙুল থেকে একটা সোনার আংটি খুলে তাকে দিল। হাসেন চলে গেল প্রাসাদ ছেড়ে।

এমন সময় উজীর হঠাৎ দরজার মধ্যে উঁকি মেরে দেখে রাজকন্যা বেঁচে আছে আর সাপটা মুণ্ডুকাটা অবস্থায় পড়ে আছে, অবাক হল সে, কিন্তু তারপরেই তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, রাজার কাছে তার বীরত্ব প্রমাণ করার একটা সুযোগ এসেছে। রাজকন্যাকে দেখা না দিয়ে সে সোজা গিয়ে রাজাকে জানাল এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর।

'আমি নিজের হাতে সাপকে মেরে রাজকন্যার জীবন রক্ষা করেছি।' বলল উজীর। 'এবার আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন মহারাজ, রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।'

'তাই হবে!' বলল রাজা।

সাদা পতাকা টাঙাতে, বাড়ীগুলো সাদা কাপড় দিয়ে সাজাতে আদেশ দিল রাজা, যাতে জনগণ জানতে পারে যে সাতমাথাওয়ালা রাক্ষসটাকে বধ করা হয়েছে আর রাজকুমারী জীবিত আছে। তারপর রাজা উজীরের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করল।

হাসেন শুনল উজীর কেমন দম্ভ করে বলছে সাপটাকে মারার কথা। উজীরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল:

'ও ভীরু আর মিথ্যাবাদী। সাপটা ও মারে নি, মেরেছি আমি। কি করে ও নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করবে!'

হাসেনের দিকে ফিরে তাকাল সবাই, ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে।

'তুই-ই বা কি করে প্রমাণ করবি?' অবহেলার ভাবে বলল উজীর।

'প্রমাণ আছে আমার!' বলে পকেট থেকে আংটিটা বের করে সবাইকে দেখাল সে।

'আংটিটা ও চুরি করেছে রাজকুমারীর হাত থেকে!' হিংস্রভাবে বলল উজীর।

'যদি তুমি সাপটাকে মেরেই থাক, তার মানে, তুমি ওটার মরাদেহটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পার।' হাসেন বলল।

উজীর সাপটাকে তুলতে যত চেষ্টাই করুক না কেন একটুও নড়াতেও পারল না এমনকি, আর হাসেন খুব সহজেই সাপটাকে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল। এমন সময় রাজা ডেকে পাঠিয়েছিল বলে রাজকন্যাও বেরিয়ে এল, বলল:

'এই তরুণ বীরই আমার জীবন রক্ষা করেছে, আমি নিজে ওকে ওই আংটিটা দিয়েছি।'

উজীরকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হাসেনের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকের মধ্যে থাকতে থাকতে কিছুদিনের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল হাসেন, তাই প্রায়ই সে শিকারে বেরিয়ে যেতে লাগল। একদিন দুপুরবেলায় সে নদীর তীর ধরে যাচ্ছিল

ঘোড়ায় চড়ে। শিকারী কুকুরটাও ছুটছে তার সঙ্গে। নদীর তীরে ঝোপের গাছের থেকে ডাল কেটে নিয়ে হাসেন ঘোড়াকে চালাবার জন্য একটা লাঠি তৈরী করল। হঠাৎ হাওয়া উঠল। বরফ পড়া আরম্ভ হল, শীত করতে লাগল ভীষণ। হাসেন একটা জায়গা খুঁজতে লাগল যেখানে হাওয়া আর বরফের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, একটু গরম করে নেওয়া যায় শরীরটাকে। মাঠের মাঝখানে মস্ত বড় একটা দেবদারু গাছ দেখতে পেল। নরম বরফে ঢেকে গিয়ে গাছটা দেখাচ্ছে যেন তাঁবুর মত। সেই গাছের নীচে ঘোড়া আর কুকুরকে রেখে হাসেন গাছের শুকনো ডাল ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে হাতপা গরম করতে লাগল। এমন সময় সে দেখল গাছের ওপর ডালপালার মধ্যে বসে কাঁদছে এক বুড়ী, এমন করুণভাবে কাঁদছে যেন তুষারঝড়ের শনশন আওয়াজ।

'কাঁদছ কেন?' জিজ্ঞাসা করল হাসেন। 'শীতে জমে গেছ নাকি? নেমে এসে আগুনের কাছে বস, শরীর গরম করে নাও।'

বুড়ী বলল, 'আমি নামতে তো পারি, কিন্তু কুকুরটাকে ভয় করছে। তোর ঐ লাঠিটা দে!'

হাসেন বুড়ীর দিকে এগিয়ে দিল লাঠিটা, সেটার জাদুশক্তির কথা জানত না সে। বুড়ী লাঠিটা ঘোড়া, কুকুর আর হাসেনের মাথার ওপর নাড়াল — তারা তিনজনে তিনটি পাথরে পরিণত হয়ে সেই গাছের নীচেই পড়ে রইল।

ভাইয়ের খোঁজে

এবার হুসেনের কি হল দেখা যাক। ভাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পরে সে এক বড় শহরে রাজা হয়ে সেখানেই বাস করছিল।

যেদিন হাসেন পাথরে পরিণত হয় সেদিনই হুসেনের মনটা খারাপ লাগল, ভায়ের খোঁজে যাবে ভাবল সে। ঘোড়া সাজিয়ে রওনা দিল। শেষ পর্যন্ত যেখানে তাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল সেখানে এসে পৌঁছাল সে। ছুরিটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে, ছুরির হাতলের যেদিকটা হুসেনের পথের দিকে নির্দিষ্ট ছিল সে অংশটা ঠিকই আছে, আর অপর অংশটা পুড়ে গেছে। হুসেন বুঝল হাসেন মরে গেছে। কেঁদে ফেলল সে, 'জীবন্ত না হোক তার মৃতদেহটাকেই খুঁজতে যাব।' স্থির করল।

হাসেন যে শহরে থাকত সেখানে এসে উপস্থিত হল হুসেন। তাকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। প্রাসাদে তার দেখা হল এক যুবতীর সঙ্গে, জানতে পারল এ হল তার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের স্ত্রী।

হাসেনের মৃত্যুর পর উজীর শহরে ফিরে এসেছে। এখন হুসেনকে সে এমন আন্তরিক আপ্যায়ন জানাল যে হুসেনের মনে কেমন সন্দেহ হল। 'কি একটা গোলমাল আছে,' ভাবল সে। 'উজীরের হাতেই কি ভাইয়ের প্রাণ গেল নাকি?' সারারাত ধরে ভাবল সে; সকালবেলায়

ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে শুনল যে সে শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসে নি, তাকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ল হুসেন।

হাসেনের মত হুসেনও তুষারঝড়ের কবলে পড়ল। যে দেবদারু গাছটা তার ভাইয়ের আশ্রয়স্থল আর সমাধি হয়েছিল সেটাই হুসেনকেও আশ্রয় দিল। শরীর গরম করবার জন্য সেও আগুন জ্বালাল তারপর গাছের ডালপালার মধ্যে বসে থাকা বুড়ীকে দেখে ভাইয়ের মত তারও মায়া হল।

'গাছ থেকে নেমে এস বুড়ীমা, শরীর গরম করে নাও।' বলল সে।

'নেমে আসতে তো পারি, কিন্তু কুকুরটাকে ভয় করছে।' বলল বুড়ী, 'দাঁড়া, এই লাঠি দিয়ে ওকে একটু ভয় দেখাই।'

হুসেন বুড়ীর দিকে তাকাল, বুকের মধ্যে কি যেন একটা ধাক্কা দিল তার। বুড়ীকে তার জাদু লাঠিটা নাড়াতে দিল না সে, যে পাথরটার ওপর সে বসেছিল তার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তীরধনুক বাগিয়ে ধরে বলল:

'নাম শীগগির, নাহলে এখুনি তীর বিঁধবে তোমার গায়ে!'

বুড়ী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে নেমে এল।

'আমার মনে হচ্ছে তুই জানিস কোথায় আমার ভাই। বল শীগগির মেরে ফেলব নাহলে।'

'যে পাথরটার ওপর তুই বসেছিলি ওটাই তোর ভাই,' বলল বুড়ী। 'উজীর আদেশ দিয়েছিল তোর ভাইকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসে মেরে ফেলতে। তোর ভাইকে আমি ফিরিয়ে দেব, ছেড়ে দে আমাকে। গাছের ডালপালার মাঝে লুকানো লাঠিটা নিয়ে পাথরটার ওপর নাড়িয়ে দে।'

তাই করল হুসেন — এক মুহূর্তে যে পাথরটার ওপর সে বসেছিল সেটা হাসেন হয়ে গেল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই মিলনে দু'ভাইয়ের যে কি আনন্দ হল তা বলে বোঝান যায় না।

ঘরে ফেরা

হুসেন বেশ কিছুদিন রইল হাসেনের কাছে তারপর একদিন ভাইকে বলল:

'এবার হাসেন বুড়ো শিকারীর কাছে থাকার সময় তুই আমাকে যে প্রবাদবাক্যটা বলেছিলি তা তোকে মনে করিয়ে দিই — কুকুর খোঁজে সেই জায়গাটা যেখানে পেট ভরে খেতে পায় আর মানুষ খোঁজে সেই জায়গাটা যেখানে তার জন্ম হয়েছে। এবার আমাদের বাবামায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়া উচিত নয় কি?'

'যদিও তুই প্রবাদবাক্যটা ঠিক বলতে পারিস নি, তবুও আমি রাজী। বাবামা বেঁচে আছে দেখতে চাইলে আর দেরী করা উচিত নয় আমাদের।'

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। প্রথম যে সওদাগরের দলটার দেখা পেল তাদের সঙ্গেই রওনা দিল হাসেন আর হুসেন। তারপর উৎসবের দিনে তাদের শহরের মেলায় এসে পেঁছিল তারা। সেখানে তাদের ধনী ব্যবসাদার চাচাকে দেখতে পেল তারা, মেলায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র

দেখছে, মাল বয়ে নিয়ে আসা বড় সওদাগর দলটার কাছেও এগিয়ে গেল। ভাইয়ের ছেলেদের চিনতে পারল না সে আর যখন তারা নিজেদের পরিচয় দিল তখন সে তোষামোদ করতে লাগল তাদের।

'আমাদের বাবামা কোথায় ?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল দু'ভাই।

'শহরেই আছে। কিন্তু সে বুড়োবুড়ীকে নিয়ে কি আর হবে তোমাদের। চোখেও দেখে না তারা। তোমরা তো এখন বেশ ধনী হয়ে উঠেছ দেখছি।' বলল চাচা।

হাসেন হুসেন সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল বাবামার কথা। লোকেরা তাদের দেখিয়ে দিল একটা জীর্ণ, প্রায় ভেঙে পড়া কুটীর। জানলা নেই কোনো কুটীরটিতে, অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না কে আছে ভেতরে। হাসেন হুসেন আগুন জ্বালিয়ে দেখল তাদের অন্ধ বুড়ো বাবামা নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে বসে আছে।

'বাবা ! মা ! তোমাদের কি হয়েছে ?' চীৎকার করে বলল হাসেন হুসেন।

তাদের গলার স্বর শুনে মা'র চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাবা আনন্দে উত্তেজনায় হাত নাড়িয়ে বলল:

'এখনও পৃথিবীতে এমন কেউ আছে নাকি যার আমাকে প্রয়োজন ? আমার যে ছেলেরা অনেকদিন আগেই মারা গেছে তারা ফিরে এল নাকি ?'

হাসেন হুসেন সব বলল বাবামাকে — কোথায় ছিল এতদিন, কি দেখেছে আর শেষ পর্যন্ত কেমন করে বাবামাকে খুঁজে পেল ইত্যাদি।

'তুমি আমাদের বনে ছেড়ে এসেছিলে কেন ? মোহরগুলোর লোভে নাকি ?' হাসেন জিজ্ঞাসা করল বাবাকে।

'তখন তুমি আমাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে না কেন ? তাহলে তুমি আরো অনেক বেশী মোহর পেতে !' হুসেনও বাবাকে খোঁটা দিতে ছাড়ল না।

'রাগ কোরো না আমার ওপর, বাছারা।' কেঁদে বলল বুড়ো। 'তোমাদের চাচা বলল যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আমি যেন ভাইকে মোহরগুলো দিয়ে দিই আর তোমাদের মেরে ফেলি কারণ তোমাদের ওপর জিন ভর করেছে। তোমাদের না দেখতে পাওয়ার দুঃখ আমরাও ভোগ করেছি আর দেখছই তো কেমন আছি আমরা। তোদের বড়লোক চাচা মোটেই দেখে নি আমাদের। কিন্তু সব থেকে যে বড় শাস্তি পেলাম তা হল তোমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না !'

চুপ করে গেল বুড়ো।

হাসেন হুসেন তখুনি কুটীর থেকে মেলায় গেল, চাচাকে খুঁজে বার করে কূয়োর মধ্যে ফেলে দিল।

মেলা থেকে বাড়ীতে ফিরল হাসেন হুসেন দেখে তাদের বাবামা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে তারা, ছেলেদের দেখে দেখে আর আশ মিটছে না তাদের। খুব অবাক হল দু'ভাই প্রথমটায়, তারপর আন্দাজ করল, এও হল সেই জাদু লাঠিরই কাজ।

কুঁড়ের বাদশা

(জামবুলের* উপকথা)

পেট যার ভর্তি, নিজের পেট ভরাবার জন্য যাকে আঙুলটিও নাড়াতে হয় না সেই অলস হয়ে পড়ে।

আমার জমিজমা এতই অল্প যে এক মুঠিতে ভরে নেওয়া যায়। জমিজমা দেখাশোনার কাজ আমার ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে খুবই সামান্য করে পড়বে। কিন্তু প্রতিবারই যখন আমি ছেলেদের বলি, 'তোমরা আজ এই-এই কাজটা করবে।' তারা বলে, 'গোটা দিনটা এখনও সামনে পড়ে,' অথবা 'কাল করব 'খন।' তাদের এই উত্তর আমাকে রূপকথার গল্পের সেই অলস লোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এমনি একজন অলস লোক ছিল পৃথিবীতে। তার বাবার ছিল বিরাট ধনসম্পত্তি, সে নিজেও একটা গোটা গ্রামের মালিক ছিল, কোন কিছুর অভাব ছিল না তার। সবকিছুই হাতের কাছে তৈরী থাকত তার। কোথাও যেতে চাইলে ঘোড়া প্রস্তুত; খেতে চাইলেই বেসবারমাক আর কুমিস হাতের কাছে পায়। সারা জীবনে নিজের হাতে সে একটা খড়কুটোকে ভেঙে দু'খানা করে নি। যদি বাঁপাশ ফিরে শুয়ে থাকে তো ডানপাশ ফিরতেও তার আলস্য। এমনি অলস সে।

গ্রামটা তার ছিল একটা গিরিখাতে। গ্রামের চারদিকে গজিয়ে ওঠা নলখাগড়া আর হোগলার ঝোপ কখনও কাটা হয় না।

একদিন দূরে স্তেপে আগুন দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল গ্রামবাসীরা। গিরিখাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল আগুন।

ভয়ে গ্রামবাসীরা ঘরদোর ছেড়ে আশ্রয় নিল গাছপালাহীন এক নোনা জমিতে। গ্রামের মালিক ওদিকে নিজের সাদা ইয়ুরতায় শুয়ে আছে, নড়ার চেষ্টাই করছে না, উঠতে আলস্য।

'হুজুর উঠুন, সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, আগুন এগিয়ে আসছে!' তাকে বলতে লাগল সবাই।

---

* জাম্বুল — জাম্বুল জাবায়েভ (১৮১৪ — ১৯৪৫) — কাজাখ চারণকবি। — সম্পাঃ

'যাক গে।' বলল সে।

'হুজুর, আপনি এখানে একা পড়ে থাকবেন।' বলল লোকেরা।

'কি হয়েছে তাতে, একাই থাকব,' একটুও না নড়ে উত্তর দিল গ্রামের মালিক।

কে একজন আরো একবার আগুনের কথা বলল তাকে:

'গ্রামে আগুন লেগেছে, এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের।'

'জ্বলুক গ্রাম, কি হয়েছে তাতে,' শোনা গেল উত্তর।

গ্রামের মালিকের আচরণে বিস্মিত হয়ে গ্রামবাসীরা ভাবল যে সে হল সব অলসদের ঠাকুর্দা।

'যখন তার বিছানা পর্যন্ত আগুনটা এসে পেঁছিবে, তখন হয়ত গতর নাড়াবে ভয়ের চোটে। চল্ থাক পড়ে,' বলে চলে গেল গ্রামের লোকেরা।

আগুনে পুড়তে লাগল গ্রামের ইয়ুরতাগুলি, ঠেলাগাড়ীগুলো, ঘোড়ার আস্তাবল, অলস কিন্তু নিজের ইয়ুরতায় শুয়েই রইল।

যখন আগুন নিভে গেল তখন কয়েকজন সেই পোড়া গ্রামে গিয়ে ছাই আর আধপোড়া সাদা বিছানার মধ্যে গ্রামের মালিককে দেখতে পেল।

তেপেন কক

অনেক অনেক দিন আগে এক গ্রামে এক কিপটে জমিদার ছিল। তার তিনটি বড় বড় ছেলে ছিল। কিন্তু কারুরই বিয়ে হয় নি।

'ছেলেদের বিয়ে দিতে গেলে পথে বসতে হবে আমায়,' বলত সে, 'প্রতিটি পাত্রীর জন্যই ভালমত যৌতুক দিতে হবে, তা আমি পারব না। নিজের সম্পত্তির জন্য মায়া যার আছে সেই একথা বলবে।' গ্রামবাসীদের কাছে দোষ কাটাবার চেষ্টা করত সে।

একদিন ভাইয়েরা মিলে আলোচনা করতে লাগল তাদের ভাগ্যের কথা। বড় আর মেজ ভাই ছোট ভাইকে বলল:

'আমাদের তিনজনেরই ভাগ্য এক। অন্য জমিদারদের ছেলেদের কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের ঘরসংসার, নিজেদের জমিজমা হয়েছে, আর আমরা এখনও বিয়েই করতে পারছি না। আমরা চুপ করে থাকলে কোন লাভ হবে না। তুই সবার ছোট বলে বাবা তোকে বেশী ভালবাসে, তোর কথা হয়ত শুনবে। যা বল গিয়ে, যে আমরা বিয়ে-থা করে সংসারী হতে চাই।'

ছোট ভাই গিয়ে বলল বাবাকে। বাবা একটু ভেবে উত্তর দিল:

'শরৎকাল যখন আসবে, ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠবে, মায়ের দুধের প্রয়োজন হবে না যখন, তখনই তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করব।'

শরৎকাল এল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বড় হয়ে উঠল, মায়ের প্রয়োজন হয় না তাদের আর, ছোট ভাই আবার বাবার কাছে এসে অনুরোধ করল, বাবা বলল:

'শীতকাল কেটে যাবে যখন, আবহাওয়া উষ্ণ হবে, তখন তোমাদের বিয়ে দেব।'

সে বছর দুর্দান্ত শীত পড়ল। অবিরাম বইতে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়া আর তুষারঝড়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর খাদ্যাভাবে গরুঘোড়া শুকিয়ে যেতে লাগল। শীত কমার আগেই জমিদারের গরুঘোড়াগুলো মারা পড়ল।

একটামাত্র ঘোড়ার বাচ্চাকে বাঁচাতে পেরেছিল তিন ভাই অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে। নিজেরা পেটভরে না খেয়ে, বাবাকে লুকিয়ে রুটীর টুকরো এনে তারা খাওয়াত তাকে।

গরুঘোড়া সব মারা যাওয়ায়, অভাবে অনাহারে কিপটে জমিদারও মারা গেল। ভিখারী হয়ে গেল তিন ভাই। বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাতে একবছরও কাটল না।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগল তারা। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হল তাদের।

ঘোড়ার বাচ্চাটা এদিকে বড় হয়ে উঠছে। সাদা ধপধপে গায়ের রং। রোদ পড়ে গায়ের লোম এমন চকচক করে যেন রুপো, ঘন নরম কেশর।

একদিন ছোট ভাই বড় দু'জনকে বলল:

'আমাকে এই ঘোড়াটা দাও। এর পিঠে চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমি রুটি, পয়সা যোগাড় করব, যা পাব তোমাদেরও ভাগ দেব।'

বড় ভাইয়েরা রাজী হল। এইভাবে ছোট ভাই গোটা শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল তাদের খাবার জোটাল।

একবার পাশের গ্রামে বিরাট এক ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করা হচ্ছে। দৌড়ে অংশগ্রহণ করবে পঞ্চাশটা নামকরা দৌড়বাজ ঘোড়া।

ছোট ভাই তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঐ গ্রামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। মাঠে অনেক লোকজন দেখে সে বুঝল ঘোড়দৌড় হবে। 'আমরাও তো অংশগ্রহণ করতে পারি ঘোড়দৌড়ে।' ভাবল সে। নিজের ঘোড়ার ক্ষমতা পরীক্ষা করবার জন্য সে একটা শিকারী কুকুরকে ধাওয়া করে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

ঘোড়ার লাগামে টান পড়তেই জোর ছুট লাগাল সে। কুকুরটাও সমান তালে দৌড়াতে লাগল তার পেছনে।

প্রথম প্রথম কুকুরটাকে কাছে কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু তারপর পিছিয়ে পড়ল। ঘোড়ার ঘন কেশরের ওপর নীচু হয়ে পড়ে ছোট ভাই মাঝেমাঝে পেছনদিকে তাকাচ্ছে আর আনন্দে তার বুকটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে: এমন হাল্কাভাবে দৌড়াচ্ছে ঘোড়াটা যেন ভেসে চলেছে। কুকুরটা অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

ঘরে ফিরে ছোট ভাই বলল:

'তীরের মতই ছুটতে পারে আমাদের ঘোড়াটা। স্তেপে একটা কুকুরকে ধাওয়া করেছিলাম আমি। ঘোড়াটা একটু পরেই পিছনে ফেলে দিল সেটাকে। আমার মনে হয়, দৌড়ে অন্য যে কোন ঘোড়াকে হারিয়ে দেবে ও।'

এই বলে সে ঘোড়াটাকে দৌড়ে নিয়ে যাবার কথা বলল। রাজী হল বড় দু'ভাই।

রাতের বেলায় বিশ্রাম নিল ঘোড়াটা আর সকালবেলায় তিন ভাই মিলে তাকে নিয়ে চলল ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করার জন্য।

ঘোড়দৌড়ের সবচেয়ে ভাল ঘোড়াদুটি ছিল খান বারাকের। তাদের ছাড়া কোনো প্রতিযোগিতাই হয় না, কোনো ঘোড়াই এ পর্যন্ত তাদের হারাতে পারে নি। সেকথা তিন ভাইও জানত, কিন্তু তবুও ভাগ্যপরীক্ষা করবে ভাবল তারা।

ঘোড়দৌড়ের জায়গায় পৌঁছে যখন তারা দেখল যে তাদের ঘোড়াটা একপা খুঁড়িয়ে চলছে। ভীষণ মুষড়ে পড়ল তারা।

কিন্তু তাহলেও প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে চাইল না।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিল তাদের ছেলেকে, আর তিন ভাইয়ের তো বিয়েও হয় নি, ছেলেও নেই তাই তারা নিজেদের ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিল এক গরীব ছেলেকে যাকে সবাই ঠাট্টা করে 'তাজশা বালা' অর্থাৎ গুন্ডা ছেলে বলে ডাকত।

খান বারাকের ছেলেরা তাদের সেই বিখ্যাত দ্রুতগতি ঘোড়ায় চড়ে কারা-কই গিরিখাতের কাছে গেল। সেখান থেকেই দৌড় আরম্ভ হবার কথা।

তাজশা বালাও তাদের সঙ্গে গেল।

সারাপথ জমিদারের ছেলেরা হাসাহাসি করেছে গরীবের ছেলেটাকে নিয়ে, ঘোড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছে, হাতে চিমটি কেটেছে, মাথা থেকে টুপি ফেলে দিয়েছে। চোখে জল এসে গেছে গরীব ছেলেটির কিন্তু সব সহ্য করেছে সে।

যখন কারা-কই গিরিখাতে পেঁছিল তারা, সারি বেঁধে দাঁড়াল সবাই আর তাজশা বালাকে দাঁড় করান হল সবার পেছনে।

দৌড় আরম্ভ হল।

প্রথমে তাজশা বালা পিছিয়ে ছিল কিন্তু শীগগিরই তার ঘোড়াটা ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটতে আরম্ভ করল।

তাজশা বালা একজন অংশগ্রহণকারীকে ধরে ফেলল, তার মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে পোশাকের নীচে লুকিয়ে রাখল। এমনি করল সে বাকী সবাইয়ের সঙ্গেই যতক্ষণ না সে সবাইকে পেরিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। খান বারাকের ঘোড়াগুলোও পিছনে পড়ে রইল।

দৌড় শেষ হতে চলেছে।

লোকেরা অবাক হয়ে গেছে দেখে, যে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাজশা বালা সবার আগে ছুটে আসছে।

গ্রামের কাছে পেঁছে অংশগ্রহণকারীর নিজের বাবার নাম বলার কথা চীৎকার করে। গরীব ছেলেটা বুঝতে পারল না কি করবে। সে ভাবল, 'এখুনি দৌড় শেষ হবে, ঘোড়ার মালিকের নাম বলে চেঁচাব না বাবার নাম বলব?'

ভেবেচিন্তে সে খুশীমনে হাসতে হাসতে চীৎকার করতে লাগল:

'তেপেন কক!' অর্থাৎ দ্রুতগতি সাদা ঘোড়া।

খান বারাকও উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিল, ভাবছিল তার ঘোড়াগুলোই জিতবে। যখন সে দেখল সাদা ঘোড়াটা সবার আগে ছুটছে ভীষণ অবাক হল।

'ভুল দেখছি নাকি?' জিজ্ঞাসা করল সে লোকদের। 'এই বিশ্রী সাদা ঘোড়াটাই সবার আগে ছুটেছে।'

'ঠিক, ঠিক। ওই ঘোড়াটাই সবার আগে ছুটছে!' বলল সবাই।

প্রচণ্ড রাগে জ্বলতে জ্বলতে খান বারাক বলল, 'শয়তান ছেলেটা মাঝপথে এসে যোগ দিয়েছে, এই ঘোড়াটা প্রতিযোগিতায় ছিল না। ভাগিয়ে দাও একে এখুনি!'

খান বারাকের চরেরা তার হুকুম মানতে ছুটল কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

ছেলেটির সামনে যাবার সাহস হল না কারোর। কেবল সবার অজানা একটি মেয়ে সাদা ঘোড়ার লাগাম ধরে ছেলেটিকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল।

ক্রুদ্ধ খান বারাক আবার চীৎকার করল:

'এই ঘোড়াটা দৌড়য় নি, পথে এসে যোগ দিয়েছে এ!'

তখন ছেলেটি সাদা পাহাড়ের ওপর উঠে সব লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল:

'আমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি একেবারে শুরু থেকেই!'

ছেলেটি নিজের পোশাকের ভেতর থেকে অন্য অংশগ্রহণকারীদের টুপিগুলো বার করে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে, 'এই যে ওদের টুপিগুলো। চিনতে পারছ? যদি আমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না থাকে তাহলে এগুলো পেলাম কোথা থেকে? এই শক্তিশালী ঘোড়াটা তার যাবার পথে কিছুই ফেলে রেখে যায় নি, সবই তুলে নিয়েছে!'

তাকে হর্ষধ্বনি দিয়ে বিজয় অভিনন্দন জানাল সবাই।

পরাভূত, অপমানিত খান বারাক পিছন ফিরল, রাগে তার এককালের বিখ্যাত দৌড়বীর ঘোড়াগুলোকে ঘুঁষি মারল কয়েকটা তারপর উধাও হয়ে গেল।

আর তিন ভাই বিজয়উপহার পেল চল্লিশটি ঘোড়া। দশটি ঘোড়া দিল তারা সেই ছেলেটিকে যে তাদের ঘোড়ায় ছুটে জয়লাভ করেছে।

এই ঘোড়দৌড়ের পরে তিন ভাই ভালভাবে থাকতে লাগল, কিছুদিন বাদে তারা বিয়েও করল।

আর ঘোড়াটার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, পুরুষানুক্রমে আজও সেই 'তেপেন ককের' কীর্তির গল্প শোনা যায়।

মাকুন্দ ভাঁড় আলদার কোসের মজার কীর্তিকাণ্ড

যাত্রাগুরু

সো না যায়, এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবীটা দাঁড়িয়ে থাকত ষাঁড়ের ডান শিংয়ে, যখন আকাশের আকার ছিল উটের পিঠের কাপড়টার মত আর মাটি ছিল ঘোড়ার খুরের মত, যখন নেকড়ে ঘাস খেত, ভরতপাখী বাসা বাঁধত ভেড়ার পিঠে, যখন একটি ঘাসের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারত হাজার হাজার ঘোড়ার পাল, যখন জন্তু-জানোয়ার আর পাখীদের লেজ গজান আরম্ভ হয়েছে সবেমাত্র, যখন শিয়াল ছিল ন্যায়পরায়ণ কাজি...

সেই সময়ে নাকি অন্য কোন সময়ে স্তেপে বাস করত এক বৃদ্ধ কোজির। বৃদ্ধের ছিল তিন ছেলে, তিনটি চমৎকার ছেলে। একদিন কোজির ছেলেদের বলল:

'বাছারা আমার, একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, পরপারে যাত্রা করার সময় হয়েছে আমার। আমার বিবেক ঝর্ণার জলের মতই স্বচ্ছ, মৃত্যুকে ভয় পাই না আমি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে জানতে চাই, আমি যখন থাকব না তখন তোমরা কি ভাবে জীবনধারণ করবে, কোন পথ বেছে নেবে। ভেবে উত্তর দাও। মনে রেখো কেবল: ভাল লোকের জন্য ভাল পথ চিরকালই খোলা থাকে।'

বড় ছেলে বলল:

'ছেলেবেলা থেকেই আমার মন পড়ে আছে মাটিতে। জমিতে লাঙল দিয়ে গম চাষ করার চেয়ে ভাল কাজ আর কিছুই নেই আমার কাছে, আমি চাই লোকের ঘরে যাতে সর্বদাই প্রচুর পরিমাণ গমের যোগান থাকে।'

বৃদ্ধ তাকে আশীর্বাদ করল:

'তুমি জমিচাষই কোর, বাছা!'

মেজ ছেলে বলল:

'আমার ভাল লাগে রাখাল হতে। আমি ভালবাসি ঘোড়া, উট, ভেড়া, গরু ছাগল। এই সব জন্তুর পালের তদারক করতেই ভাল লাগে আমার যাতে লোকে পায় মাংস, দুধ, পোশাক আর গরমকাপড়।'

সে ছেলেকেও আশীর্বাদ করল কোজির:

'তুমি রাখালই হও, বাছা!'

ছোট ছেলে বলল:

'আমি ভালবাসি গাইতে, হাসতে আর অন্যদের হাসাতে। গান, ঠাট্টা, রসিক কথাবার্তা ছাড়া জীবনের অর্থ কি। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াব আমি, যাব গ্রামে, গোচারণভূমিতে, পথে ঘাটে আর সরাইখানায়, বাজারহাটে আর উৎসবে, গরীবের চালায় আর খানের প্রাসাদে। প্রতারকদের প্রতারণা করব আমি আর প্রতারিতদের করব সাহায্য, অত্যাচারীদের আনন্দ কেড়ে নেব আর অত্যাচারিতদের মুখে হাসি ফোটাব, অলসদের বোকা বানাব আর কর্মঠদের উৎসাহিত করব, সাহসী কথাবার্তা দিয়ে অহংকারীদের অহংকার ভাঙব আর দুর্বলকে তুলে দাঁড় করাব। শত শত লোক আমাকে ঘৃণা করবে কিন্তু হাজার হাজার লোক আমার বন্ধু হবে। আর হয়ত লোকের মনে থেকে যাবে চিরকাল আমার নামটা — আলদার কোসে*'

ছেলের কথা শুনে মৃদু হাসল বৃদ্ধ, বলল:

'খুব ভাল কথা বলেছিস, বাছা। প্রকৃতি তোকে দাড়ি দেয় নি কিন্তু দিয়েছে প্রখর বুদ্ধি, উদার হৃদয়, হাসিখুশী স্বভাব আর বাকচাতুর্য। যা মনে করেছিস তাই কর। তোর নাম যেন বদমাস লোকের মনে ভয় আর বিরক্তি সৃষ্টি করে আর ভাল লোককে সান্ত্বনা আর আনন্দ দেয়, তোর নাম যেন ছড়িয়ে পড়ে মুখ থেকে মুখে, যুগ থেকে যুগে, এক উপকথা থেকে আর এক উপকথায়। তোমার বাবার শুভকামনা রইল তোমার জন্য। রওনা দাও, আলদার কোসে।'

---

* আলদার কোসে — মাকুন্দ ভাঁড়।

কেমন করে আলদার কোসে জিনকে তাড়াল

জুতো জোড়ায় ভাল করে চর্বি মাখিয়ে, কোমরবন্ধটা আঁট করে বেঁধে, পোশাকের প্রান্ত গুটিয়ে নিয়ে আলদার কোসে দূর পথে রওনা দিল। চলল সে দিন, রাত, মাস, বছর ধরে। হঠাৎ জনহীন স্তেপের মাঝে এক বিরাট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়াল তার সামনে।

থেমে পড়ল আলদার কোসে, ভাবল খানিক, মনে মনে বলল:

'মানুষের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সবচেয়ে শক্ত লোহাও কামারের হাতুড়ীর কাছে বশ মানে। প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলে ছুঁচ দিয়েও কূপ খোঁড়া যায়। না, এই খাড়া পাহাড়ের জন্য আমি পথ থেকে সরে যাব না...'

সেখানেই সে রাত কাটাল। শীতকাল কাটাল। তারপর বসন্তকালে কাজ আরম্ভ করল: পাহাড় কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপ তৈরী করতে লাগল, এমনিভাবে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

তারপর শেষে একদিন আলদার কোসে চূড়ায় উঠল। চোখের সামনে সূর্য দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠল, তারপর পাথরের ওপর পড়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। ঘুম ভেঙে দেখে: বাইগিজ পাখী বসে আছে তার বুকের ওপর, মাথা ঘোরাচ্ছে, পালক পরিষ্কার করছে। পাখীটার পাখনা ধরে ফেলল আলদার কোসে।

'এই আমার প্রথম শিকার! ভয় পাস না, বাইগিজ পাখী, তোকে কষ্ট দেব না আমি। কিন্তু তোকে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হবে...' এদিকে তার মাথায় খেলছে হাজার হাজার ফন্দী।

পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল আলদার কোসে উপত্যকায়, সবুজ উপত্যকা, ফুল দেখে তার চোখ জুড়িয়ে গেল, নীচে উপত্যকায় বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া নদী। নদীর কাছে একটা নতুন, সাদা ইয়ুরতা, ইয়ুরতার ওপর ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী দিয়ে।

'ভাল না মন্দ কোন ধরণের লোকের বাস এখানে? মানুষ নাকি ডাইনী থাকে? ঢুকব ইয়ুরতাতে নাকি পাশ কাটিয়ে যাব?' ভাবল আলদার।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা ফুটোয় চোখ রাখল: দেখে চমৎকার গালিচার ওপর বসে খানাপিনা করছে দু'জন, মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ। ফিসফিস করে কথা বলছে তারা।

'আরে, এখানে দেখছি ভোজসভা চলছে, ভোজসভায় অতিথির উপস্থিতিও প্রয়োজন। ঢুকি তাহলে।'

'হ্যাঁচ্চো।' হাঁচল আলদার কোসে।

'হায়! আমার স্বামী ফিরে এসেছে। শীগ্গির লুকিয়ে পড়।'

পুরুষমানুষটি লাফিয়ে উঠে ইঁদুরতাময় ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল, তারপর পর্দার আড়ালে একটা সিন্দুক দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে দিল।

'সব বুঝেছি,' মাথা নেড়ে আলদার ভেতরে ঢুকল।

'সালাম, গিন্নীমা, ক্লান্ত পথিককে একটু বিশ্রাম নিতে অনুমতি দিন।'

প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মেয়েমানুষটি তাকাল তার দিকে।

'শয়তান তোকে পাঠিয়েছে রে, অনাহূত অতিথি। এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি।'

আলদার কোসে ওদিকে বেশ ভাল করে গেড়ে বসেছে আর মুখভরা হাসি তার।

'হাসছিস কেন?' ক্রুদ্ধ মেয়েমানুষটি জিজ্ঞাসা করে, আর মনে মনে ভাবে, 'এ হারামজাদার মাথায় কোন মতলব আছে...'

'এই খাবারদাবারের দিকে চেয়ে হাসছি,' মিষ্টি করে বলে আলদার।

'খাও, খেয়ে নিয়ে চটপট ভেগে পড়।'

'খাও' কথাটা যদি ফিসফিস করেও বলা হয় তো আলদার ঠিক শুনতে পাবে কিন্তু 'ভেগে পড়' যতই কেন চেঁচিয়ে বল না — আলদার কালা — শুনতে পাবে না। আলদার খেতে আরম্ভ করে দিল তখুনি। আকণ্ঠ খেয়ে আলদার শুয়ে পড়ল সেখানেই গালিচার ওপর।

মেয়েমানুষটা দেখে যে পথিকের যাবার কোন ব্যস্ততা নেই, তখন সে একটা মোহর নিয়ে এসে বলল, 'এই নে, নিয়ে চলে যা এখান থেকে।'

মোহরের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল আলদার এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় ধরে তারপর বলল, 'এবার যাব, গিন্নীমা, চলে যাব... কেবল আমার এই দৈবজ্ঞ পাখীটিকে একটু খাইয়ে নিই পথে বেরোবার আগে,' বলে পাখীটিকে খাবারদাবারের কাছে ছেড়ে দিল।

পাখীটা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে এদিকে রেগে যাচ্ছে মেয়েমানুষটি আর আলদার হাসছে মনে মনে।

হঠাৎ ইঁদুরতার কাছেই শোনা গেল ঘোড়ার ডাক। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ইঁদুরতার মালিক — বাই। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল স্ত্রীকে, 'কে এ লোকটি? আর ওটা কি পাখী?'

কিন্তু মেয়েমানুষটি কোন কথা বলার আগেই আলদার বলল, 'মহামান্য বাই, আমি জাদুকর ও ভবিষ্যদ্বক্তা — দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আর আমার এ পাখীটা দৈবজ্ঞ। সমস্ত গোপন কথা জানা আছে এ পাখীর, এ পাখী বলতে পারে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়েরই কথা। যদি জানতে চাও তো বলি কি বিপদ ঝুলছে তোমার মাথার ওপর?'

তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে অপরিচিতের দিকে তাকিয়ে বাই আরাম করে সেই জায়গায় বসল যেখানে একটু আগেই আলদার আয়েস করে বসেছিল, তারপর বলল:

'যদি তুই সত্যি সত্যিই ভবিষ্যদ্বক্তা হতিস তো তাহলে জানতিস যে এ অঞ্চলে আমিই সবচেয়ে ধনী। ঘোড়া, গরু, ভেড়া, উট — সবকিছুই আছে আমার অগুন্তি। আর ধনীমাত্রেই শক্তিশালী। কি বিপদ হতে পারে আমার।'

'হায়, হায়, বাই!' উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল আলদার, 'কাছে পিঠে নেকড়ে নেই এ কথা বলতে নেই, ওরা খানাখোঁদলে লুকিয়ে থাকে...'

'কি বলতে চাস তুই?' বালিশে হেলান দিয়ে বলল বাই। 'তুই কিছু জানিস?'

'জানি, কিন্তু সব জানি না। দৈবজ্ঞ পাখী জানে সব।'

'যদি জানে তো বলুক!'

আরম্ভ হয় দৈবগণনা। আলদার ছুটে বেড়াতে থাকে ইয়ুরতাময় পাখীটাকে মাথার ওপর ধরে, দুর্বোধ সব কথা বলতে থাকে চীৎকার করে করে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে সব জিনিসপত্র... পাখীটা ক্যাঁ ক্যাঁ করতে থাকে, আলদার চেঁচায়, 'বল রে, জাদুপাখী বল!'

বাই চোখ বড় বড় বড় করে দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে, 'এমন ভবিষ্যদ্বক্তা দেখি নি কখনও। হয়ত সত্যিই কিছু বলবে।'

ওদিকে আলদার কোসে ঘুরছে আরো, আরো জোরে তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, ভয়ঙ্কর স্বরে বলল:

'আরে বাই, খুবই খারাপ অবস্থা।'

বাইয়ের মুখ মলিন হয়ে গেল, 'কি হয়েছে?'

আলদার বলে:

'পাখী বলছে: হলুদ রংয়ের সিন্দুকে বিপদ মোড়া আছে রেশমী কম্বলে। তার মানে শয়তান জিন বাসা গেড়েছে, বাই, তোমার ঘরে। ওকে তাড়ান দরকার!'

ভয়ে কাঁপতে থাকে বাই, তবুও অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে আলদারের দিকে, ভাবে, 'এ লোকটা ঠক নয় তো? জিনের কথা বলে ঠকাতে চাইছে না তো? দেখা যাক কি হয় এবার!'

মুখে বলে, 'তাড়িয়ে দাও ওটাকে, তাড়িয়ে দাও!'

আলদার কোসে বুঝল কি করতে হবে। চুলার ওপর পাত্রে ফুটতে থাকা গরম জল একটা ডেকচিতে ঢেলে নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সিন্দুকের দিকে, ডালাটা একটুখানি তুলে ধরে গরম জল ছিটিয়ে দিল ভিতরে কয়েকবার। তখুনি সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল আর তার ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পুরুষমানুষটি আর দৌড়ে পালাল ইয়ুরতার বাইরে।

কাণ্ডকারখানা দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে বাইয়ের। বাইয়ের গিন্নী ওদিকে লুকিয়েছে গালিচার তলায়। আর আলদারের পেটে খিল ধরে গেল হাসতে হাসতে।

তারপর বাই আত্মস্থ হয়ে আলদারকে জড়িয়ে ধরল:

'হাজার হাজার ধন্যবাদ তোকে ভাই! তুই জিনকে তাড়ালি আমার ঘর থেকে! তুই না থাকলে ঐ জিনের কবলে মারা পড়তাম আমি! এর জন্য উপযুক্ত পুরস্কার পাবি তুই। আমার ঘোড়ার পালে একটা ঘোড়া আছে, ঘোড়া তো নয় যেন ভালুক। ওটাই নিবি!'

আনন্দে লাফিয়ে উঠল আলদার আর বাই খানিক চুপ করে থেকে বলল:

'আর জিনটা যাতে আবার ফিরে না আসে আমার ঘরে, সবকিছুই সম্ভব রে ভাই। তার জন্য ঐ দৈবজ্ঞানী পাখীটা বেচে দাও আমায়। ভাল দাম দেব।'

হাত ঝাঁকিয়ে আলদার বলে:

'কি বলছ বাই! মনেও এন না ও কথা! পাখীটা ছাড়া আমার জীবন হবে আঁধার রাতের চেয়েও কালো।'

বাইও ছাড়ে না, আলদারও দেবে না। রাত পর্যন্ত চলল জোরাজুরি, শেষে হাল ছাড়ল আলদার:

'ঠিক আছে, বাই, দেব তোমাকে পাখীটা। ঠিক করে বলছি: চল্লিশটা ঘোড়ার বদলে কিনি এটিকে। পাখীটির মালিক আজও দুঃখ করে এমন শস্তায় বেচেছে বলে। আমি কিন্তু লাভ করতে চাই না। যতয় কিনেছি, তাতেই বিক্রী করব। চল্লিশটা ঘোড়া পেলেই পাখী তোমায় দিয়ে দেব।'

চোখ পিটপিট করে উঠল বাইয়ের যেন কেউ তার চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়েছে।

'আরে, আরে! বড় বেশী চাচ্ছিস। ঘোড়া তো আর ইঁদুর নয়!'

'ভেবে দেখ, আমিও তো ব্যবসা করছি না। ভবিষ্যৎজানা পাখী তো আর চড়াইপাখী নয়!'

বাই দেখল আর বেশী দরাদরি করলে সব হারাতে হবে। বলল, 'তিরিশটা দেব!'

'তিরিশে হবে না। চল্লিশ!'

'তিরিশ!'

'চল্লিশ!'

দুই ধূর্তেয় তর্ক বেধেছে, সহজে কি আর মেটে? অনেক তর্ক চলার পর বাই শেষে হাল ছেড়ে দিল। কপালের ঘাম মুছে বলল:

'নে তুই চল্লিশটা ঘোড়া! পাখীটা আমার হল।'

আনন্দে না দুঃখে, সত্যি সত্যি নাকি লোক দেখিয়ে কে জানে পাখীটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ইয়ুরতা কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল আলদার, বিদায় নিতে লাগল পাখীটার কাছে:

বিদায়, বিদায় দৈবজ্ঞানী পাখী! তোকে ছেড়ে কি করে বাঁচব আমি? একা কি করে থাকব এই দুনিয়ায়?'

তিন দিন, তারপর আরও তিন দিন, গোটা সপ্তাহ ধরে আলদার বিদায় নিতে থাকে পাখীর কাছে — সুখে আছে, খায়দায়, নরম বিছানায় আরামে ঘুমোয়, তারপর তার মনে হল, 'বদ্ধ জলাশয়ে শ্যাওলা জম্মায়। মানুষের চলার পথের শেষ নেই কিন্তু জীবন ক্ষণস্থায়ী।'

এই ভেবে সে ভালুক-ঘোড়ায় চেপে বসে সামনে বাইয়ের ঘোড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলতে চলতে গান ধরল।

সন্ধ্যার মুখে সে দেখতে পেল এক যুবক পথচারীকে।

'আরে ভাই!' ডাকল যুবকটিকে আলদার, 'হেঁটে যাচ্ছ কেন? তোমার ঘোড়া কই?'

'ছিল ঘোড়া, কিন্তু...' দুঃখিত স্বর তার, 'বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে মরে গেল...'

'তাই নাকি!' বলল আলদার, 'তাহলে আমার পাল থেকে বেছে নাও একটা ঘোড়া। যেটা পছন্দ। তোমাকে দিচ্ছি আমি।'

পরের দিন তার দেখা হল আর এক পথচারী, এক প্রবীন লোকের সঙ্গে।

'আরে চাচা, হে'টে যাচ্ছ কেন? ঘোড়া নেই নাকি?'

'কালও আমার একটা চমৎকার ঘোড়া ছিল, আর আজ... বাইয়ের ছেলেরা পথে কেড়ে নিল ঘোড়াটা। কোনরকমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছি...' বলল লোকটি।

'ঐ গুণ্ডাগুলো যারা গরীব মানুষের জিনিস লুঠ করে তাদের যেন বাপমার মুখ দেখতে না হয়।' প্রচণ্ড রেগে বলল আলদার। 'দুঃখ কোরো না, চাচা! আমার থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে যাও কোথায় যাবে।'

তৃতীয় দিনে আলদারের দেখা হল এক বৃদ্ধের সঙ্গে, লাঠিতে ভর দিয়ে কোনক্রমে পা টেনে টেনে চলছে বৃদ্ধ।

'ও দাদু, বুড়োবয়সে হে'টে স্তেপ পার হওয়া সহজ কথা না, তোমার ঘোড়া নেই নাকি?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল:

'সারা জীবন বাইয়ের ঘোড়ার পাল চরিয়েছি। কিন্তু নিজের ঘোড়া আর কিনে উঠতে পারলাম না। এই হল ব্যাপার রে, বাছা...'

'দাঁড়াও দাদু!' থামাল বৃদ্ধকে আলদার, 'ব্যস্ত হয়ো না! আমার পাল থেকে একটা ঘোড়া নাও! যেটা পছন্দ হয় নাও! না বোলো না! এস আমি তোমায় ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহায্য করি...'

যতই দূরে যায় আলদার কোসে, ততই কমতে থাকে তার ঘোড়ার সংখ্যা। একচল্লিশ দিনের দিন তার রইল কেবল সেই ঘোড়াটা যেটায় চড়ে সে চলেছে।

এমন সময় আলদার দেখে স্তেপের মধ্যে ছুটে চলেছে এক যুবতী।

'কি হয়েছে? কার কাছ থেকে পালাচ্ছ, সুন্দরী?'

'মরণের হাত থেকে!' চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল যুবতীটি, 'আমার বাবা আমাকে বেচে দিয়েছেন এক ধনী বৃদ্ধের কাছে... আর আমি ভালবাসি এক রাখাল-যুবককে। সেও আমায় ভালবাসে... তার কাছেই যাচ্ছি ছুটে। যদি এদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারি তো দরিদ্র জীবনেও সুখী হব। আর যদি ধরতে পারে — তো দু'জনেরই জীবনের শেষ হয়ে যাবে।'

আলদার লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে।

'মিষ্টি বোনটি আমার,' মধুর হেসে সে বলল, 'জীবনের শুরুতেই শেষের কথা চিন্তা করা পাপ। এই ঘোড়া ছুটিয়ে যাও তোমার প্রাণের লোকের কাছে! এই ঘোড়ার চড়ে ছুটলে মৃত্যু, দুঃখ কোনো কিছুই তোমাদের নাগাল পাবে না। সুখেশান্তিতে বে'চে থাকো তোমরা!'

এরপর আলদার চলল পায়ে হে'টে। চলে আর স্তেপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে চেয়ে হাসে, গান গায় পাখীর মত, আগামী দিনে কি হবে তার সেকথা ভাবে না আর পূর্বে যা হয়ে গেছে সে কথা ভেবে মন খারাপ করে না।

কেমন করে আলদার কোসে শয়তানকে জবদ করল

সত্যি কিনা জানি না — শয়তান এক সময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্তেপে স্তেপে। অনেক ক্ষতি করছিল লোকের। যেদিকেই সে যায়, সেখানেই বিপদ। সহ্য করত লোকে। ভয় পেত, ভাবত শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী আর ধূর্ত আর কেউ নেই। আল্লাহ্ নিজেই তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না আর মানুষ তো কোন ছার।

শয়তানের তো তাই চাই, 'বশমানা উটের ছাল ছাড়ান সহজ।' যুবাবৃদ্ধ, পথচারী-অশ্বারোহী সবাইকে জ্বালিয়ে মারে সে খুশীমত। কিন্তু তারও দুঃখের দিন এল।

কে তাকে জব্দ করল ? শোন তাহলে।

স্তেপে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শয়তান দেখে ছোট্ট নদীটার খাড়া পাড়ের ওপর ঘুমিয়ে আছে এক মাকুন্দ লোক। গায়ে পোশাক আছে, কিন্তু পায়ে জুতো নেই, হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে সে। দেখে মনে হতে পারত লোকটি মরে গেছে যদি না তার নাকডাকার চোটে নদীতীরে ঝোপঝাড়গুলো নুয়ে নুয়ে পড়ত যেমন হয় ঝড়ের প্রকোপে।

'বেঁচে আছে যখন,' হাতে হাত রগড়ে ভাবল শয়তান, 'এখনি মরবে।'

পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল ঘুমন্ত লোকটির কাছে, এক ধাক্কায় ফেলে দিল খাড়া পাড় থেকে। কিন্তু দুটি শক্ত হাত ফাঁসের চেয়ে শক্ত হয়ে চেপে ধরল শয়তানের গলা, লোকটির সঙ্গে সেও গিয়ে পড়ল জলে।

'ছেড়ে দে,' কাকুতি মিনতি করতে লাগল শয়তান, 'নাহলে দু'জনেই মরব।'

'তুই আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাস যদি তবেই ছাড়ব তোকে,' বলল লোকটি।

অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে হুটোপুটি করল তারা। শেষে শয়তান বুঝল যে ঐ শক্ত হাতের বাঁধন থেকে ছাড়া পাবে না সে। লোকটির কথা শুনতে হল তাকে: মাকুন্দকে তীরে তুলে নিয়ে এল সে।

বসে খানিক বিশ্রাম নিল তারা। গায়ের জল শুকাল খানিক। শয়তান বলল:

'এবারে তুই জিতে গেলি চালাকিতে। আর কখনও জিততে হবে না তোকে। যদি চাস আমরা দু'জনে ঘুরে বেড়াব পথে পথে আর বুদ্ধির পরীক্ষা করব ?'

'রাজী,' বলে আলদার।

শয়তান আশা করে নি এমন উত্তর:

'ধূর্তামিতে তুই আমাকে হারাবার আশা করছিস নাকি? চিনতে পারলি না নাকি আমাকে? আমি শয়তান। আর তুই কে?'

মাকুন্দ আলদার শয়তানকে লক্ষ্য করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গান ধরল:

চালাক তুই শয়তান তুলনা তার কিসে
আর আমি এক মানুষ অতি সাধারণ
না বাই, না খান, না সুলতান, না শয়তান—
নাম আমার আলদার কোসে।

চলেছে শয়তান আর আলদার কোসে স্তেপের পর স্তেপ পেরিয়ে। ছটা উপত্যকা, ছটা পাহাড় পার হল, ছটা কুয়ার জল খেল প্রাণ ভরে। সপ্তম কুয়ার কাছে পথে তারা দেখতে পেল পড়ে আছে একটা টাকার থলি।

শয়তান বলে, 'আমি পেয়েছি।'

আলদার বলে, 'না, আমি পেয়েছি।'

আরম্ভ হল বচসা। শয়তান বলল:

'ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সেই নেবে এটা।'

'ঠিক আছে,' রাজী হয় আলদার।

মনে মনে খুব খুশী শয়তান, মুখে বলে: 'আমার জন্ম যখন হয় পৃথিবীর বয়স তখন সাতবছর।'

আলদার কোসে হাত জোড় করে কেঁদে উঠল হাউহাউ করে: 'হা কপাল!'

শয়তান জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছিস কেন? কি হল?'

'ওরে শয়তান, তোর কথায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমার বড় ছেলের কথা মনে পড়ে গেল। মারা গেছে সে। তোরই বয়সী ছিল সে। একই সময়ে তোমাদের জন্ম, দেখছি।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই আলদার কোসে টাকার থলিটা ঢুকিয়ে দেয় জামার ভিতর।

শয়তানের কেবল চোখ পিটপিট করতে থাকে। যে ভাবেই বিচার কর না কেন আলদার কোসেরই পাওয়া উচিত টাকার থলিটা, কারণ ছেলে বাবার চেয়ে বড় এমন তো কখনও দেখা যায় নি।

* * *

আলদার কোসে আর শয়তান চলেছে তো চলেছেই। প্রচণ্ড গরম, দূরের পথ যেতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে বিরক্তি ধরে গেল আলদারের। ফন্দী আঁটতে লাগল, 'কেমন করে শয়তানের পিঠে চড়ে যাওয়া যায়? ঝাঁকড়াচুলোকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে দেখা যাক।' বলে:

'এই শয়তান, বিরক্তিকর পথটাকে কমাবার চেষ্টা করলে হয় না?'

বুঝল না শয়তান।

'বোকার মত কথা বোলো না, কি করে কমাবে?'

'খুবই সহজে, তুই গান জানিস?'

'জানি।'

'তাহলে আমরা পথ চলতে চলতে গানের লড়াই চালাব। প্রথমে আমি, তারপর তুই। যার গান বেশী লম্বা হবে সেই জিতবে।'

শয়তানের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ঠিক, আলদার কোসে। গান গাইলে যে কোন পথই কমিয়ে ফেলা যায়। আরম্ভ কর। কিন্তু আগে থেকেই তৈরী থেক হারার জন্য। মানুষ গান গেয়ে শয়তানকে হারাতে পারবে না।'

'হারার ভয় আমার নেই,' বলল আলদার কোসে, 'কিন্তু আমি চলতে চলতে গাইতে পারি না। এক কাজ করা যাক: যতক্ষণ আমি গাইব তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, তারপর আমার গান শেষ হবে, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?'

'রাজী।'

এক লাফে আলদার শয়তানের ঘাড়ে উঠে আরাম করে বসল তারপর গান ধরল:

'গোই-গোই-গোই-গোই-গোই-গোই।..'

সময় যায়, সূর্য মাথার ওপর উঠেছে, শয়তান ছুটেই চলেছে, আলধার কোসের গান কিন্তু আর শেষ হয় না।

'গোই-গোই-গোই-গোই।..'

আর পারল না শয়তান।

'তোর গোই-গোই শাঁগাঁগারি শেষ হবে নাকি, আলদার কোসে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

আলদার বলল:

'চল্, চল শয়তান, আলসেমি করিস না। আমার গান অনেক লম্বা। গোই-গোই তো কেবল শুরু, এর পরে আছে দোই-দোই...'

বলে আরও চীৎকার করে সুর ধরল:

'দোই-দোই-দোই-দোই-দোই।..'

এইভাবে শয়তানের পিঠ থেকে না নেমেই স্তেপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পেঁাছে গেল আলদার।

* * *

স্তেপের প্রান্তে এক ক্ষেতে তারা দেখে একটা লাঙল পড়ে আছে। আলদার কোসে শয়তানকে বলল:

'আয় পরখ করে দেখা যাক, কে বেশী শক্তিমান, তুই না আমি?'

'কেমন করে ?'

'এই যে দেখছিস লাঙলটা, এটাকে তুই টানবি সামনের দিকে আর আমি পিছন দিকে, যে আগে ক্লান্ত হয়ে পড়বে সেই হেরে গেল।'

শয়তানকে জুতে দিল আলদার লাঙলের সঙ্গে, লাঙল টেনে টেনে হয়রান হয়ে পড়ল শয়তান, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লোমশ হাত দিয়ে ঘাম মুছতে থাকে, এদিকে আলদার কোসে চলেছে লাঙলের পিছন পিছন হাতলের ওপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে মইটা। ভাল, মন্দ যেমনিভাবেই হোক শয়তানের সাহায্যে আলদার জমিতে লাঙল দিল।

শেষে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল শয়তান, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, নিঃশ্বাস প্রায় পড়ছেই না।

লাঙলটা তার পিঠ থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে হাসল আলদার:

'কেমন তুমি শক্তিশালী তা বোঝা গেল, আমি কিন্তু একেবারেই ক্লান্ত হই নি। আরও দশটা শয়তানের সঙ্গেও যুঝতে পারি।'

লাঙল দেওয়া জমিটাতে তারা গমের বীজ পুঁতল। যখন পাক ধরল গমের শীষে তখন তারা ঝাড়াই-মাড়াই করল। একদিকে গাদা করল আলদার গমের দানা আর অন্যদিকে স্তূপীকৃত করে রাখল খড়।

বলল:

'এবার, শয়তান, বেছে নে কোন গাদাটা নিবি বড়টা না ছোটটা ?'

'বড়টা ! বড়টা !' খড়ের গাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল শয়তান।

'ঠিক আছে, বড়টাই নে।'

গম বিক্রী করে আলদার জামাকাপড়, জুতো কিনল নিজের জন্য আর শয়তান খড়ের গাদা নিয়ে কি করবে বুঝতে পারল না।

* * *

আলদার কোসের ওপর রেগে গেল শয়তান।

'তুই ঠকিয়েছিস আমায়। লড়াই করতে চাই তোর সঙ্গে,' বলল সে।

'মারপিট করতে চাস ঠিক আছে,' বলল আলদার, 'কিন্তু এই খোলা জায়গায় মারপিট করা যাবে না, কেউ দেখলে পরে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।'

মাটিতে একটা ফাঁকা গর্তের মধ্যে গিয়ে ঢুকল তারা। রাতে ঘুমাল সেখানেই। সকালবেলায় আলদার বলল:

'কি দিয়ে লড়াই করব ? আছে তো কেবল এই চাবুকটা আর এই লম্বা লাঠিটা। যেটাতে তোর বেশী সুবিধে হয় নে।'

শয়তান লাঠিটা নিল, ভাবল:

'আচ্ছা বোকা দেখছি এই আলদারটা। এবার আমি ওর পাঁজরা ভেঙে দেব। আমার হাতে যতক্ষণ এটা আছে চাবুক দিয়ে ও কি আমার নাগাল পাবে?'

আরম্ভ হল লড়াই। শয়তান লাঠিটা ঘুরিয়ে খুব কষে আঘাত করবে ভাবল কিন্তু লম্বা লাঠিটা দেয়ালে গেঁথে গেল — কিছুতেই নড়ান যায় না সেটাকে। এদিকে আলদার শয়তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার লোমশ পিঠে মেরেই চলল সর্বশক্তি দিয়ে। লাঠি ফেলে শয়তান গর্তময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

'না, না, তা হবে না!' চীৎকার করতে লাগল সে, 'আবার ঠকিয়েছিস তুই আমায়। এবার আমায় চাবুকটা দে, চল এবার খোলা জায়গায় গিয়ে লড়াই করি।..'

বেরোল তারা গর্ত ছেড়ে খোলা যায়গায়। শয়তানের হাতে এবার চাবুক আর আলদারের হাতে লাঠিটা। আরম্ভ হল লড়াই। শয়তান চাবুক চালাবার আগেই আলদার তার পাঁজরায় এমন আঘাত করল যে পা দুর্বল হয়ে গেল শয়তানের...

* * *

এরপর শয়তান আর কখনও আলদারের সঙ্গে ঝগড়া বা মারপিট বাঁধায় নি। সে শান্ত, বাধ্য হয়ে গেছে, সঙ্গীকে ছেড়ে দেয় সবকিছু, সবকিছুতে তার সঙ্গে সায় দেয়। কিন্তু দিনরাত মনে মনে তার বিরুদ্ধে ফন্দী আঁটছে। শেষে ঠিক করল আলদার যেন তার চরম বন্ধু এমনি ভান করে তার সর্বনাশ করবে।

বলল:

'আলদার, তোর ফন্দীফিকির আর ঠাট্টাতামাসায় কম জ্বলি নি আমি, কিন্তু তোর ওপর কোন রাগ পুষে রাখি নি। তোকে ভালবাসি রে ভাই, তোর সাহস, বুদ্ধি আর হাসিখুশী স্বভাবের জন্য। তোর জন্য সবকিছু করতে রাজী আছি, বিশ্বাস কর। চিরকালের জন্য বন্ধু হয়ে থাকব আমরা। আমাকে বন্ধু মনে করে বল দেখি পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই নাকি যা তোকে কাবু করতে পারে। নাকি চিরকাল জীবনধারণ করবি তুই?'

আলদার বলল:

'কোনো মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে না। মরব আমিও। কিসে মরণ আমার তা জানি আমি কিন্তু তোকে বলতে ভয় হয়, সে হল গোপন কথা।'

কান খাড়া হয়ে উঠল শয়তানের।

'আলদার, প্রাণের বন্ধু আমার, তুই আমাকেও বিশ্বাস করিস না। তুই আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশী আপন। যখন জানব কিসে তোর বিপদ চোখের মনির মত আগলে রাখব তোকে। বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে ও কথা গোপন রাখার দরকার নেই।'

আলদার কোসে ভেবে ভেবে শেষে বলল:

'যাক্, যা হয় হবে, তোকে বলব সবকিছু,' ফিসফিস করে বলল, 'তীর তরবারি জন্তুর দাঁত সাপের কামড় বা শয়তানের ফন্দীফিকির বা আল্লাহ্‌র ক্রোধ কোন কিছুতেই ভয় নেই

আমার, আমার ভয় টাটকা তৈরী বাউরসাকে। যত তেলতেলে তত ভয়ঙ্কর। তাতেই আমার মৃত্যু...'

আলদারের গোপন কথা জানতে পেরে শয়তান এত খুশী হল যে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না সে আনন্দ: চলেছে না তো যেন নাচছে।

'এবার তোকে নামাব ঘাড় থেকে বন্ধু আলদার,' ভাবে সে।

রাতের বেলায় যখন আলদার ঘুমিয়ে পড়ল শয়তান গিয়ে ঢুকল এক গ্রামে, তাঁবুগুলোতে চুরি করে করে এক বস্তা বাউরসাক নিয়ে ফিরে এল ভোর হবার ঠিক আগেই। আলদার তখন প্রায় নিভন্ত আগুনের কাছে ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছে নিরীহভাবে। শয়তান তাকে এক লাথি মেরে চীৎকার করে বলল:

'তোর শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে রে মাকুন্দ ভাঁড়। এবার আমি সবকিছুর প্রতিশোধ নেব। দেখছিস এই বস্তাটা? এতেই আছে তোর মরণ।'

আলদার কাঁপতে লাগল, মাথায় হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকাল ঝোপের আড়ালে:

'শয়তান, ছেড়ে দে, মারিস না আমায়।'

'কাঁদবার দরকার নেই, ছাড়ব না তোকে আমি।' বলে শয়তান আলদারের দিকে একটা একটা করে বাউরসাক ছুঁড়তে লাগল:

'এই নে। নে। নে।'

আলদার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বাউরসাক লুফতে থাকে আর মুখে পুরতে থাকে... সবকিছুতেই সে চটপটে আর খাওয়ার ব্যাপারে তো বটেই।

শয়তানের বস্তাটা খালি হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ঝোপের আড়ালে গেল কি হল শত্রুর দেখতে। দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ, ঝোপের নীচে ঘাসের ওপর আরাম করে বসে আলদার শেষ বাউরসাকটা মুখে পুরছে, মুখচোখ সোনার মত চকচক করছে খুশীতে না তেলেচর্বিতে কে জানে।

'ধন্যবাদ শয়তান, দারুণ খাইয়েছিস।' বলল আলদার জুতোয় হাত ঘষতে ঘষতে। 'বহুদিন এমন খাওয়া খাই নি।'

হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে সে।

নিষ্ফল রাগে কেঁদে ফেলল শয়তান, পালিয়ে গেল সে আলদারের কাছ থেকে, যত জোরে সে দৌড়য় ততই জোরে হাসতে থাকে আলদার।

সেই থেকেই স্তেপে শয়তান আর রইল না। বুঝল যে মানুষ তার বুদ্ধিতে সবার চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর সাহসী। এখন কেবল গল্পেই শোনা যায় শয়তানের কথা।

কেমন করে আলদার কোসে খেতমজুরদের মাংস খাওয়াল

একবার আলদার কোসেকে খেতমজুরের কাজ করতে হয় এক বাইয়ের কাছে।

'কেমন করে দিন কাটে তোমাদের?' অন্য খেতমজুরদের জিজ্ঞাসা করল সে।

'খুবই কষ্টে,' বলল তারা, 'মাংসর গন্ধই ভুলে গেছি একেবারে।'

'মন খারাপ কোরো না, বাইয়ের ঘাড় ভেঙে মাংস খাওয়াব তোমাদের।'

খেতমজুররা কেবল মাথা নাড়িয়ে বলল:

'আলদার, কথায় বলে, 'যে ঘরে কখনও অতিথির পা পড়ে না সেখানে কিছু চাইতে যেও না।'

'চাইব না আমি, ও নিজেই দেবে।'

'তোর দুষ্ট মাথায় আবার কি ফন্দী খেলেছে?'

'হাওয়া না বইলে গাছও নড়ে না,' ফাঁকি দেওয়া উত্তর দিল আলদার।

সেই দিনই বাইয়ের পালের একটা ভেড়া গর্তে পড়ে পা ভাঙল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বাই, 'ওরে আলদার কোসে, মরছে যে ভেড়াটা। কি করি?'

'তাড়াতাড়ি কেটে ফেল ওটাকে!' বলে আলদার।

'একটা ভেড়া কমে যাবে যে...' নাকেকান্না কাঁদে বাই।

'কাটতে যদি মায়া লাগে তো মরুক অমনি,' নির্বিকার উত্তর আলদারের।

করার কিছু নেই, কাটল বাই ভেড়াটাকে, তারপর আদেশ দিল আলদারকে:

'এই মাংসটা বাজারে বেচ গিয়ে, বেশ ভালো দামে বেচবি।'

মাংসটা নিয়ে বাজারে গেল আলদার। বাজারে ঘুরে ঘুরে হাঁকতে লাগল:

'শোন সবাই! দশ টাকায় বেচব মরা ভেড়া! কে কিনবে!'

হাসতে থাকে সবাই:

'এবার আর কাউকে ঠকাতে পারবি না তুই, আলদার কোসে। মরা ভেড়া দরকার নেই আমাদের। যেখান থেকে নিয়ে এসেছিস ওটাকে সেখানেই ফিরত নিয়ে যা।'

এমন কথাই তো শুনতে চায় আলদার।

বাইয়ের কাছে ফিরে গিয়ে জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে বলল:

'বাই, আমাদের নিজেদেরই খেয়ে ফেলতে হবে মাংসটা। কেউ কিনতে চায় না। শুধু শুধু কষ্ট করলাম। বলে, চাই না...'

তার কথা বিশ্বাস হল না বাইয়ের, 'চাই না কি! এমন চমৎকার, চর্বিয়াল ভেড়া! তুই বাজে কথা বলছিস, আলদার কোসে! কাল তোর সঙ্গে আমিও যাব বিক্রী করতে।'

ভোরবেলায় তারা দু'জনে বাজারে গেল। বাই হাঁকে:

'এই ভেড়া কেন! কার চাই ভেড়া?'

আলদার কোসেও তান ধরে:

'কালকের ভেড়া কেন! এ সেই ভেড়াটা! দশ টাকায় নাও কালকের ভেড়াটা!'

এবারে আর চুপ করে থাকল না লোকে:

'এই অকর্মার ধাড়ীরা দূর হয়ে যা এখান থেকে! নিজেদের ভেড়া নিজেরাই খা গিয়ে!'

বাজার থেকে ভেগে পড়তে হল তাদের।

'কি করব এবার?' জিজ্ঞাসা করল আলদার, 'নিজেরা খাব না গর্তে ফেলে দেব নেকড়েদের ভোগে লাগার জন্য।'

'ভাবতে দে একটু, ভাবতে দে,' বলল বাই শোকান্বিত মুখে।

নিজের তাঁবুতে সমস্ত মজুর-রাখালদের ডেকে সে এমনি বক্তৃতা দিল:

'শুনলাম নাকি লোকে বলছে আমি বদমাস, লোভী। যারা এসব বলছে তাদের শাস্তি দিন আল্লাহ্। আজ তোমরা জানতে পারবে তোমাদের মনিব কেমন। তোমাদের প্রাণভরে খাওয়াতে চাই। সবচেয়ে ভাল ভেড়াটা দিচ্ছি তোমাদের জন্য। আলদার কোসে রাঁধ এই মাংসটা। কেবল একটা শর্ত: কড়াইতে যেটা শক্ত পড়ে থাকবে — সেটা আমার, আর বাকীটা তোমাদের।'

চোখ চাওয়াচায়ি করল মজুররা, কিন্তু কিছু বলল না উত্তরে। ঠিক আছে: মাংসর আশা যদি নাই থাকে তো ঝোলই বা মন্দ কি।

এদিকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে আলদার: আগুন জ্বালিয়েছে, কড়ায় জল ফুটছে, মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে আলদার মাংস সিদ্ধ করতে থাকে যে চিন্তা হল বাইয়ের:

'কখন হবে তৈরী, আলদার?'

'এখুনি, এখুনি, আর একটু বস, বাই!'

যখন মাংস এমন সিদ্ধ হল যে হাড় থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন আলদার মনিবকে বলল:

'বল তো আবার, বাই, কড়াইতে কোনটা তোমার?'

'শক্তটা, শক্তটা!' তাড়াহুড়ো করে বলে বাই।

'এই যে সব শক্তগুলো,' বলে আলদার মাংসহীন হাড়গুলো সাজিয়ে দেয়। 'আর বাকীটা আমাদের।'

খেতমজুররা কড়াইয়ের চারদিকে বসে খেতে আরম্ভ করে দিল। রাগে মুখ কালি হয়ে গেছে বাইয়ের, আর মজুররা খাচ্ছে খুশীমনে। খেয়েদেয়ে একসুরে তারা বলল, 'ধন্যবাদ, আলদার!' •

কেমন করে বাইয়ের পরিচয় হল আলদার কোসের সঙ্গে

এক অহংকারী বাই গ্রামের লোকেদের সামনে একদিন খুব বড়াই করছে:

'গোটা স্তেপেই শুনি: আলদার কোসে! আলদার কোসে!.. তার বুদ্ধি, চালাকির গল্প আমি বিশ্বাস করি না। ফক্কড়টাকে একবার দেখতে পেলে হয়। আমি নিজেই ওকে এক মুহূর্তে বোকা বানাতাম।'

যাদের বয়স কম তারা হেসে উঠল একথা শুনে আর বুড়োরা মাথা দোলাল।

'বড়াই কোরো না বাই! এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে বোকা বানাতে পারে নি।'

'আমি বোকা বানাব!' উত্তেজিত হয়ে উঠল বাই, 'প্রতিজ্ঞা করছি যদি তাকে বোকা বানাতে না পারি তো সারাগ্রামের লোকের জন্য ভোজসভার আয়োজন করব। কেবল তার দেখা পেলে হয় একবার!..'

একবার কাজে কি অকাজে কে জানে বাই উটে চড়ে স্তেপে গেল। দেখে পথের থেকে একটু দূরে একটা লোক ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে।

'আরে ভাই, কি হারিয়েছ? জিজ্ঞাসা করল বাই।

লোকটি থেমে গিয়ে চিন্তিতভাবে বলল:

'হারাই নি কিছুই, তবুও খুঁজছি।'

'কি খুঁজছ?'

'দুনিয়ার শুরু কোথায় খুঁজছি। এইখানেই কোথায় যেন শুরু হয়েছে জানি খুব ভাল করেই, খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। উঁচু থেকে স্তেপের দিকে তাকিয়ে দেখলে হয়ত খুঁজে পেতাম। কিন্তু ধারেকাছে কোন ঢিপি বা টিলা বলতে কিছু নেই। তাহলেও আমি খুঁজে পাব ঠিকই। দুনিয়ার শুরু খুঁজে পাবে যে সে পাবে প্রচুর খ্যাতি, সম্মান।'

অবাক হয়ে শুনল বাই লোকটির কথা তারপর জিজ্ঞাসা করল:

'বল দেখি উটের ওপর থেকে তুমি পৃথিবীর শুরু দেখতে পাবে?'

'উটের ওপর থেকে দেখতে পাব না আবার। নিশ্চয়ই দেখতে পাব। উট কেন, একটা বিশ্রী গাধাও নেই আমার।'

নড়েচড়ে বসল বাই উটের পিঠে:

'আমার উটের পিঠে ওঠ,' প্রস্তাব করল সে, 'কিন্তু একটা শর্ত: সব জায়গায় বলবে যে আমরা দু'জনে মিলে দুনিয়ার শুরু খুঁজে পেয়েছি। খ্যাতি, সম্মান আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব। কি, রাজী?'

'ঠিক আছে, রাজী।'

উটের পিঠের থেকে নেমে গেল বাই, বসাল অপরিচিত লোকটিকে, তারপর উপর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েই রইল অপেক্ষায় কি বলে লোকটি।

'কি হল, দেখতে পাচ্ছ দুনিয়ার শুরু?

'নাঃ,' বলল অপরিচিত লোকটি ভাল করে বসে আর লাগামটা হাতে তুলে নিয়ে, 'দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি কেবল তুমি, বাই, একেবারেই বোকা। কিন্তু দুঃখ কোরো না তুমি, আজ থেকে অহঙ্কার করে বলতে পারবে কেমন করে তুমি আলদার কোসের সঙ্গে দুনিয়ার শুরু খুঁজেছ।'

'আলদার কোসে। তুই তাহলে সেই আলদার কোসে।' হাঁউমাউ করে সে ছুটে গেল আলদারের দিকে, 'দিয়ে দে আমার উট, ডাকাত।'

'দেব, যদি নাগাল ধরতে পার।' বলে আলদার জোর ছুটিয়ে দিল উটটাকে, বাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

সন্ধ্যার মুখে কেবলমাত্র কোনরকমে দেহটাকে টানতে টানতে সে এসে পেঁছিল গ্রামে। তার স্ত্রী তাকে দেখে বলল:

'এ কি অবস্থা? উটটা কোথায়?'

'নেই উট। আলদার কোসে নিয়ে নিয়েছে,' ক্ষুব্ধস্বরে বলল বাই।

বাইয়ের স্ত্রী কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল, ছুটে এল লোকজন। জানল সবাই কি ব্যাপার।

'কি করে নিল? জোর দেখিয়ে নাকি চালাকি খাটিয়ে?'

'চালাকি করে,' স্বীকার করল বাই।

হাসতে লাগল সবাই হা-হা করে।

'ঠিক হয়েছে, যেমন বড়াই করা। এবার ভোজের আয়োজন কর। তুমি বাজী হেরেছ।'

কি আর করবে বাই? চোখের জল চেপে ভোজসভার আয়োজন করল।

ভোজসভা যখন খুব জমে উঠেছে তখন উটে চেপে গ্রামে এসে হাজির আলদার কোসে।

'নাও, বাই, তোমার উট।' হাসে, 'এবার থেকে গরীব লোকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই কোরো না আর অন্যের খ্যাতির দিকে নজর দিও না।'

বাই উট ফিরত পেয়ে খুশী আর লোকে আলদারকে দেখে খুশী। রাতভোর হওয়া পর্যন্ত চলল ভোজসভা।

মোল্লাকে কেমন শিক্ষা দিল আলদার কোসে

ধার্মিক লোকেদের আনা ধনে মোল্লার সিন্দুকগুলি বোঝাই হয়ে গেছে, তবুও মন ভরে না মোল্লার। তার কাছ থেকে 'দে' কথাটা শোনে নি এমন লোক পাওয়া যাবে না কিন্তু তার কাছ থেকে 'নে' শুনেছে এমন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি কোন দীনদুঃখী তার কাছে সাহায্য চায় তো সবসময় সে এক কথাই বলে:

'বাছা, মন দিয়ে প্রার্থনা কর খোদার কাছে। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, ধর্মে মতি যার আছে তার প্রতি তিনি করুণাময়। যদি তুই কোন পাপ না করে থাকিস তো তিনি তোর প্রতি উদার হবেন।'

মোল্লার লোভ আর ভণ্ডামির কথা জানতে পারল আলদার কোসে, ভাবল শিক্ষা দেবে তাকে।

একদিন মোল্লা তার গাধায় চড়ে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাচ্ছে। শোনে: সামনে রাস্তায় কে যেন কাঁদছে মনের দুঃখে। কি ব্যাপার? কেউ মারা গেছে নাকি? গাধাটাকে ছোটাল মোল্লা। কথায় বলে, 'গরু মোটা হয় বেশী খাওয়া পেলে আর মোল্লা ঘন ঘন লোক মরলে।'

পথের পাশে পুরানো একটা কূয়ার কাছে পেঁাছে মোল্লা দেখে: একজন লোক বসে হাঁটুতে মাথা গুঁজে জোরে জোরে কাঁদছে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করে মোল্লা।

'হায়! হায়!' হাহুতাশ থামায় না লোকটি।

'কি হয়েছে? কেউ মরেছে নাকি?'

'তার চেয়েও খারাপ!'

'আরও খারাপ কি হতে পারে?'

'বদমাস আলদার কোসে নিঃস্ব করে দিয়েছে আমাকে।'

'আলদার কোসে? সে বদমাসটার পক্ষে সব কাজই সম্ভব। তাকে দেখি নি আমি, কিন্তু লোকের মুখে তার কথা শুনেছি, কি করেছে সে?'

'এই কূয়ার কাছে আমাদের দেখা হয়। বসলাম দু'জনে, গল্পসল্প করলাম একটু। আলদার কোসে আমার কাছে এক টিপ খৈনী চাইল। আমি তার দিকে এগিয়ে দিলাম নিজের পুরান থলিটা আর বদমাস সেটা নিয়ে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিল...'

হুঃ আওয়াজ বেরিয়ে এল মোল্লার মুখ দিয়ে।

'একটা পুরান থলি, তাতে খৈনি থাকলেই বা তার জন্য এমনি কান্না জুড়েছিস!'

'থলিতে তামাকের নীচে ছিল তিনটি মোহর—আমার যথাসর্বস্ব।' বলে লোকটি আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

মোল্লা নামল গাধা থেকে:

'তুই বলছিস থলিতে তিনটি মোহর ছিল? তাহলে তুই নিজেই সেগুলি তুলতে নামছিস না কেন রে, আহাম্মক? কূয়াটা তো বেশী গভীর নয়।'

'কি করে নামব, দড়ি নেই তো আমার।'

চোখ চকচক করে উঠল মোল্লার। বলল:

'শোন, আমি তোকে দেব এই গাধার গলার দড়িটা, কিন্তু তোকে তার বদলে আমাকে একটা মোহর দিতে হবে।'

'আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, সম্মানিত মোল্লা। মোহর আপনাকে দিতে তো আপত্তি নেই আমার, কিন্তু দড়িতেও কোন কাজ হবে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি ছোট বয়স থেকেই ভীষণ ভয় পাই ঠাণ্ডা জলকে, কূয়ার জলে ডুব দেওয়ার চেয়ে মরাও সহজ আমার পক্ষে...'

'কি মূর্খ!' ভাবল মোল্লা, 'অর্থের জন্য আমি কূয়া কেন নরকে নামতেও রাজী আছি...' মুখে বলল:

'তাহলে, আমিই তোকে এ বিপদের সময়ে সাহায্য করব, তোর মোহরগুলো তুলে আনব। কেবল পরিশ্রম আর ঝুঁকি নেওয়ার বিনিময়ে তুই আমায় দুটি মোহর দিবি।'

'দেব। বিনাবাক্যব্যয়ে দেব। এমনিতেও কারুর কাজে লাগবে না কূয়ার নীচে পড়ে থাকলে। তাই হবে: দুটো মোহর আপনার, একটা আমার।'

মুহূর্তে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে ভুঁড়িতে চাপ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মোল্লা কূয়াটাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিল।

'দড়িটা শক্ত করে ধরিস,' বলল সে, 'আর যখন আমি থলিটা পাব, তখন টানবি সর্বশক্তি দিয়ে।'

দড়িটা শক্ত করে ধরে মোল্লা হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে গেল কূয়ার মধ্যে, ঝুলে রইল জলের ওপর।

'নামা, নামা আমাকে একটু একটু করে, দেখিস, সাবধানে!' নীচে থেকে শোনা গেল, 'কি রে দেরী করছিস কেন?'

'তাড়াহুড়োর কি আছে ?' ওপর থেকে শুনতে পাওয়া গেল। 'সবুরে মেওয়া ফলে, দেরী করছি এই কারণে যে ভাবনায় পড়েছি। ভাবছি আপনার কাছে এখনি স্বীকার করব নাকি যে কূয়ায় কোন মোহরই নেই।'

'কি ?!' চীৎকার করে উঠল মোল্লা, 'কূয়ায় মোহর নেই ? ঠগ। তার মানে, তুই মিথ্যা বলেছিস যে আলদার কোসে তোর সঙ্গে বিশ্রী ঠাট্টা করেছে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিথ্যা বলেছি, স্বীকার করেছি, হজরৎ। আলদার কোসে সত্যিই ঠাট্টা করেছে কিন্তু আমার সঙ্গে না আপনার সঙ্গে। আলদার কোসে আমি নিজেই।'

'হা কপাল।' হিসহিস করল মোল্লা আর দড়ি ফস্কে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কূয়াটা সত্যিই ছিল অগভীর। কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে মোল্লা গালাগালি, অভিশাপ আর হুমকি দিতে লাগল, কিন্তু একটু পরেই বুঝল তাতে আলদারের মন গলাতে পারবে না: আলদার কূয়ার ওপর ঝুকে পড়ে হা-হা করে হেসেই চলেছে। তখন মোল্লা অন্য পথ ধরল:

'আলদার বাপ আমার, তোর ওপর আর রাগ নেই আমার এই তামাশা করার জন্য। তুইও রাগ রাখিস না আমার ওপর। হয়েছে যথেষ্ট তামাশা করা। এবার চটপট ফেল দেখি দড়িটা, সাহায্য কর আমায়, কূয়া থেকে উঠে আসতে।'

কিন্তু আলদার মোল্লার গলা নকল করে বলল:

'হজরৎ, মন দিয়ে প্রার্থনা কর খোদার কাছে। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, ধর্মে মতি যার আছে তার প্রতি তিনি করুণাময়। যদি তুমি কোন পাপ না করে থাক তো তিনি তোমার প্রতি উদার হবেন।'

এরপর আলদার মোল্লার গাধাটায় চড়ে চলে গেল আর তার আগে ভুলল না মোল্লার পোশাকগুলো ভাল করে লুকিয়ে রাখতে। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল মোল্লা তারপর সেখান দিয়ে যেতে থাকা সদাগররা তাকে তুলে আনে কূয়া থেকে।
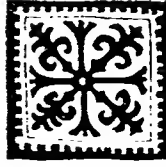
কেমন করে আলদার কোসে বিধবাকে সাহায্য করল

এক গরীব বিধবার ছেলে কঠিন অসুখে পড়ল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তার, ছটফট করছে আর বকছে জ্বরের ঘোরে:

'মামণি, এক ঢোক কুমিস দাও!'

কাঁদতে থাকে বিধবা: কোন কালেই তাদের কুটীরে কুমিস দেখে নি তারা। ভাঙা একটা পেয়ালা হাতে নিয়ে চলল সে বাইয়ের কাছে:

'দয়া কর, বাই, অন্ততঃ আধপেয়ালা কুমিস দিতে বল আমার মরণাপন্ন ছেলের জন্য। তোমার ঘোড়ার পাল বাঁচাতে গিয়ে স্তেপে তুষারঝড়ে প্রাণ দেয় আমার স্বামী, তোমার জন্য নিজের জীবন দিতেও মায়া করে নি, তুমিও আমাকে খানিক কুমিস দিয়ে উপকার কর...'

বাই ব্যঙ্গ করতে লাগল তাকে:

'কুমিস চাই? আর লাঠির বাড়ি চাস না? কি অবস্থায় পেঁৗছেছি: ভিখারীগুলি সম্মানিত লোকের বাড়ীতে এসে বিরক্ত করতে ভয় না। ভাগ্ এখান থেকে, বেহায়া ভিখারী!' ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিল তাকে।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বিধবা চলল ঘরে ফিরে। মাঝপথে হঠাৎ শোনে পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভয় পেয়ে পিছন ফিরল সে, দেখে: আলদার কোসে তার ন্যাড়া ঘোড়ায় চড়ে চলেছে।

'কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে? কাঁদছ কেন?' জিজ্ঞাসা করল সে।

বিধবা নিজের দুঃখের কথা খুলে বলল তাকে।

'মন খারাপ কোরো না, আমি তোমার সাহায্য করব,' বলল আলদার, 'আমার কথা হল — বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়।'

আর কিছু না বলে বাইয়ের তাঁবুর দিকে চলল আলদার।

বাই সে সময় বাইরে বেরিয়েছে খোলা হাওয়ায় খানিক ঘুরবার জন্য আর সেই সঙ্গে নিজের ঘোড়ার পালের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োবার জন্যও।

আলদার তার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রথামত অভিবাদন জানিয়ে সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করল বাই জানে নাকি এই অঞ্চলে কে ঘোড়া কিনতে চায়।

'তুই ঘোড়া বিক্রী করবি নাকি?' কৌতুহলী হয়ে উঠল বাই।

'বেচব না চাচা, — বদল করব।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল বাই: বদল করে গরীব লোকদের বোকা বানানোর মত আনন্দ আর কিছুতেই পায় না সে। ভেড়ার ছাল পাবার জন্য সে নিজের বাবাকে দিয়ে দিতেও রাজী।

'এই বেতো ঘোড়াটার বদলে কি চাস?' বলে বাই আলদারের ঘোড়াটাকে টেপাটেপি আরম্ভ করে দিল।

'কমই বলছি। পাঁচটা ভেড়া দেবে?'

'কটা? কটা?' নিজের কানকে বিশ্বাস হল না বাইয়ের।

'পাঁচটা ভেড়া। পাঁচটা বেশী হল — তিনটের বদলে দেব।'

তিনটে ভেড়ার বদলে ঘোড়া! ও কি দারুণ লাভ!

'রাজী!' ব্যস্ত হয়ে বলল বাই, 'নাম ঘোড়া থেকে, ভেড়া বেছে নে!'

আলদারের কিন্তু কোন ব্যস্ততা নেই। তাড়াহুড়ো করলে লাভ করা যায় না। ঘোড়া থেকে নামল বটে কিন্তু লাগামটা ছাড়ল না।

'ভাল কথা,' বলল সে, 'বেশ ভালই বদলাবদলি করেছি আমরা। আরো বদল করতে চাও নাকি, বাই? ঘোড়াটা আর তিনটে ভেড়া দেব একটা ষাঁড়ের বদলে। তোমার দর বল।'

অবাক হল বাই, জোরে হাত ঝাঁকিয়ে বলল:

'রাজী!'

'খুব ভাল কথা যে রাজী। তুমিও খুশী, আমিও খুশী। কি আরও চালাবে নাকি? ঘোড়া, ষাঁড় আর তিনটে ভেড়া দেব দুধাল ঘুড়ীর বদলে।'

বাই উত্তেজনায় ছটফট করছে একেবারে।

'রাজী,' বলল সে হাঁফাতে, হাঁফাতে। 'আমার যদিও ক্ষতি হচ্ছে... তবুও রাজী।'

'ক্ষতি কোথায়, ভেবে দেখ বাই! বেশ ভাল করে বোকা বানিয়েছ তুমি আমায়। যাক, আমার নরম মন পেয়েছ যখন। চালাও আবার বদলাবদলি। ঘোড়া, ঘুড়ী, ষাঁড়, তিনটে ভেড়া দেব অতি সাধারণ একটা উটের বদলে।

'রাজী!' বুকটা ফেটে যেতে চাইছে বাইয়ের। 'দেব উট।'

'খুব ভাল কথা যে রাজী তুমি। কিন্তু আমি রাজী নই।'

'কেন রাজী নয়?' আঁকুপাঁকু করে উঠল বাই। 'কেন এখন উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছ কথা? কথা হল তীরের মত — ছুঁড়ে দিয়েছ আর ফেরান যাবে না।'

'রাজী নই এই কারণে যে,' বলল আলদার, 'ঠকাতে চাই না তোমায়। এই আমার স্বভাব। ঘুড়ীটা পেলেই চলবে আমার। তোমার উট তোমারই থাক, আর আমার থাক আমার ঘোড়াটা। চলবে?'

'আবার লাভ হল,' মাথা-ঘুলিয়ে-যাওয়া বাই ভাবল খুশী মনে, 'যেমন উটই হোক না কেন একটা ঘোড়ার বদলে তাকে দেওয়া যায় না...'

'চলবে! চলবে! নিয়ে যা তোর ঘোড়া!' খুশী মনে বাই তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। ওদিকে আলদার বাইয়ের ঘুড়ীর গলায় দড়ি বেঁধে সঙ্গে নিল।

'এই, যদি আবার কোন কিছু বদল করতে চাস তো আসিস,' তার পিছনে চীৎকার করে বলল বাই।

'নিশ্চয়ই আসব! অপেক্ষা কর!' ছুটতে ছুটতেই বলল আলদার।

পথে বিধবার কুটীরে গিয়ে ঢুকল আলদার।

'বাই তোমাকে এক পেয়ালা কুমিস দিতে কৃপণতা করেছে, আমি তোমাকে ওর কাছ থেকেই এনে দিলাম দুধেল ঘুড়ী। এখন তোমার নিজেরই কুমিস হবে।'

খুব খুশী হল বিধবা। ঘুড়ীটাকে দুয়ে ছেলেকে কুমিস খাওয়াল। শীঘ্রই সেরে উঠল ছেলেটি। বিধবাটি সারা জীবনেও ভোলে নি আলদার কোসেকে।

বাইও মনে রেখেছে তাকে। বদলাবদলি করার পর ঠাণ্ডা হয়ে হঠাৎ বাই বুঝতে পারে যে ঘুড়ীটা দিয়ে দিয়েছে একেবারে অমনি অমনি, কিন্তু তখন আর করার কিছু নেই: উড়ে যাওয়া পাখীর শোক করে আর লাভ কি!

•

শিগাইবাইয়ের কাছে আতিথ্যগ্রহণ

বিভিন্ন লোকের খ্যাতি ছড়ায় বিভিন্ন কারণে। কেউ বা খ্যাতিলাভ করে তার বুদ্ধির কারণে, কেউ তার অভিজাত বংশের জন্য, কেউ তার ভাল কাজের জন্য, কেউ আবার তার ঘোড়ার পালের জন্য, কেউ শক্তি-সাহসের জন্য, কেউ হয়ত আবার তার দেমাকী হাবভাবের জন্য...

তেমনি বাই শিগাইবাইয়ের খ্যাতি ছিল তার কৃপণতার জন্য। প্রতিটি ফোঁটা ঘোলের জন্য, প্রতি টুকরা হাড়ের জন্যও হাঁকুপাঁকু করত সে। সারা বছর ধরে তার পায়ে পড়লেও সে গরীব ক্ষুধার্তকে এক কণা খাবারও দেবে না। আর কাউকে কখনও নিমন্ত্রণ করার কথা কখনও সে ভাবতেও পারে না। কিপটে বুড়ো বাড়ীর ধারেকাছে কাউকে দেখলেই হাঁক পাড়ে:

'এই, কি চাই। ভাগ্ এখান থেকে।'

যাতে কেউ তার কাছে কিছু চাইতে না আসে সে জন্য শিগাইবাই তার ইয়ুরতা খাটিয়েছে লোকালয় থেকে দূরে, জনহীন এক জায়গায়। তা' ছাড়া ইয়ুরতার চারপাশে বিছিয়ে রেখেছে শুকনো নলখাগড়া। যদি কোন লোক বা তার ঘোড়া পা দেয় নলখাগড়ার ওপর তো নলখাগড়ার আওয়াজ জানিয়ে দেবে যে অনাহূত অতিথি এগিয়ে আসছে।

এমনিভাবেই জীবনধারণ করছিল শিগাইবাই। আর কেই বা ঐ কিপ্পণের ধারেকাছে আসবে, এক আলদার কোসে ছাড়া।

আলদার কোসের মাথায় এক খেয়াল চাপল শিগাইবাইয়ের কাছে দু'এক সপ্তাহ কাটান, কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারল না সে খেয়ালটাকে, বেশী চিন্তাভাবনা না করে সে তার ন্যাড়া ঘোড়াটাকে লাগাম পরিয়ে রওনা দিল পথে।

গ্রাম পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে সে, আর লোকেরা চীৎকার করে তাকে বলছে:

'কিপটের কাছে একদিনের জন্য যাচ্ছিস, এক সপ্তাহর মত খাবার নে সঙ্গে নাহলে মরে যাবি খিদেয়।'

'নদীর পারে বসে তেষ্টা মিটিয়ে নিতে পারে না কেবল নির্বোধই। আমি, তোমাদের মতে নির্বোধ নাকি ?' ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতেই বলে আলদার কোসে।

সন্ধ্যা নামছে প্রায় এমন সময় দূরে দেখা গেল শিগাইবাইয়ের ইয়ুরতা। ইয়ুরতার ছাদ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, বোধহয় রাতের খাবার রান্না হচ্ছে।

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।' মনে মনে হাসল আলদার, ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল যেখানে শিগাইবাইয়ের ঘোড়াগুলি বাঁধা ছিল সেই জায়গায়। চুপিচুপি ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে, তাকে কিছু ঘাস খেতে দিয়ে ইয়ুরতার সামনে বিছান নলখাগড়াগুলো সরিয়ে একজায়গায় জড় করতে লাগল।

সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে কিন্তু আলদার কোসের কোন তাড়াহুড়ো নেই, কথায় বলে 'বেশী জোর ঘোড়া ছোটালে পরে হেঁটে হেঁটে মরতে হবে।' একটা একটা করে নলখাগড়া সরিয়ে সরিয়ে নিঃশব্দে সে ইয়ুরতা পর্যন্ত যাবার সরু পথ তৈরী করে নিল, তারপর ইয়ুরতার কাছে গিয়ে দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগল।

তাঁবুর ভিতরে নিঃশব্দ, চুপচাপ। চুলায় কাঠ জ্বলছে আর কড়াইতে মাংস রান্না হচ্ছে। চুলার কাছে বসে আছে শিগাইবাইয়ের পরিবারের সবাই: বাই নিজে 'কাজি'* রান্না করছে, বাইয়ের স্ত্রী ময়দা মাখছে, তার ছেলের বৌ ভেড়ার মাংস রান্নায় ব্যস্ত আর মেয়ে একটা হাঁসের পালক ছাড়াচ্ছে।

আলদারের সম্বন্ধে লোকে বলে যে সে এমনি নাছোড়বান্দা যদি কোন বাড়ীর দরজায় হাত রাখে তো সে বাড়ীর সবচেয়ে ভাল জায়গা দখল করে বসবেই। ইয়ুরতার কেউ চোখের পলক ফেলারও অবকাশ পেল না আলদার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভিতরে স্তেপের হাওয়া সঙ্গে নিয়ে।

'শুভসন্ধ্যা!' অভিবাদন জানাল আলদার কোসে।

'বাজ পড়ুক তোর মাথায়!' গজগজ করে বলল বাই, আর ইঙ্গিত করল পরিবারের লোকদের।

সেই মুহূর্তে যত কিছু জিনিসপত্র তারা রান্না করছিল, সব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল আর মেয়েদের হাত ব্যস্ত দেখা গেল অন্যান্য কাজে: বাইয়ের স্ত্রী পশম তৈরী করছে, ছেলের বউ জামা সেলাই করছে, মেয়ে চিমটে দিয়ে কয়লা ঠিক করে দিচ্ছে চুলাতে, আর বাই নিজে চামড়ার লাগামটা রিপু করছে।

'দারুণ ব্যাপার!' অবাক হল আলদার। 'যদি এসব দেখে আমি হাল ছেড়ে দিই তো আমার নাম যেন মুছে যায়!' আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই চুলার কাছে গিয়ে বসল বাইয়ের গা ঘেঁষে।

'কি চাই রে, মাকুন্দ?' গোমড়ামুখে বাই জিজ্ঞাসা করল। 'হয়ত ভেবেছিস কিছু খেতে পাবি? সে আশা কোরো না, কিছু নেই আমার খেতে দেবার মত।' খাওয়াদাওয়া থেকে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, 'এসেই যখন পড়েছিস বিনা আমন্ত্রণে তখন চুপ করে বসে থেক না, কিছু বল।'

---

* ঘোড়ার মাংস দিয়ে তৈরী সাল্যামি। — সম্পাঃ

'কি বলব বাই ? যা দেখেছি না যা শুনেছি ?'

'বল্ যা দেখেছিস। শোনা কথায় বিশ্বাস হয় না। মিথ্যা কথা।'

'ঠিক আছে, শোন,' হাঁটু গেড়ে বসে চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর করে বলতে লাগল, 'তোমার ইয়ুরতার দিকে যখন আসছি বাই, হঠাৎ দেখি: আমার পথে পড়ে আছে একটা হলুদ রংয়ের সাপ। এমনি লম্বা আর এই মোটা। একটুও বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলছি না — ঠিক ঐ কাজিটার মত যেটা তুমি পোশাকের নীচে লুকিয়ে রেখেছ। কি দিয়ে লড়াই করা যায় ওটার সঙ্গে ? একটা পাথর তুলে নিলাম হাতে ঠিক ঐ ভেড়ার মাথার মত যেটার ওপর বসে আছে তোমার ছেলের বউ আর মারতে লাগলাম সাপটাকে। মেরে মেরে করে ফেললাম ঐ ময়দার তালের মত, যেটার ওপর বসে আছে তোমার স্ত্রী। যদি মিথ্যাকথা বলে থাকি তাহলে তোমরা আমার দাড়ি ছিঁড়তে পার ঐ হাঁসটার মত করে যেটাকে লুকিয়ে রেখেছে তোমার মেয়ে।'

বাই বুঝল যে আলদারের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে না। বিরক্তমনে বাই হাতা দিয়ে কড়াইয়ের জলটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে বলতে লাগল:

'ফোটো, ফোটো, ছ'মাস ধরে ফোটো।'

সেকথা শুনে আলদার ধীরেসুস্থে জুতোজোড়া খুলে কাছে রেখে হাই তুলে বলল:

'বিশ্রাম কর আমার জুতোজোড়া এই অতিথিপরায়ণ ইয়ুরতাতে আগামী বছর পর্যন্ত।'

মাঝরাত পর্যন্ত ফুটেই চলেছে কড়াইতে জল। শিগাইবাই তখনও আশা করছে খিদেয় কাবু করে অতিথিকে কোন রকমে তাড়িয়ে দেবে। আলদার কিন্তু নড়বার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না। শেষে হতাশ হয়ে বাই বলল:

'বুড়ী, বিছানা পাত। ঘুমোতে যাবার সময় হল অনেকক্ষণ।'

সবাই শোওয়ার যোগাড় করতে লাগল। আলদারও দেখিয়ে দেখিয়ে শক্ত করে চোখ বুঁজে রইল। আর যেই বাইয়ের নাক ডাকতে লাগল অমনি চুপি চুপি উঠে কড়াইয়ের থেকে মাংস তুলে পেটভরে খেয়ে নিয়ে তারপর বাইয়ের চামড়ার পোশাকটা কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে।

মাঝরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল বাই, স্ত্রীকে জাগাতে লাগল।

'ওঠ, আমার মনে হচ্ছে মাকুন্দটা ঘুমিয়ে পড়েছে। যতক্ষণ ঘুমোবে, ততক্ষণে খাওয়াদাওয়া হয়ে যাবে আমাদের। তাড়াতাড়ি কর।'

বাইয়ের স্ত্রী অন্ধকারেই কড়াটা নামিয়ে তার থেকে চামড়ার পোশাকটা একটা কাঠের থালায় করে নিয়ে স্বামীকে খেতে দিল।

বাই ছুরি দিয়ে পোশাকের একটা বড় টুকরো কেটে নিয়ে গুঁজে দিল মুখে। আরে এ কি ? চিবোয় চিবোয়, এদিক থেকে, ওদিক থেকে দাঁতে কিছুই করতে পারে না সেটাকে।

'কি দুর্ভাগ্য, খারাপ হয়ে গেছে মাংসটা।' রাগ হয়ে গেল বাইয়ের, 'এমন শক্ত হয়ে গেছে যে চিবোন যাচ্ছে না কিছুতে। সর্বকিছুই ঐ বদমাস আলদারটার জন্য।'

হতাশ শিগাইবাই থালাটা সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে বলে:

'ভোর হয়ে আসছে। সকাল সকাল গিয়ে ঘোড়া ভেড়ার পালের দেখাশোনা করে আসব। সঙ্গে নেবার জন্য ক'টা রুটি তৈরী করে দাও তো। হয়তো স্তেপে পেটভরে খেতে পারব।'

বাইয়ের স্ত্রী লুকিয়ে রাখা ময়দার তালটা বার করে রুটি সেঁকতে লাগল।

খানিক বাদে ফিসফিস করে বাই জিজ্ঞাসা করল: 'হয়েছে তৈরী, বুড়ী?'

'হয়েছে,' উত্তর দেয় বুড়ী, 'কেবল আগুনের মত গরম এখনও। একটু ঠাণ্ডা হোক।'

এমন সময় আলদার নাকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করল, হাত পা ছুঁড়ল, পাশ ফিরল।

'ঘুম ভাঙছে ওর।' চমকে উঠে বাই তাড়াতাড়ি জামার ভিতরে লুকাতে লাগল রুটি-গুলোকে। কিন্তু যেই তারপরে দরজার দিকে যেতে যাবে সে অমনি আলদার কোসে লাফিয়ে উঠে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'কোথায় যেন যাচ্ছ তুমি, বাই? শুভযাত্রা হোক।' আন্তরিকস্বরে মিষ্টি করে বলতে লাগল আলদার, 'আমিও আজ বোধহয় রওনা দেব। আবার কখনও দেখা হবে নাকি? এস আলিঙ্গন করে বিদায় নিই।'

বাই কোন কথা বলতে পারার আগেই আলদার তাকে জড়িয়ে ধরে চাপাচাপি করতে লাগল।

ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল বাই কিন্তু কোথায় কি: অতিথি যেন তাকে ফাঁসদড়ি দিয়ে বেঁধেছে। ওদিকে রুটির তাপে পুড়ে যাচ্ছে বাইয়ের দেহ। আর সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলল সে:

'ওরে পেট গেল।'

ছেড়ে দিল তাকে আলদার, শিগাইবাই তখন সব রুটিগুলো বার করে তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল:

'নে রে, বেহায়া, গেল এই ছাইয়ের রুটিগুলো!'

দারুণ খুশী আলদার কোসে:

'শুধু শুধুই গালিগালাজ করছ বাই, এমন চমৎকার রুটি খানের সামনেও সাজিয়ে দেওয়া যায়!'

সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, ঝেড়েঝুড়ে খেতে লাগল। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। আর বাই খিদে নিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় আবার বেরোবার তোড়জোড় করতে লাগল বাই। স্ত্রীকে ইয়ুরতার বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল:

'একটা মশকের মধ্যে আইরান* ঢেলে দাও, এমন করে ঢেলো যেন ঐ মাকুন্দ বদমাসটা দেখতে না পায়। পথে খেয়ে হালকা করব মনটা।'

'ঢালব তো কিন্তু নেবে কেমন করে?'

'গলায় মশকটা ঝুলিয়ে আলখাল্লার নীচে চাপা দিয়ে নেব...'

---

* আইরান — টক দুধ। — সম্পাঃ

কথা বলছে তারা ফিসফিস করে দু'জনে, কিন্তু জানে না যে আলদার বন্ধ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, বন্ধ কান দিয়ে শুনতে পায়।

বুড়ী বাইকে গুছিয়ে দিতে লাগল সবকিছু। গলায় ঝুলিয়ে দিল আইরান ভর্তি মশক, তার ওপর আলখাল্লাটা চাপা দিয়ে কোমরে রঙীন রুমাল বেঁধে দিল।

'বেরিয়ে পড়। ভালয় ভালয় ফিরে এস; ঘোড়ার পালের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

ওদিকে আলদারও ঠিক হাজির, ইয়ুরতা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইয়ের কাছে;

'বিদায়, বাই, বিদায়। আর বিরক্ত করব না তোমাকে, চলে যাচ্ছি। যদি কোন দোষ করে থাকি মাফ করে দিও।' বাইয়ের দু'হাত ধরে এমন ঝাঁকানি দিতে লাগল যে বাই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাই এদিক ওদিক করে ছাড়াবার চেষ্টা করছে ওদিকে আইরান পোশাকের নীচে ছলছলাৎ করে উঠছে, গড়িয়ে পড়ছে বুকের ওপর, পাতলুনের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে জুতোর মধ্যে।

'ছেড়ে দে,' কাঁদো কাঁদো অবস্থা বাইয়ের, 'পড়ে যাব!..' কোন রকমে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে মশকটা নিয়ে আলদারের দিকে ছুঁড়ে দিল। 'খা, খা রে পেটুক আমার আইরানটা, যেন বিষম খেয়ে মরিস!'

আলদার লুফে নিল মশকটা তারপর নিজের গলায় ঢেলে দিল আইরানের শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত।

'আঃ! ধন্যবাদ বাই। আবার সকাল বেলায়ই এমন খাওয়া খাইয়ে দিলে। আজ আর যেতে পারব না। ভরা পেট নিয়ে তো আর পথে বেরোন যায় না। যাই ইয়ুরতার ভিতরের ঠাণ্ডায় গিয়ে বিশ্রাম নিই!..'

আর কয়েকদিন গেল। রাগে মুখচোখ বসে গেছে বাইয়ের। দুঃখ করে স্ত্রীকে বলে:

'শেষ করে দিল আমাদের মাকুন্দটা। ওর বেহায়া মুখটা আর দেখতে পারি না। রাগে জ্বলছে ভেতরটা। সবকিছুর এমনি প্রতিশোধ নেব যে মনে থাকবে ওর!'

আলদার কোসে আন্দাজ করল যে বাই কিছু একটা খারাপ মতলব করছে। 'রাগে কিপটে বুড়ো আমার ঘোড়াটার কিছু করে না বসে আবার,' ভাবে।

যেই অন্ধকার নামল চুপি চুপি এগিয়ে গেল সে ঘোড়াগুলোর দিকে, নিজের ঘোড়ার সাদা ন্যাড়া মাথাটায় গোবর মাখিয়ে দিল আর বাইয়ের পালের সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটার কপালে সাদা খড়ি দিয়ে ঠিক তেমনি করে এঁকে দিল যেমন ছিল তার নিজের ঘোড়ার মাথায়।

'যদি শিগাইবাই আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে তো তার নিজেরই ক্ষতি হবে!'

তাই হল।

মাঝরাতে বাই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল ইয়ুরতা থেকে, চোরের মত চারপাশে নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে, সাদা ন্যাড়ামাথা ঘোড়াটার পাঁজরায় ঢুকিয়ে দিল ছোরা:

'এই যে, মহাসম্মানিত অতিথি, প্রতিশোধ নিলাম!'

ঘাসে ছোরাটা মুছে নিয়ে ইয়ুরতাতে ফিরে এসে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ল। তারপর সাতসকালেই গোলমাল আরম্ভ করে দিল:

'এই মাকুন্দ, কুঁড়ের বাদশা, ওঠ! দেখ কি কাণ্ড! এই দেখ বুড়ী পাগলের মত ছুটে এসেছে: বলছে, অতিথির ঘোড়া মরতে বসেছে। বোধহয়, ধারাল কোন কিছুর ওপর পড়ে গিয়েছিল, প্রচণ্ড রক্ত পড়ছে। কি অকর্মা যে তুই, নিজের ঘোড়াটারও একটুও দেখাশোনা করিস না। একটাই কেবল কাজ পরের পাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরানো!..'

বকবক করছে বাই আর হাসছে মনে মনে।

আলদার উঠে বসে হাই তুলল:

'কি পাগলের মত বকছ, বাই? কার ঘোড়া মরছে?'

'ওরে নচ্ছার, তোর ঘোড়াটা! যেটার মাথা ন্যাড়া!'

'যাক, মরুক,' আবার শুয়ে পড়ল আলদার, 'খালি জেনো যদি ন্যাড়া মাথায় গোবর মাখান থাকে তো সেটা আমার ঘোড়া ঠিকই, আর যদি খড়িমাখান হয়, তোমার নয় তো...'

আলদারের কথা কেমন ধন্দ জাগাল শিগাইবাইয়ের মনে। ঘোড়াগুলোর কাছে ছুটে গিয়ে দেখে নিজের প্রিয় ঘোড়াটাকেই কেটে ফেলেছে। সারা এলাকা কাঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বাই কিন্তু কাউকে কিছু বলার নেই।

আরও অনেকদিন রইল আলদার শিগাইবাইয়ের কাছে। সব সময়েই সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত বাইয়ের মেয়ে বিজ-বেকেশের দিকে। চটপটে, চঞ্চলআঁখি মেয়েটিকে মনে ধরেছে তার। মেয়েটিরও মনে ধরেছে হাসিখুশী স্বভাবের যুবকটিকে। একদিন যখন তারা একা হল আলদার জিজ্ঞাসা করল:

'বিজ, তুমি আমায় বিয়ে করবে?'

রাঙা হয়ে উঠল বিজ-বেকেশ, চোখ নামিয়ে বলল:

'তোমার সঙ্গে দুনিয়ার অপর প্রান্ত পর্যন্তও যেতে পারি, আলদার। ঘেন্না ধরে গেছে এই অন্ধকার ইয়ুরতায়, এই বিশ্রী জীবনে! কিন্তু বাবার লোভ মেটাতে পণের টাকা যোগাবে কি করে?'

মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে আলদার কোসে বলল:

'কালকেই তোমাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাব, সোনামণি! কোনরকম পণ ছাড়াই!'

পরের দিন সাতসকালেই বেরিয়ে পড়ল বাই যাতে ঐ ঘাড়ে এসে বসা লোকটার মুখ দেখতে না হয়।

আলদার তার পিছন পিছন ছুটে গিয়ে হাত ধরে টেনে বলে:

'বাই, সত্যি বলছি, আজ চলে যাব, আল্লাহ্‌র কসম, বাজে কথা বলছি না। ফিরে এসে দেখবে — ইয়ুরতা ফাঁকা হয়ে গেছে। কেবল একটা সাহায্য কর আমাকে শেষ বারের মত, বিজ*

---

* বিজ — 'জুতো সেলাইয়ের ছুচ' — আর এক অর্থে।

দাও। বেরোবার আগে জুতোটা সেলাই করে নেব, একেবারে গর্ত হয়ে গেছে, শুকতলিগুলো পড়ে যাচ্ছে...'

বাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ভাবল খানিক। আলদার ছাড়ে না:

'দাও, বাই, দাও বিজ! যদি না বল তো আবার তোমার এখানে থেকে যেতে হবে শীত কাটানর জন্য...'

'এ কি বিপদ!' ভয় পেয়ে গেল বাই, আলদারের দিকে না তাকিয়েই দাঁত কিড়মিড় করে বলল:

'হয়েছে যথেষ্ট, ডাকাত, আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বল বিজ দিক তোকে! বলবি — বাই বলেছে... আর যত তাড়াতাড়ি পারিস দূর হয়ে যা আমাদের চোখের সামনে থেকে, জোচ্চোর!'

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!' আনন্দে লাফাতে লাগল আলদার, প্রায় উড়ে এসে ঢুকল ইয়ুরতায়।

'বাইবিশে*, মেয়েকে তৈরী কর।'

'কি জন্যে?'

'বাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, বাই রাজী — বিজকে বিয়ে করব আমি।'

'জিভ তোর খসে পড়ুক, আকাট, — মিথ্যা বলছিস কেন? এমন একটা ভিখারীর হাতে বাই তার একমাত্র মেয়েকে তুলে দেবে?'

'যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো নিজের কানেই শোন!' বলে বুড়ীকে টানতে টানতে ইয়ুরতার বাইরে নিয়ে এসে দূরে চলে যাওয়া বাইয়ের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলল: 'বাই! বাই! বাইবিশে তোমার আদেশ মানতে চাচ্ছে না: বিজ দিচ্ছে না আমাকে। তুমি নিজেই বল একে!'

শিগাইবাই চীৎকার করে বলল:

'আরে গিন্নী, ওকে বিজ দিয়ে দাও! কোন কথা নেই, দিয়ে দাও, নাহলে খারাপ হবে। বিজ নিয়ে যে চুলোয় যায় চলে যাক!'

'শুনলে?' বলে আলদার, 'আর তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছিলে না...'

হাহুতাশ করতে লাগল বাইয়ের স্ত্রী:

'এ কি কথা? পাগল হয়েছে বুড়ো নাকি? কার হাতে মেয়ে তুলে দিচ্ছে! গরীব, মানকুল নেই গরুঘোড়া নেই, সহায় সম্বল কিছু নেই!' যাই হোক, স্বামীর আদেশ না মানতেও সাহস পেল না। বলল, 'নে, নে, মেয়েকে নে, তবে তোর টিকিটাও যেন এখানে আর না দেখি!'

আলদার কোসে ততক্ষণে উঠে বসেছে নিজের ন্যাড়া ঘোড়াটায়, ঘোড়াটাও এতদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে খুব খুশী হয়ে উঠেছে দূরের পথ যাবার আনন্দে। সুন্দরী বিজ-বেকেশকে নিজের সঙ্গে ঘোড়ায় বসিয়ে লাগামে টান দিল আলদার কোসে, তার পিছনে ধূলিঝড় উঠল কেবল।

---

* বাইয়ের স্ত্রীর প্রতি সম্বোধন।

কেমন করে আলদার কোসে বুদ্ধিমান খরগোস বিক্রী করল

পথে এক পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল আলদার কোসের।

তাকে আলিঙ্গন করে আলদার বলল, 'এমন রোগা হয়ে গেছিস ? মনমরা কেন ? কেমন আছিস বল।'

বন্ধু বিষণ্ণভাবে উত্তর দিল, 'আছি এইরকম — গায়ে দেবার কিছু নেই, হাঁড়িতে চড়াবারও কিছু নেই। ক্ষুধা ঠেলে বার করে দেয় ঘর থেকে আর নগ্নতা ঘরে ঢুকিয়ে দেয় ঠেলে... পরিবারটা শেষ হয়ে যেতে বসেছে, আলদার।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, তোর তো ভেড়ার পাল ছিল।'

'ছিল। দশটা। কিন্তু এখন আর নেই।'

'মরে গেছে নাকি ?'

'না, মরে নি, বাই কারিনবাই নিয়ে নিয়েছে, সব কটাকে। 'কেন মারছ প্রাণে?' বললাম আমি। হাসে বাই, 'তোর দাদু গানেতে আমার দাদুকে 'রক্তচোষা' বলে গাল দিয়েছিল সেই জন্য।'

ভ্রূ কেঁপে উঠল আলদারের।

'শোন বন্ধু... শুধু কথায় তো পেট ভরে না। কথার দরকার নেই তোমার, দরকার ভেড়ার। জেনো, তুমি ফেরত পাবে ভেড়া। অমাবস্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর...'

বিদায় নিয়ে যে যার পথে চলে গেল তারা।

স্তেপের মধ্যে দিয়ে চলেছে আলদার কোসে, গুণগুণ করে গান গাইছে আর প্রায় নেচে নেচে চলেছে যেন ভুলেই গেছে একটু আগের কথাবার্তা সম্বন্ধে। হঠাৎ ঠিক তার পায়ের তলা থেকেই যেন লাফিয়ে উঠল দুটো খরগোস, সঙ্গে সঙ্গে দুটো দু' দিকে ছুট মারল।

খরগোসগুলো দারুণ চটপটে কিন্তু আলদারের চেয়ে বেশী নয়: আলদার বাঁদিক ফিরে, ডানদিক ফিরে দুটোকেই কান ধরে তুলে নিল হাতে।

বাড়ীতে নিয়ে এল। খুব খুশী হল তার স্ত্রী, 'দাও আমাকে খরগোসগুলো। কোথায় পেলে ওগুলোকে?'

'পরে সব বলব। আপাতত: আমার কথা শোন ভাল করে: আগনে জ্বালিয়ে রান্না কর চর্ব্যচোষ্য! যার পেট কখনও ভরে না, সেই কারিনবাই আজ আমাদের অতিথি হবে। ওকে ভাল করে আদর আপ্যায়ন করে বসাতে, খাওয়াতে হবে। যখন সে জিজ্ঞাসা করবে কে তোমায় খবর দিল যে অতিথি আসবে, তখন বলবে 'খরগোস!' বলে দেখিয়ে দেবে খরগোসটাকে। মনে থাকবে যা বললাম? চললাম আমি।'

বিস্মিত স্ত্রীর হাতে একটা খরগোস ধরিয়ে দিয়ে অন্য খরগোসটা নিজে নিয়ে চলে গেল। মাঠের ঘাস তিনবার দোলার আগেই আলদার কারিনবাইয়ের গ্রামে পেঁাছিয়ে গেল।

থলথলে মোটা বাই আলদারের হাতে ধরা খরগোসটার দিকে, আলদারের দিকে তাকাল তারপর ঘৃণাভরে 'হুঃ' করে বলল: 'তোর সাঙ্গপাঙ্গরা তোকে খেতেটেতে দিচ্ছে না নাকি রে, মাকুন্দ? ভরা পেটে তো আর খরগোসের মাংস খাবার কথা ভাবছিস না।'

আলদার কোসে বেশ আত্মমর্যাদা নিয়ে বলল:

'জল পর্যন্ত না গিয়েই জুতো খুলে ফেলার দরকার কি, বাই! শুধু শুধু মুখ না নাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর বরং এটা কেমন খরগোস। যেমন তেমন খরগোস নয় ওটা — বুদ্ধিমান খরগোস। যেখানেই পাঠাও না কেন, যে কাজেরই ভার দাও না কেন ঠিক ঠিক করে দেবে। এর চেয়ে বেশী চটপটে ভৃত্য স্বয়ং খানেরও নেই।'

বাইয়ের মুখ বেঁকে গেল যেন বোলতা কামড়েছে।

'বদমাস মিথ্যাবাদী! কার চোখে ধুলো দিচ্ছিস? নাকি তুই আমার স্বভাব জানিস না? এমন শিক্ষা দেব তোকে আমাকে ঠকানর জন্য যে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে তোর মুখটা!'

'কি বিশ্রী যে গালিগালাজ করছ,' তিরস্কারের সুরে বলল আলদার কোসে। 'তোমার থেকে অন্য কি আর আশা করা যায়? খারাপ মুখ থেকে খারাপ কথাই বেরোয়। আমি তাতে রাগ করি না: কুকুর চেঁচাতে থাকে — ক্যারাভানদল তাকে পেরিয়ে চলে যায়! কিন্তু খরগোসের জন্য খারাপ লাগছে। ওকে কেন বিশ্বাস করছ না? ওর ক্ষমতা দেখতে চাও?'

'দেখা।' বলল বাই।

আলদার কোসে খরগোসটাকে তুলে ধরে তার কানের কাছে বলল: 'যত জোরে পারিস দৌড়ে বাড়ীতে যা, আমার গিন্নীকে বল যে সম্মানিত কারিনবাইকে নিয়ে আসছি আমি অতিথি করে, ইতিমধ্যে সে যেন ঘরদোর গোছগাছ করে রান্নাবান্না সেরে ফেলে!' বলে খরগোসটাকে নামিয়ে দিল ঘাসের ওপর।

বসল খরগোসটা, কানগুলো নাড়াল, একবার লাফাল, আর একবার লাফাল তারপর সে যে আর বন্দী নয় বুঝে এক ছুটে স্তেপের মধ্যে মিলিয়ে গেল যেন কুমাইয়ের* তাড়া খেয়েছে সে।

সেদিকে তাকিয়ে মুখে 'হেট-হেট!' আওয়াজ করল বাই। আলদার বাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলল:

---

* কুমাই — রূপকোথার কুকুর।

'ওকে তাড়া দেবার দরকার নেই, বাই। বুদ্ধিমান খরগোস ঠিক জানে কি করতে হবে। চল আমরাও যাই ওর পিছনে পিছনে। যতক্ষণে যাব আমরা ততক্ষণে আমার স্ত্রী নানারকম সুস্বাদু খাবারদাবার রান্না করে ফেলবে। খেলেই বুঝবে!'

'ঠিক আছে!' হুমকি দিয়ে বলল বাই, 'যাব তোর ঘরে, ঠগ! তোর ঠগবাজি ধরে ফেলার জন্য সময় বা সম্মান নষ্ট করতেও দ্বিধা করব না। আজকের দিনটা মনে থাকবে তোর!'

চলেছে তারা। বাই মুখ গোমড়া করে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে, আলদারের মুখে খই ফুটছে একেবারে খরগোসের প্রশংসায়।

আলদারের ইয়ুরতা দেখা গেল। বাইয়ের নাক খাড়া হয়ে গেল: কি দারুণ গন্ধ মাংস রান্নার! জিভে জল গড়াতে লাগল তার, মুখটা আরও গোমড়া হয়ে গেল।

ইয়ুরতাতে ঢুকল তারা, দেখে ভিতরটা পরিষ্কার ঝক ঝক করছে, ঘরের মাঝখানে ধপধপে সাদা চাদর বিছান আর ওপর এত খাবার সাজান যে দশজনে খেয়েও শেষ করতে পারবে না!

হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল বাই, আলদার তার হাত ধরে পরম আত্মীয়ের মত বসিয়ে দিল তাকে সম্মানের আসনে, নিজে হাতে তার মুখে তুলে দিল খাবার।

পেটুক বাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল খাবারদাবারের ওপর, নিঃশ্বাস বন্ধ করে খেয়েই চলল আর আলদারের স্ত্রী সাজগোজ করে প্রথামত অতিথির বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'খান, খান কারিনবাই-আগা!'

আকণ্ঠ খেয়ে তৃপ্তিতে মনটা নরম হল বাইয়ের। বালিশে কনুইয়ের ভর দিয়ে হেসে ফোঁস ফোঁস করে বলল:

'তোর গিন্নীর হাত যেন মধুমাখা, আলদার। মন ভরে গেল। জীবনে এমন খাওয়া খাই নি। এমন চমৎকার অতিথিসৎকারের জন্য ঝগড়া মিটিয়ে নিতে চাই আমি, তোর সব মিথ্যাকথার দোষ ক্ষমা করে দিলাম তোকে... তবু বল তো দেখি মেয়ে, আলদারের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল সে, 'তুমি কি করে জানলে যে তোমার স্বামী অতিথি সঙ্গে নিয়ে আসছে?'

একটু হেসে আলদারের স্ত্রী পর্দার আড়ালে চলে গেল তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এল খরগোসটা হাতে নিয়ে।

'এ এনেছে সম্মানিত অতিথি আসার সুখবর!' বলে খরগোসের গায়ে হাত বোলাতে লাগল সে আদর করে।

মুখচোখ পালটে গেল বাইয়ের।

'তোর সঙ্গে কথা বলা দরকার, আলদার। চল, বাইরে যাই!'

যখন তারা দু'জনে মুখোমুখি হল বাই আলদারের হাত ধরল মিটমাট করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

'দেখছি, অন্যায় তর্ক করেছি তোর সঙ্গে কিছু মনে করিস না তুই। তোর স্ত্রীর হাতের রান্না দারুণ চমৎকার, কিন্তু তার চেয়েও ভাল তোর বুদ্ধিমান খরগোস। স্বীকার কর আলদার, তোর মত গরীবের ঘরে এমন খরগোস রাখা কি বড় বেশী বিলাসিতার ব্যাপার নয়?'

'তা' অবশ্য ঠিক,' দীর্ঘশ্বাস পড়ল আলদারের। 'ধনীর তাঁবু ঝড়ঝাপটা সয়েও দাঁড়িয়ে থাকে আর দরিদ্রের তাঁবু এক ফোঁটা বৃষ্টিতেই কাবু। বুঝলাম তোমার ইঙ্গিত, বাই, খরগোসটা তোমায় দিয়ে দিতে রাজী আছি: ভাল লেগেছে তোমার যখন নিয়ে নাও, তোমার শত্রুমিত্র সবার কাছে গর্ব করবে এটিকে নিয়ে। কিন্তু এর বদলে আমি কি পাব? একশ'টা ভেড়া দেবে?'

পোড়াকড়াইয়ের মত কালো হয়ে গেল মুখটা বাইয়ের।

'বড় বেশী বলছিস, আলদার।'

'না চাও — নিও না...' মুখ ফিরিয়ে নিল আলদার।

খানিক হাহুতাশ করে রাজী হয়ে গেল বাই।

পরের দিন একশ'টা ভেড়ার পাল নিয়ে এল বাই আলদারের কাছে, আলদার তার হাতে খরগোসটা তুলে দিল বেশ জাঁক দেখিয়ে।

'যেমনভাবে আমার কথা শুনতিস তেমনভাবেই নতুন মনিবের কথাও শুনবি।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে সে চুমো দেয় খরগোসটিকে।

দু'দিন বাদে কারিনবাই প্রচণ্ড রাগে গালিগালাজ করতে করতে হুড়মুড় করে এসে ঢোকে আলদারের ইয়ুরতায়, আলদারের জামা ধরে চীৎকার করে:

'জোচ্চোর। খরগোসটার বদলে যা নিয়েছিস ফেরত দে এখুনি। নাহলে — খারাপ হবে।'

'শান্ত হও, শান্ত হও, বাই, কি হয়েছে তোমার?' শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল আলদার বাইকে। 'তোমাকে সাপে কাটল নাকি? বুঝিয়ে বল কি হয়েছে?'

'তুই, বদমাশ, ঠকিয়েছিস আমাকে, সারা স্তেপে আমায় নিয়ে হাসাহাসি চলছে। বারোজন সম্ভ্রান্ত বাইয়ের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলাম আমি। খরগোসটাকেও নিয়েছিলাম সঙ্গে। সব বাইরা জাঁক করতে লাগল, কেউ নিজের ঘোড়া নিয়ে, কেউ বন্দুক, কেউ বা শিকারী পাখী নিয়ে... তখন আমিও খরগোসটাকে দেখিয়ে বললাম এমন আশ্চর্য জিনিস তাদের কারুর নেই। 'আমার খরগোস আমার যে কোন আদেশ পালন করে,' বললাম। বিশ্বাস হল না বাইদের। বাজী ধরলাম আমরা। তখন আমি খরগোসকে বললাম, 'আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবি সে যেন ভোজের আয়োজন করে রাখে, বারোজন বন্ধুকে নিয়ে আসব আমি, সন্ধ্যায় এসে পেঁছাব আমরা।' দৌড় দিল খরগোসটা, আর আমরা আরও খানিকক্ষণ শিকার করে তারপর গ্রামের দিকে ফিরতে লাগলাম, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। 'তাড়াতাড়ি পেঁছান চাই।' বন্ধুরা জোর ঘোড়া ছোটাল। আমি তাদের বলি, 'একটু পরেই পেঁছাব, দেখবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চমৎকার খাবারদাবার, বুদ্ধিমান খরগোস ঠিক বোঝে তার কাজ।' পেঁছে দেখি ইয়ুরতায় কোন গোছগাছ নেই, চুলায় আগুন পড়ে নি। স্ত্রীকে বলি, 'আমার কথামত রান্না কর নি কেন অতিথিদের জন্য?' চোখ কপালে উঠল স্ত্রীর, 'কখন তুমি বললে? স্বপ্ন দেখেছ নাকি?' 'বুদ্ধিমান খরগোস কিছুই বলে নি তোমাকে?' 'কোন খরগোস?' 'তার মানে বুদ্ধিমান খরগোস তোমার কাছে আসে নি?' স্ত্রী বলে, 'ওগো শোন সবাই, ধর বাইকে, মাথা খারাপ হয়ে

গেছে বাইয়ের,' বলে পালিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। আর হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল অতিথিদের খিদের কথা ভুলে গেছে তারা। আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দেখিয়ে হাসছে আর বলছে, 'আরে কারিনবাই, আমাদের দারুণ অবাক করে দিয়েছে তার বুদ্ধিমান খরগোস দিয়ে!..' দেখেছিস, কি কাণ্ড ঘটিয়েছিস তুই? তোর জন্য সব গেল আমার। এবার আমার জিনিস দিয়ে দে আর ঠকানর জন্য তোকে শিক্ষা দেব 'খন পরে!'

'বাই,' আন্তরিক সুরে বলল আলদার, 'সত্যি বলছি তোমার জন্য খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু এমনি ঘটনার জন্য বোধহয় তুমি নিজেই দোষী। বল দেখি প্রতিদিন সকালে খরগোসকে তুমি আসপান-জাপরাক ঘাস দিতে?'

'আসপান-জাপরাক ঘাস?' বিষম খেল বাই। 'আসপান-জাপরাক দেওয়ার দরকার নাকি?'

'তা নয় তো কি? অতিমূর্খেও জানে ঐ ঘাস ছাড়া বুদ্ধিমান খরগোস এক দিনও বাঁচতে পারে না। বেচারীকে কষ্ট দিয়েছ তুমি, তাই জন্যেই ও পালিয়েছে তোমার কাছ থেকে।'

'আমি তো জানতাম না যে আসপান-জাপরাক দরকার!' ধমকে উঠল বাই।

'শ-শ-শ,' বাইয়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল আলদার, 'কাউকে বলো না একথা! তার মানে তুমি অতিমূর্খের চেয়েও মূর্খ। তোমার সেই বন্ধুরা একথা জানতে পারলে কি হবে!'

বাই রাগে কি যেন গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ইয়ুরতা থেকে।

আলদার আর তার স্ত্রী হাসতে লাগল।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় আকাশে যখন প্রথমার চাঁদ ঝিকঝিক করছে তখন আলদার আর তার স্ত্রী ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলল সেই বেচারীর কাছে যার ভেড়াগুলি কেড়ে নিয়েছে নিষ্ঠুর কারিনবাই।

কেমন করে আলদার কোসে বাইয়ের রোগ সারাল

একদিন পাহাড়ী চারণভূমি পেরিয়ে যাচ্ছে আলদার কোসে, চারপাশে নজর করে দেখছে, কোথাও পথে কিছু খেয়ে নিতে পারলে হয়। দেখে: দুই পাহাড়ের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল — প্রায় হাজার খানেক ভেড়া, সেই পালের সঙ্গে রাখাল এক বুড়ো — ছেঁড়া নেকড়া পরনে তার।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসে আলদার জিজ্ঞাসা করল:

'কার ভেড়া চরাচ্ছ, চাচা ?'

'যারই হোক না কেন, তোর তাতে কি,' বিরক্তভাবে উত্তর দিল বুড়ো।

'শুধু শুধুই তুমি রাগ করছ, ভাল কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। এই বয়সে, এমন একটা পাল চরান তো আর ছেলেখেলা কথা নয়। তোমার বাইয়ের দয়ামায়া বলতে কিছু নেই, তার ইয়ুরতা যেন মালিকহারা হয় !'

আরও রেগে গেল বুড়ো।

'তোর জিভ খসে যাক ! কোন বাই আবার ? আমার ওপর কোন বাই নেই। আমি নিজেই বাই !'

'তাই নাকি !' শিস দিয়ে উঠল আলদার। 'এমনও হয় জীবনে। কিন্তু বুঝছি না তুমি এমন ধনী হওয়া সত্ত্বেও রাখাল রাখ না কেন।'

'রাখালকে খেতে দিতে হবে তো ?'

'তা ঠিক,' একমত হল আলদার। 'পেটভরে খেতে পাওয়া ঘোড়ার আটটা পা... রাখাল রাখলে তুমি শান্তিতে জীবন কাটাতে পারতে। এই বয়সে ভেড়া চরান, অসুখে না পড়লে হয়।'

'অসুখ, অসুখ...' মুখ ভেংচে বলল বাই, 'অনেকদিনই অসুখে ভুগছি আমি।'

'কি অসুখ, চাচা ?' ঘোড়া থেকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল আলদার।

টুপিটা মাথা থেকে খুলল বুড়ো।

'দেখছিস ? সারা মাথা ঘায়ে ভরে গেছে। এমন চুলকোয় যে পারি না। যত চুলকোই, আরও বেশী চুলকোয়...'

সহানুভূতিতে মাথা নাড়াল আলদার।

'আহা-আহা, বাই, চিকিৎসা করা দরকার তো।'

নড়েচড়ে উঠল বুড়ো।

'চিকিৎসা করাতে গেলে টাকা খরচ হবে। বদমাস হাকিমগুলো ফোকটে কিছুই করবে না। একজন হাকিম চিকিৎসার বদলে চাইল উট, আর একজন — ঘোড়া, আর একজন — গোটা ঘোড়ার পাল... ভাগিয়ে দিলাম সবাইকে। এমন ক্ষতি স্বীকার করার চেয়ে মাথাই যাক, সেও ভাল।'

'ও বাই,' হঠাৎ হাত ছুঁড়ে আলদার বলল, 'আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাও — তোমার কপাল ভাল!'

'চেঁচাচ্ছিস কেন? ভেড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিলি। বল দেখি, আমার কপাল ভাল কেন?'

'তোমার কপাল ভাল কারণ আমিও হাকিম। আমি অন্য সব হাকিমের মত নয়। আমি চিকিৎসা করি বিনা স্বার্থে। যে কোন রোগ সারিয়ে দিতে পারি...'

অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল বাই।

'বল তবুও, কি চাও তুমি চিকিৎসার পরিবর্তে?' বলল শেষে। আর মনে মনে ভাবে, 'শুধু শুধুই তুই আমার কাছ ঘেঁষছিস, বাছুর একটা নেকড়ে মেরেছে এমন কখনও হয় নি।'

'না বলার কি আছে!' বলে আলদার, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে চাই দীর্ঘ জীবন ও বিনা-রোগভোগে মৃত্যু, আর কিছু না।'

বাই ভাবল ভুল শুনেছে সে।

'সত্যি বলছিস?'

'তোমায় মিথ্যা বলতে যাব কেন?' কাঁধ ঝাঁকাল বাই। 'লোকে মিথ্যা বলে কোন কিছু লাভ করার জন্য, শুধু শুধু মিথ্যা বলে তো কোন লাভ নেই।'

'হাকিমের বোধহয় মাথার গোলমাল আছে,' ভাবল বাই, 'সত্যি সত্যি দেখি আল্লাহ্‌ একে এনে দিয়েছেন আমার কাছে। কথায় বলে, পরের ঘোড়ায় চেপে বুখারা যাওয়া; যদি কিছু দিতে না হয় তো চিকিৎসা করাব না কেন? ওর চিকিৎসায় কাজ হয় হল, না হয় তো আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হল না...'

মুখচোখ পালটে গেল বুড়োর।

'উপকারী বন্ধু আমার,' বলতে লাগল সে, 'তোমার সব আশা আকাঙ্খা যেন পূর্ণ হয়।' কেবল চলে যেও না তুমি, বুড়োর চিকিৎসা করে এ জ্বালা থেকে বাঁচাও!..'

আলদার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল:

'তোমার অমন করে বলার দরকার নেই, না বললেও তোমার চিকিৎসা করব। একটা ভেড়া কাট!'

চমকে পিছিয়ে গেল বাই।

'ভেড়া কাটব? এখুনি তুমি বললে যে বিনামূল্যে চিকিৎসা করবে!'

'একশ'বার সে কথা বলতে পারি। নিজের জন্য নয়, তোমার জন্যই বলছি, তোমার ঘা সারাবার জন্য চাই ভেড়ার পাকস্থলী। আর চিকিৎসার আগে রুগীর পেটভরে খাওয়া দরকার ভেড়ার মাংস । তা নাহলে কোন ফল হবে না ।'

ভাবনায় পড়ে গেল বাই। কিন্তু ঠিক সে সময়েই এমন অসহ্য জ্বালা করে উঠল টাকমাথাটা যে বুড়ো ঝাঁকিয়ে উঠল মাথা যেমন ঘোড়া তার মাথা থেকে মাছি তাড়াতে মাথা নাড়ায়। তা লক্ষ্য করল আলদার।

'তাহলে, বাই, চিকিৎসা করাবে? নাকি ভেড়ার নাড়ীভুঁড়ির দাম তোমার কাছে জীবনের চেয়েও বেশী!'

হাঁসফাঁস করতে করতে বাই ভেড়ার পালের কাছে গেল। রোগা একটা ভেড়া বেছে নিয়ে, কেটে ছাল ছাড়িয়ে নাড়ীভুঁড়িটা দিয়ে দিল আলদারকে, মাংসটা সিদ্ধ করতে বসাল কড়াইতে।

সিদ্ধ হয়ে গেল মাংস।

'খাও বাই!' বলল আলদার কোসে। 'খাও, আমার দিকে তাকাবার দরকার নেই, মাংস মুখে তুলি না আমি।'

তার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে বাই একটুকরো মাংস কেটে নিয়ে লোভীর মত পুরোটা মুখে পুরে দিল।

'খাও, আরও খাও!' জোর দিয়ে বলল আলদার।

'যথেষ্ট খেয়েছি,' মুখ মুছে বলল বাই, 'কালপরশু খেতে হবে, একটু একটু করে খেলে এতে আমার বেশ ক'দিন চলে যাবে...'

হেসে ফেলে আলদার।

'কিপটে বটে তুমি, বাই। একটা ভেড়া একবছর ধরে খাবার কথা ভাবছ নাকি? কুকুরের চামড়া দিয়ে তো আর ইয়ুরতা ছাওয়া যায় না। যাক, ও হল তোমার ব্যাপার বেশী কথা বলার সময় নেই আমার। এই গর্তটায় উবু হয়ে বোস, টুপি খুলে ফেল আর স্থির হয়ে বসে থাক!'

নির্দেশ পালন করল বাই। ওদিকে আলদার ভেড়ার পাকাস্থলীটা ছুরি দিয়ে কেটে টেনে ধরে বাইয়ের মাথায় পরিয়ে দিতে লাগল।

'কি করছিস?' চীৎকার করে উঠল বাই। 'দমবন্ধ হয়ে মরব যে আমি।..'

'সহ্য কর, সহ্য কর,' বলল আলদার, 'আর জোরে জোরে এই জাদুবাক্য আওড়াও 'হাওয়া যা এনেছে, তা হাওয়াই উড়িয়ে নিয়ে যাক।' সাত হাজার বার যদি বল তো রোগ সেরে যাবে। দেখো, গুণতে ভুল কোরো না যেন!'

হঠাৎ বাই লাফিয়ে উঠল গর্ত ছেড়ে।

'আর আমার ভেড়াগুলো? কে ওদের চরাবে?'

'ভেবো না, আমি চরাব।'

'তোকে আমি বিশ্বাস করলাম আর কি! তুই ওগুলোকে নিয়ে চলে যাবি! আমার চোখ তো বন্ধ...'

'চোখ বন্ধ, কান তো খোলা। ভেড়াগুলো যতক্ষণ চরছে ধারেকাছে, ততক্ষণ আওয়াজ তো শোনা যাবে। যদি আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে তুমি তো তখন বুঝতে পারবে নাকি?'

চুপ করে গেল বাই: ঠিকই বলেছে হাকিম, যদিও লোকটি কেমন অদ্ভুত। ছোট্ট গর্তটায় বসে মাথায় ভেড়ার পাকস্থলী পরে সে বলতে লাগল মসজিদের মোল্লার মত: 'হাওয়া যা এনেছে, হাওয়াই তা নিয়ে যাক! হাওয়া যা এনেছে, হাওয়াই তা নিয়ে যাক।..'

তখন আলদার ভেড়াগুলোর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়তে পাড়তে কড়াই থেকে মাংস তুলে নিয়ে প্রাণভরে খেল, তারপর বাকী মাংস আর ভেড়ার নাড়ীভুঁড়ি ছড়িয়ে দিল খোলা জায়গায়। তারপর সব ভেড়াগুলোকে একত্র করে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে কোথায় কেউ জানে না। লোকে কেবল জানে যে ঐ দিন থেকে অনেক দরিদ্রের, যাদের এর আগে কখনও ভেড়া ছিল না, এখন হয়েছে ভেড়া, কারও বা পাঁচটা, কারও বা দশটা আবার যার অনেক সন্তানসন্ততি তার আরও বেশী।

ভেড়ার পাল অদৃশ্য হয়ে যাবার পরই গন্ধ পেয়ে আলদারের ছড়িয়ে রাখা মাংস নাড়িভুঁড়ির ওপর দলে দলে উড়ে এল পাখী, পাখার ঝাপটার আওয়াজে ভরে গেল জায়গাটা। আর বাইয়ের মনে হল ভেড়াগুলো আছে কাছেপিঠেই। কান পেতে শোনে আবার মন্ত্র আওড়াতে থাকে:

'হাওয়া যা এনেছে হাওয়াই তা নিয়ে যাক! হাওয়া...'

সন্ধ্যার মুখে গ্রাম থেকে মেয়েরা এল ভেড়াগুলো দুইতে। এদিক দেখে, ওদিক দেখে ভেড়ার পাল নেই কোথাও, কেবল পাখীর ঝাঁক ওড়াউড়ি করছে সেখানে আর কোথা থেকে শোনা যাচ্ছে বাইয়ের গলা। গর্তের দিকে তাকিয়ে সবাই মিলে কলকল করে উঠল:

'তুমি এমনি করে বসে আছো কেন? মরতে বসেছো নাকি কারুর কাছ থেকে লুকিয়েছ? মাথায় ওটা কি? হাওয়া, হাওয়া কি বলছ? ভেড়ার পাল কই? কিছু ঘটেছে নাকি?'

তাদের গলা শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বাই গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে খুলে ফেলে মাথা থেকে ভেড়ার পাকস্থলীটা। তখনি সব বুঝল সে।

গর্তটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করতে লাগল সে, 'লুঠ করেছে! ধর! ধর!'

তার চীৎকার শুনে কাছেপিঠের গ্রাম থেকে পুরুষমানুষরা ছুটে এল ভারী ভারী লাঠি-সোটা নিয়ে, কি ঘটেছে সব শুনে লাঠি ফেলে দিল তারা। বদমাস লোককে আর কে সাহায্য করতে চায়? বাইকে নিয়ে কেবল হাসাহাসি করতে লাগল তারা।

'ঐ হাকিম আলদার কোসে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। আর কার মাথায় এমন বুদ্ধি খেলবে? আমাদের সবার হয়ে শোধ নিয়েছে কিপটে বুড়োর কাছে। ভাল মাথা খাটিয়ে বার করেছে 'হাওয়া যা এনেছে হাওয়াই তা নিয়ে যাক...' তুমি, বাই, হাউমাউ কোরো না, যত জিনিসপত্র তুমি নিয়েছ অন্যের থেকে তাতে তোমার এখনও বহুদিন চলবে!'

গোমড়ামুখে চুপ করে বসে রইল বাই। কেবল হতাশমনে মাথা চুলকাতে ইচ্ছা হল। মাথায় হাত দিল। আরে! ঘা তো আর নেই! সব সেরে গেছে। মোলায়েম টাকমাথা হয়ে গেছে আবার! বিশ্বাস কর চাই না কর আলদার কোসে বাইয়ের মাথার ঘা সত্যিই সারিয়েছিল।
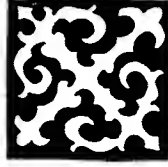
কেমন করে আলদার কোসে দরিদ্র যুবকের বিবাহ দিল

এক বাই ছিল। বোকার হদ্দ কিন্তু নিজেকে ভাবত এক বিরাট সংগীতজ্ঞ বলে। যখন সে গাল ফুলিয়ে, চোখ বড় বড় করে বাঁশীতে কোন সুর তোলার চেষ্টা করত তখন লোকে গ্রাম ছেড়ে পালাত আর কুকুররা এমন ডাকতে আরম্ভ করত যেন কাছেই নেকড়ের পালের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু বাইয়ের ধারণা দুনিয়ায় আর কেউই তার মত এমন বাজাতে পারে না।

ঐ বাইয়ের ছিল এক সুন্দরী মেয়ে। তার প্রেমে পড়ল বীর যুবক মালিক। কিন্তু মালিকের ধনসম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না, এদিকে বাই মেয়ের জন্য দাবী করেছে বিরাট কলীম*। একদিন ভীড়ের মধ্যে মেয়েকে মালিকের সঙ্গে দেখে রেগে চীৎকার করে বলল বাই:

'এই বেহায়া ছেলে, দূর হয়ে যা গ্রাম থেকে, আর যেন কখনও আমার চোখে না পড়িস! গরীবের সঙ্গে ধনীর মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। আমার মেয়েকে তোর হাতে তুলে দিতে পারি কেবল তখনই যখন আমি মরতে বসব আর তুই আমার জীবন ফিরিয়ে আনবি!'

মনের দুঃখে যুবকটি স্তেপের দিকে চলল, সেখানেই তার দেখা হল আলদার কোসের সঙ্গে।

'অমন মুখভার কেন, ভাই?' জিজ্ঞাসা করে আলদার কোসে। 'নাকি সূর্য পৃথিবীকে দিচ্ছে না উত্তাপ, জীবজন্তুকে যোগাচ্ছে না খাদ্য?'

মালিক তাকে বলল সব কথা মন খুলে।

'মন খারাপ কোরো না,' বলল আলদার কোসে, 'মেয়েটি তোমারই স্ত্রী হবে। আমার ওপর ভরসা রাখ। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নরম ঘাসে শুয়ে বিশ্রাম নাও, আর আমি ঘুরে আসি বাইয়ের কাছ থেকে।'

এমন অতিথির আশা করে নি বাই।

'কি জন্য এসেছিস?'

নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে আলদার বলল:

---

* কলীম — বিয়ের পণ। — সম্পাঃ

'আপনার কাছে এসেছি, মহাসম্মানিত বাই, এক অনুরোধ নিয়ে!'

'অনুরোধ নিয়ে!' ভ্রূ কুঁচকে গেল বাইয়ের, 'কি অনুরোধ?'

'সাহস করে বলি তাহলে, আমার অনুরোধ আমাকে একটু বাঁশী বাজিয়ে শোনান বাই-আগা!'

খুশী হয়ে উঠল বাই।

'তুই, আলদার কোসে, দেখছি মোটেই বোকা নস আর বেশ মানমর্যাদা বুঝিস। আয়, ভেতরে আয়। শুব খুশীমনেই বাজিয়ে শোনাব তোকে। তুই স্তেপময় ঘুরে বেড়াস, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন ধরণের লোক দেখেছিস। আমার বাজান শুনে বল দেখি আর কোথাও কেউ এমন করে বাজাতে পারে নাকি?'

যতক্ষণ বাই কথা বলছিল ততক্ষণে আলদার ইয়ুরতার ভিতরটা ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়েছে। চারিপাশেই গালিচা, তাকিয়া, রেশম-মখমল, দেয়ালে ঝুলছে দামী ঘোড়ার সাজ, আর বিছানার মাথার দিকে রয়েছে একটা খোদাই করা বাক্স, ভারী তালা ঝুলছে তাতে।

'ঐ বাক্সটা না নিয়ে নড়ব না এখান থেকে,' ভাবল আলদার, 'ওতেই বাইয়ের টাকাকড়ি আছে।'

বাই ওদিকে বাঁশীটা নিয়ে মুখের কাছে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে ফুঁ দিল। বাঁশী থেকে কানফাটান এক আওয়াজ বেরিয়ে এল, অমনি লোকেরা ঘরদোর ফেলে দৌড় দিল, কুকুরগুলো প্রচণ্ড চীৎকার আরম্ভ করে দিল। বাজিয়ে চলেছে বাই আর শুনছে আলদার উচ্ছ্বসিত হয়ে, শুনছে আর জিভে চুকচুক করে আওয়াজ করছে।

'কেমন?' বাজান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল বাই।

'বাই গো,' জামার খুঁট দিয়ে চোখের জল মোছার ভান করে আলদার বলল, 'এমন চমৎকার সুর শুনে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি এই পৃথিবীতে আছি, মনে হচ্ছিল যেন বেহেস্তের হুরীরা গান করছে আমার আশে পাশে। সত্যিই আপনি অপূর্ব সংগীতবিদ!'

খুশী হয়ে বাই দাড়িতে হাত বোলাল।

'তোকে আমার ক্রমশঃ বেশী করেই ভাল লাগছে রে আলদার,' বলল বাই, 'তোকে উপহার দেব আমার পুরান আলখাল্লাটা!'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, প্রতিভাবান বাই, কিন্তু,' বলে চলল আলদার, 'রাগ করবেন না আমার কথায়: আমি জানতাম একজনকে যে আরও ভাল বাজাত।'

ভ্রূ কুঁচকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল বাই অতিথির দিকে।

'তার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে শুনি?'

'সে,' গোপন কথা বলার ভাবে বলল আলদার, 'চোখ বন্ধ অবস্থায় তিনঘণ্টা বাঁশী বাজাতে পারত।'

'এই কথা?' হা-হা করে হাসতে লাগল বাই। 'আমি পাঁচঘণ্টাও বাজাতে পারি নিজের

আঙুলের দিকে না তাকিয়ে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আমার চোখগুলো বেঁধে দে রুমাল দিয়ে।'

আলদার দেরী করল না একটুও। চোখবাঁধা অবস্থায় বাই আগের চেয়েও আরও বেশী ভাল করে বাজাবার চেষ্টা করতে লাগল। লোকেরা গ্রামের থেকে আরও দূরে পালিয়ে গেল, কুকুরগুলো আরও মরীয়া হয়ে চীৎকার করতে লাগল। ওদিকে আলদার চাদরের ওপর সতর্ক পা ফেলে ফেলে বাক্সটা তুলে কাঁধে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেল ইয়ুরতা ছেড়ে।

একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজিয়েই চলল বাই যতক্ষণ না একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

'কি রকম লাগল, আলদার?' জিজ্ঞাসা করল বাই হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে।

কিন্তু কোন উত্তর নেই।

চোখের বাঁধন খুলল বাই, তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল হাউহাউ করে: ইয়ুরতাতে আলদারও নেই, নেই তার প্রাণের ধন বাক্সটাও।

বাইয়ের ইয়ুরতার চারপাশে লোক জড় হল, হিহি করে হাসতে লাগল তারা বলাবলি করতে লাগল:

'ফুঁ দিয়ে উড়াল বাই সব টাকাকড়ি!'

সারা রাত ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল বাই:

'হায়! হায়! এবার গেলাম আমি! মরে গেলাম! শেষ হয়ে গেলাম!'

সকালবেলায় মালিক এসে হাজির হয় তার সামনে, বিনাবাক্যব্যয়ে তার সামনে রাখে বাক্সটা।

এক মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল যেন বাই। বাক্সর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চাবি দিয়ে ডালা খুলে দেখে বাক্সটা কানায় কানায় ভর্তি টাকায়। কাঁপা কাঁপা হাতে গুণতে লাগল বাই টাকাগুলো: সব ঠিক আছে।

'মালিক, বাছা আমার,' আনন্দে কেঁদে ফেলে বলল বাই, 'তুই আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিস! আমার মেয়েকে দিলাম তোকে। কিন্তু যৌতুক পাবার আশা করিস না। কিছু পাবি না। কেবল তোকে দিতে পারি আমার বাঁশীটা। ভাল বাঁশী! যত চাস, বাজা। সুখে থাক্। ওটা আর দরকার নেই আমার।'

এইভাবে মালিক বিয়ে করল বাইয়ের মেয়েকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাই জানতে পারে নি কি করে মালিকের হাতে পেঁছাল বাক্সটা। কিন্তু আমরা তো তা ভাল করেই জানি।

কেমন করে আলদার কোসে ছেঁড়া পোশাক বদল করল

কনকনে শীত, ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস বরফ উড়িয়ে আনছে — ভয়ংকর হিউত মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী। এমন শীতে জীবজন্তুর কষ্ট, মানুষেরও কষ্ট; ঘরে ঠাণ্ডা, বাইরে তো কথাই নেই ভয়ংকর তুষার ঘূর্ণি ঝড়ে যখন নিজের ঘোড়ায় বসে ঘোড়ার মাথাটাও দেখা যায় না, এমন সময় আলদার চলেছে তুষারের উপর দিয়ে তার রুগ্ন ঘোড়াটায় চড়ে। কখনও জমা তুষারের মধ্যে ঘোড়ার পা বসে যাচ্ছে, কখনও বা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, যতই কেন তাড়াও না তাকে জোরে সে ছুটতে পারে না মোটেই।

আলদারের মাথায় একটা ছেঁড়া টুপি, গায়ে ছেঁড়া আলখাল্লা, পায়ে সাতপুরোন জুতো। শীতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারী, গুটিশুটি হয়ে বসে হাতে ফুঁ দিয়ে গরম করার চেষ্টা করছে, গালমন্দ করছে এই ঠাণ্ডা, এই পথ সবকিছুকে কিন্তু তবু ভেঙে পড়ছে না একেবারে।

'কেবলমাত্র মরামানুষই সব আশার বাইরে চলে যায়।' ভাবে আলদার।

এই কথা ভাবামাত্রই তার চোখের সামনের তুষারের পর্দাটা ছিঁড়ে গেল হাওয়ায় আর দেখা গেল একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে চলেছে স্তেপের মধ্যে দিয়ে। কেমন চমৎকার চলেছে ঘোড়াটি, নিশ্চয়ই ভাল জাতের হবে। অমন ঘোড়া বাই ছাড়া আর কার হতে পারে। খুশী হল আলদার:

'মনে হচ্ছে আমার ভাগ্য খুলে গেছে। নেকড়ে নিজে থেকেই ফাঁদে পড়ে।'

টুপিটা মাথার পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে, আলখাল্লার বুকের কাছটা খুলে দিয়ে, লাগাম ছেড়ে জোরে গান ধরল, যেন কোন তাড়াহুড়োই নেই তার।

লোকটি কাছে এসে পড়ল। আলদার বুঝল সে ঠিকই আন্দাজ করেছে: চমৎকার চকচকে দামী ঘোড়ার উপর শোভা পাচ্ছে দামী লোমের কোটপরা বাইয়ের মোটা, ভুঁড়িওয়ালা দেহটা।

'কি হল্লা করছিস ?' ঘোড়ার গতি একটু কমাল বাই, 'ঠাণ্ডায় মাথাখারাপ হয়ে গেল নাকি ?'

'একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না আমার,' খুশীভরা উত্তর আলদারের, 'সত্যি কথা বলতে কি এমন টাটকা বাতাস আমার ভালই লাগছে। তা নাহলে গরমে শেষ অবধি মরেই যেতাম।'

'বাজে কথা বলিস না !..' থামিয়ে দিল তাকে বাই। 'আমার এই গরম কোট তাতেই আমার হাড় পর্যন্ত জমে গেছে। তোর ঐ ছেঁড়া কাঁথাকানি কি এর থেকেও বেশী গরম দেয় নাকি ?'

'ওগো ভালমানুষের ছেলে,' তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল আলদার, 'তুমি হয়ত তেমন বোকা নও, কিন্তু বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই দেখছি। তুমি কি আন্দাজ করতে পার নি আমার আলখাল্লাটা কি ধরণের ?'

'তা জানার জন্য আবার অভিজ্ঞতার কি দরকার,' প্রচণ্ড রেগে গেছে বাই, 'তোর আলখাল্লায় যদি একশ'টা তাপ্পি না থাকত তো বলতাম ওতে দু'শোটা গর্ত আছে।'

'কি নির্বোধের মত কথা বলছ, বাই,' তিরস্কারের ভঙ্গীতে চোখ কুঁচকে তাকাল আলদার। 'অন্ধ লোকের কাছে সারা পৃথিবীটাই অন্ধকার। তুমি আমার আলখাল্লায় দেখেছ অনেক গর্ত কিন্তু বুঝতে পার নি যে ঐ গর্তগুলির মধ্যে জাদু শক্তি খেলে বেড়াচ্ছে। এ আলখাল্লা সাধারণ আলখাল্লা নয়; এ হল জাদুআলখাল্লা। এই হাওয়া, হিম আমায় কিছু করতে পারবে না: হাওয়া একটা গর্ত দিয়ে ঢুকে অন্য গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আমার এই অতুলনীয় আলখাল্লায় শীতকালেও গ্রীষ্মকালের মতই গরম লাগে।'

শুনছে বাই আর তার মুখের হাঁ ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

'আলখাল্লা বটে !' ভাবল বাই, 'কি করে ওটা নিয়ে নেওয়া যায় ঐ আহাম্মকটার কাছে...'

'দারুণ তোমার লোমের কোটটা,' ওদিকে আলদারও ভাবছে, 'কিন্তু ওটা থাকবার নয় তোমার গায়ে যেমন ফুটো বালতিতে জল থাকতে পারে না।'

খানিক চুপ করে থেকে, শীতে জমে যাওয়া নাক টেনে বাই হঠাৎ বলে বসল:

'বদল করবি ? আমি তোকে দেব এই লোমের কোটটা আর তুই আমায় দিবি তোর জাদু আলখাল্লাটা।'

'আলখাল্লাটা দিয়ে দেব ?' বিদ্রূপের ভাব নিয়ে বাইয়ের আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ্য করল আলদার, তারপর টুপিটা মাথা থেকে খুলে নাড়িয়ে হাওয়া খেতে লাগল, বলল, 'না হে চাঁদ, শুধু শুধু ঠাট্টাতামাসায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তুমি বরং তাড়াতাড়ি করে বাড়ী ফিরে যাও, নাহলে ঐ লোমের কোটে একেবারে জমে যাবে।'

আরও বেশী লোভ জাগল বাইয়ের মনে।

'যদি শুধু কোটে না হয় তো তার সঙ্গে টাকাও দেব। এখন স্তেপে খাদ্যের অভাব। হাতে পয়সা থাকলে না খেয়ে মরবি না।'

'টাকা দিয়ে কি হবে আমার, যার চিন্তাভাবনা নেই সে কেবল জল খেয়েও মোটা হয়।'

'কথা রাখ,' ধরাধরি করতে লাগল বাই, 'সেই সঙ্গে ঘোড়াটাও দিচ্ছি। দেখ, কেমন ঘোড়া,

আমার পালের সেরা ঘোড়া। আলখাল্লা খোল — কোটটা পর, ঐ ঘোড়াটা থেকে নেমে আমারটাতে বোস্‌। নে, আর দেরী করিস না।..'

'জ্ঞানী লোক যতক্ষণ চিন্তা করে কোন কাজ সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প লোক ততক্ষণে করে ফেলে কাজটা।' আলদারের চেয়ে বেশী স্থিরসঙ্কল্প আর কে আছে? পাঁচ মিনিটও কাটল না দেখা গেল তুষারের ওপর দিয়ে বাইয়ের ঘোড়াটা ছুটে চলেছে আলদারকে নিয়ে, লোমের কোটে শরীরটা গরম হয়ে উঠেছে।

'কোথায় পেলি এমন লোমের কোট? এমন ঘোড়া?' পরে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

আলদার কেবল হেসে বলেছে:

'সেই বাই-ই তোমাদের তা বলুক, যার অমন লোভ হয়েছিল আমার ছেঁড়া আলখাল্লাটার জন্য। আমি কেবল একটা কথা জানি, 'উটের মত বিশাল চেহারা থাকার চাইতে অন্ততঃ এক ফোঁটাও বুদ্ধি থাকা ভাল।'

কেমন করে আলদার কোসে তিন দৈত্যকে কাবু করল

সে বছর গ্রীষ্মকালে স্তেপে বেশ শান্তি বিরাজ করছে: না শত্রু আক্রমণ, না অন্তর্যুদ্ধ, না গরুচুরি কিছুই নেই। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই বিপদ এসে হাজির: বরফঢাকা পাহাড়ের ওপাশের কোন দূরের দেশ থেকে এসে পড়ল তিন দৈত্য। পাহাড়ের নীচে বিরাট ইয়ুরতা খাটাল তারা তারপর চিন্তা করতে লাগল কি খাওয়া যায়।

চিন্তা করারই বা কি আছে, খাবার তো আছে হাতের কাছেই:

ঘোড়া চরে উপত্যকায় — কি মজা!
ভেড়া চরে ঘাসে ঘাসে — কি মজা!
ছাগল লাফায় পাহাড়ে — কি মজা!
গরু ঘুমায় পাহাড়ঢালে— কি মজা!

গরু ঘোড়ার পালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাদের গিলতে লাগল দৈত্যরা। গরুভেড়া চীৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল, রাখালরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের বাঁচাতে, কিন্তু দৈত্যদের সঙ্গে তারা পারবে কেন? দৈত্যরা ওদিকে পেটভরে খেয়ে খেলতে আরম্ভ করে দিল: হাজার হাজার বছরের পুরনো শিলা, হাজার হাজার মণ ওজনের পাথর মাটি থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় ফেলতে লাগল।

তাদের এই খেলায় আর্তনাদ করতে লাগল পৃথিবী, ঢেউ উঠল জলে, জীবজন্তুরা তাদের আস্তানা ছেড়ে, পাখীরা তাদের বাসা ছেড়ে পালাল।

যত গ্রামের মোড়লরা একজোট হয়ে ভাবতে লাগল কি করে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, কি করে শান্ত করা যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন...

যতক্ষণে তারা ভাবছে বসে আলদার ততক্ষণে কাজ সারছে। জামাজুতো পরে, লাঠি হাতে নিল আর পথে খাবার জন্য সঙ্গে নিল এক থলি টাটকা ছানা। চলল সোজা পাহাড়ের দিকে যেখানে দৈত্যরা তাঁবু গেড়েছে।

পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল তারা বলতে লাগল:

'আলদার শুধু শুধু মরবি কেন, ফিরে আয়... চল আমাদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বাঁচি।'

উত্তরে হাসে আলদার হা-হা করে:

'ঘাস নড়লেই ভয়ে মরে খরগোস, আর বীর সম্মানের মৃত্যু বরণ করে।'

'দৈত্যদের দেখলেই অন্য কথা বেরোবে তোর মুখ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে কেঁচো হয়ে যাবি।'

আলদারের এক কথা:

'যদি ভীরু অনেকদিন ধরে তাড়া খায় তো সেও সাহসী হয়ে ওঠে, দুর্বলকে যদি ভাল করে রাগিয়ে দেওয়া যায় তো সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

'শুধুমাত্র সাহস নিয়ে দৈত্যদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। আর তাদের সমান শক্তি দুনিয়াতে আর কারো নেই।'

'পাথর দিয়ে মাথা ভাঙা যায় আবার মানুষের হাতই সে পাথর ভাঙে, তা জান তোমরা? দৈত্যরা কিছুই করতে পারবে না আমার কারণ সব পালোয়ানের মাথার কিছু গোলমাল থাকে।'

চলেছে তো চলেছেই আলদার কোসে। ঐ যে বরফঢাকা পাহাড়চূড়া চোখে পড়ে। পাহাড়ের দিক থেকেই যেন একটা চলন্ত পাহাড়ের মত তার দিকে এগিয়ে আসছে একটা দৈত্য।

দৈত্যকে দেখে ভয়ে আলদারের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনে বলল:

'ভীরু মরে হাজারবার আর সাহসী — একবার। আমার তো ক্ষতি হবার কিছুই নেই, ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়...'

দৈত্যটা থেমে পড়ে কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করতে লাগল মানুষটাকে। আলদারও থেমে পড়েছে — লক্ষ্য করছে দৈত্যকে — কেবল নীচ থেকে ওপরে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এমন হা-হা করে হেসে উঠল: 'হা-হা-হা! হা-হা-হা!'

দৈত্য জীবনে কখনও শোনে নি মানুষের হাসি।

'কি বলছিস?' বলল সে।

'বলছি না কিছুই। হাসছি তোকে দেখে।'

'হাসছিস? আমায় দেখে হাসি পেল কেন?'

'তোকে বড় দুর্বল মনে হল রে, দৈত্য।'

'তুই কি আমার চেয়ে বেশী শক্তি ধরিস নাকি?'

'বেশী শক্তি কিনা জানি না কিন্তু পাথর নিংড়ে জল বার করতে পারি।'

বলে নীচু হল আলদার যেন পাথর কুড়োবে, আগে থেকেই হাতের মুঠোয় লুকোন ছিল ছানার ডেলা একটা। ছানার ডেলাটায় খুব করে চাপ দিল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

'দেখি তো, দৈত্য, তুই এবার এমনি কর!'

দৈত্য একটা পাথর তুলে নিল, চাপ দিতে লাগল প্রথমে এক হাতে, তারপর দু'হাতে, চেষ্টা করে চলল অনেকক্ষণ ধরে, সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠল, কিন্তু পাথর থেকে জল আর বেরোয় না কিছুতেই। পাথরটা ফেলে দিয়ে বলল:

'দেখছি তুই সত্যিই শক্তি ধরিস। ঝগড়াঝাঁটি করে আমাদের লাভ কি? চল আমার সঙ্গে। আমাদের অতিথি হবি তুই।'

দৈত্যদের ইয়ুরতার কাছে পৌঁছল তারা। ইয়ুরতা বটে। তিন দিন ধরেও গাড়ীতে তাকে একপাক দেওয়া যাবে না, ঘোড়ায় চড়ে একদিনেও পাক দেওয়া যাবে না।

ভেতরে ঢুকল তারা। আলদার কোসে সসম্মানে অভিবাদন জানাল আর দৈত্যটা ওদিকে তার শক্তি, বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আলদারকে সম্মানের আসনে বসিয়ে দৈত্যরা উল্টান পাহাড়ের মত একটা বিরাট কড়াই থেকে ষাঁড়ের মাংস নিয়ে রাখল আলদারের সামনে।

আলদার খেতে চাইল না:

'সকালবেলায় পেটভরে খেয়ে নিয়েছি আমি। একশ'টা ষাঁড়, হাজারটা ভেড়া সাফ করেছি। তোমরা নিজেরা খাও, গায়ে জোর আন, তা নাহলে তোমাদের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়, বেচারীরা...'

খেতে আরম্ভ করে দিল দৈত্যরা, এক মুহূর্তে ফাঁক হয়ে গেল বিরাট কড়াইটা। পেটভরে খেয়েদেয়ে দৈত্যরা অতিথিকে ডাকল খানিক খেলাধুলা করার জন্য।

আলদার কোসে বলল, 'যদি খেলা ঠিক ঠিক আইনমাফিক হয় তো সে খেলা খেলতে ভালবাসি আমি, কিন্তু যে আমাকে খেলায় বোকা বানাতে চেষ্টা করবে সে ভাল শিক্ষা পাবে!..'

'ভেবো না, আমাদের খেলার মধ্যে কোন চালাকি নেই: যে সবচেয়ে ভারী পাথর তুলে সবচেয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারবে সেই জিতবে।'

প্রথম দৈত্য ইয়ুরতার আকারের একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে ফেলল অনেক দূরে, দ্বিতীয় দৈত্য আরও বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে আরও দূরে ছুঁড়ে ফেলল, তৃতীয় দৈত্য আরও বড় একটা পাথর নিয়ে আরও দূরে ছুড়ে ফেলল।

আর্তনাদ করে উঠল পৃথিবী, জলে ঢেউ উঠল, কালো ধুলোর মেঘ উঠল আকাশ পর্যন্ত।

'এবার তোমার পালা শক্তি দেখানর,' আলদারকে বলে দৈত্যরা।

আলদার হাই তুলে, আড়ামোড়া ভেঙে অলসভাবে পিঠ চুলকে বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বলল:

'এ আবার খেলা নাকি? গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কড়ি খেলাই তোমাদের মানায়। আমার মতে ছুঁড়তেই যদি হয় তো পাথর কেন গোটা পাহাড়টা ছোঁড়াই ভাল।'

'পাহাড় ?!' চোখ কপালে উঠল দৈত্যদের।

'হ্যাঁ পাহাড়,' জোর দিয়ে বলল আলদার, 'কেবল বুঝে ভেবে বল দেখি কোন দিকে ফেলা যায় পাহাড়টাকে। যদি ছুঁড়ি পূর্বদিকে তো দিন আসার পথ বন্ধ করে দেবে পাহাড়টা, চিরকালের মত নেমে আসবে রাত; যদি পশ্চিমদিকে ছুঁড়ি তো রাত আসার পথ বন্ধ করে দেবে চিরকালের মত দিন নেমে আসবে পৃথিবীতে। উত্তর দিকে? ঠান্ডা হাওয়া আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে: জীবজন্তু গাছপালা প্রচন্ড গরমে মরে যাবে। দক্ষিণে যদি ছুঁড়ি তো উষ্ণ হাওয়া আসার পথ যাবে বন্ধ হয়ে, পৃথিবী ঠান্ডায় জমে যাবে। একমাত্রই উপায় আছে — পাহাড়টা উপর দিকে ছুঁড়ে দেব আমি!'

তিন দৈত্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল আলদারের পায়ে:

'তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী তা স্বীকার করে নিচ্ছি আমরা কেবল ওপরে ছুঁড়ো না পাহাড় !'

'না,' জেদ দেখায় আলদার, 'অমন স্বীকার করায় কাজ নেই আমার। আমার পালা এবার। যেদিকে চাই সেদিকেই ছুঁড়ব পাহাড়টা।'

'হুজুর,' কেঁদে পড়ল দৈত্যরা, 'পাহাড় নিয়ে যা মন চায় কর কেবল তার আগে আমাদের ফিরে যেতে দাও নিজেদের রাজ্যে।'

'হায়, হায় এ কি কথা !' তিরস্কার করতে লাগল আলদার দৈত্যদের, 'তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ আইনমাফিক খেলতে। তোমাদের মানসম্মান জ্ঞান নেই নাকি ? কথায় বলে, 'শৌর্যবান যে সে কখনও কথার খেলাপ করে না।' তোমাদের কথা দেখছি ছাইয়ের মত: যেদিকে হাওয়া নিয়ে যায় সেদিকেই ওড়ে... যাক্। যদিও তোমরা কথা রাখ নি তবুও তোমাদের যেতে দিচ্ছি আমি যেদিকে তোমাদের খুশী। আমাদের প্রথাই তাই: নিজের পিতার যে দোষ ক্ষমা করি না আমরা — পরদেশীকে তা ক্ষমা করি। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর ! হাতের প্রতিটি শিরা কাঁপছে আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে আকাশের দিকে পাহাড় ছোঁড়ার !'

বলে আলদার জামার হাতা গোটাতে লাগল। হাতা গোটান সামান্য সময়ের ব্যাপার, কিন্তু হাতা গোটান শেষ হল যখন তখন দৈত্যদের আর চিহ্নও নেই মোটে।

গ্রামের বুড়োরা ওদিকে তখনও ভ্রূ কুঁচকে চিন্তাই করে চলেছে:

'আস্সালামু আলায়কুম, জ্ঞানী বৃদ্ধরা !' হঠাৎ তারা শুনল আলদারের খুশীভরা কণ্ঠস্বর, 'যদিও আমার মত লোকের এমন সম্মানিত ব্যাক্তিদের সভায় এসে ঢোকা উচিত নয় তবু কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যে জুতো পায়েই জলে নামতে হয়। আর ভাবতে হবে না। বখশিশ দিন। ভয়ংকর দৈত্যগুলো ভেগেছে।'

মোড়লরা রেগে দাড়ি নাড়িয়ে বলল:

'কি বকছিস রে, বেহায়া ছেলে ! ঠাট্টা করার আর সময় পেলি না !'

আলদার কোসে হাসতে থাকে:

'গরীব যাই বলে — তাই মিথ্যা ? শুনে যদি বিশ্বাস না হয় — নিজের চোখে দেখ গিয়ে !'

মোড়লরা বেরিয়ে দেখে চারদিকে আনন্দ হৈ-হল্লা, গান-বাজনা আমোদ চলছে। স্তেপে আবার শান্তি ফিরে এল।

ঘোড়া চরে উপত্যকায় — কি মজা।
ভেড়া চরে ঘাসে ঘাসে — কি মজা !
ছাগল লাফায় পাহাড়ে — কি মজা !
গরু ঘুমায় পাহাড়ঢালে — কি মজা !
ককপেক ঘাসেই উটের দিন কাটে ভালো।
গ্রামের মানুষ গ্রামেই থাকে ভালো।

কেমন করে আলদার কোসে

বাইকে গাধার চাষ করতে শেখাল

যার ঘোড়া কেনার ক্ষমতা নেই তার কাছে গাধাই যথেষ্ট। গরীব কামালের এমনকি একটা গাধাও নেই। তাই অনেক অনুরোধ-উপরোধের পরে তার আত্মীয় যখন শহরে কাঠ বেচতে যাবার জন্য তিনটি গাধা ধার দিল তখন এমন আনন্দ হল কামালের যে মনে হল যেন সুলতানের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে।

'গাধাগুলোর কিছু হলে ধড়ের ওপর মাথা থাকবে না তোর, আর গাধাগুলোর বদলে তিনমাস আমার কাছে কাজ করতে হবে তোকে।'

গাধাগুলোর পিঠে সাকসাউল কাঠের বোঝা চাপিয়ে খুশী মনে রওনা দিল কামাল।

শহরে যাবার পথ অনেক দূর। গাধাগুলোর পিছন পিছন যেতে যেতে ভাবে কামাল:

'যদি কাঠের জন্য ভাল দাম পাই তো একটা ভেড়ী কিনব। যার অন্তত একটাও ভেড়ী আছে সে আর নিঃস্ব নয়। বউ ভেড়ী দুয়ে বাচ্চাদের খেতে দেবে। তারপর ভেড়ীটা একটা, দুটো, তিনটে বাচ্চা দিলেই রান্নায় একটু ঘি-মাখন পড়বে, পশম হবে তাঁবুতে ঢাকা পড়বে... এক সময়ে ঘোড়াও হবে, আর ঘোড়া হল পুরুষমানুষের পাখনার মতন। পায়ে হেঁটে-চলা লোক আর ঘোড়ায়-চড়া-লোকের মধ্যে পার্থক্য সুস্থ ও অসুস্থের মধ্যে পার্থক্যের মতই। ঘোড়ার উপর বসব মানুষের মত মানুষ হব। তখনই কামালের জীবনের সুখের শুরু হবে।..'

নিজের স্বপ্নে এমন বিভোর ছিল বেচারী যে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেছে, লক্ষ্যও করে নি যে সামনে এক জলাভূমি। জায়গাটার পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তার কিন্তু গাধাগুলোকে সোজা চালিয়ে দিয়েছে সে।

তখনই ঠিক বিপদ ঘটল: গাধাগুলো কাদার মধ্যে ডুবে গেল, প্রথমে পেট পর্যন্ত তারপর গলা পর্যন্ত। তাদের বাঁচাবার জন্য কামালও ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একটু হলে সে নিজেই ডুবে যেত: ভাগ্যবলে উঠে আসতে পারল সেই জলকাদা থেকে। তাড়াহুড়োর মধ্যে তুলে আনতে পেরেছে কেবল গাধার পিঠে বাঁধা থলিটা। কিন্তু গাধাগুলোর কাছে পেঁছবার কোন উপায়ই নেই: কেবলমাত্র তিনটি মাথা দেখা যাচ্ছে।

জলাভূমির চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল কামাল, সাহায্যের জন্য হাঁক পাড়তে লাগল: কিন্তু সব বৃথা আশপাশে কারুর কোন সাড়াশব্দ নেই...

এদিকে আঁধার নামছে। মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করে বলে উঠল বেচারা:

'হায় কপাল, আমার মৃত্যু আসে না কেন!'

বলামাত্রই শুনতে পেল গলার স্বর:

'কি চাই তোমার, মানুষ?'

ভয়ে হিম হয়ে গেল কামাল: কি হবে এখন? মাথা তুলে দেখে চমৎকার ঘোড়ায় একজন লোক বসে।

ভয়ে কোনরকমে বিড়বিড় করে কামাল বলল, 'নির্বোধ কামালকে মাফ করে দাও মৃত্যু, নিয়ে নিও না জীবনটা। জলাভূমি থেকে গাধাগুলোকে টেনে তুলতে সাহায্য কর বরং।'

'কোন গাধাগুলোর কথা বলছিস? খুলে বুঝিয়ে বল দেখি কি হয়েছে তোর।'

সব ঘটনা বলল কামাল, তারপর আবার মিনতি করে, 'আমার প্রাণটা নিয়ে নিও না, মৃত্যু, বউ ছেলেদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে দাও। বাড়ী যেই ফিরব অমনিতেও আমার আত্মীয় আমার গলা কেটে ফেলবে গাধাগুলোর জন্য।'

হা-হা করে হেসে উঠল ঘোড়ার উপরে বসে থাকা লোকটি:

'হায় রে কামাল! তুই আমায় চিনতে পারলি না! মৃত্যু নয়, আমি হলাম—আলদার কোসে। আমি দেখছি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। দুঃখ করিস না, ভাই। সকালের আলোয় পথ ভালো দেখা যায়।'

ঘোড়া বেঁধে রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তারা।

ভোর হতেই লাফিয়ে উঠল আলদার, কামালের কিন্তু ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণই: গালে হাত দিয়ে বসে বিষণ্নমনে তাকিয়ে আছে জলাভূমির দিকে—রাতে গাধাগুলোর মাথাও ডুবে গেছে, বেরিয়ে আছে কেবল তিনজোড়া কান।

মুখে খই ফোটান পছন্দ করে না আলদার।

'স্তেপে যা,' কামালকে নির্দেশ দেয়, 'তোর থলি ভরে তুলে নিবি খরগোসের বিষ্ঠা, নিয়ে চটপট ফিরে আয়।'

অল্পক্ষণ পরেই থলিভরতি করে ফিরে এল কামাল।

এবার আলদার বলে, 'আমার ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর দিকে যা ধীরে ধীরে। দেখিস থলিটা হারাস না যেন! তুই আদ্ধেকটা পথ যাবার আগেই থলির বিষ্ঠা পরিণত হবে টাকায়। বিশ্বাস হচ্ছে না? যদি আমার কথা সত্যি না হয় তো আমার ঘোড়াটা তোর হয়ে যাবে। আর যদি সত্যি হয় তাহলে এমন সাফল্যের জন্য তোকে ভোজ দিতে হবে, মনে রাখিস।'

আলদারের কথার অর্থ বুঝল না কামাল। ঠাট্টা করছে না সত্যি কথা বলছে? বিষ্ঠা কি করে টাকায় পরিণত হতে পারে? আলদার কোসে জাদু জানে নাকি? কত কথাই শোনা যায় তার সম্বন্ধে কিন্তু এমন কথা তো কখনও শোনা যায় নি!

দিশাহারা, উৎকণ্ঠিত কামাল রওনা দিল।

আর আলদার যেখানে গাধাগুলো ডুবে গেছে সেখানে জলার ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সবাই জানে আলদার অপেক্ষা করছে যখন কোন কিছু ঠিক পাবেই সে।

সত্যিই: তখনও ভোরের শিশির শুকিয়ে যায় নি, ইতিমধ্যেই শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি, উটের, ঘোড়ার, গরুর, ভেড়ার ডাক, মানুষের কথাবার্তা, কুকুরের ডাক, ধনী পর্যটকের দল এগিয়ে আসছে স্তেপ দিয়ে। সবার আগে ঘোড়ার উপরে বসে রেশমী আলখাল্লা পরা বাই চলেছে আর পিছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে নিজের গরুঘোড়ার পালের দিকে।

আলদার কোসের কাছে এসে পৌঁছল দলটি।

'নির্বোধের মত স্তেপের মাঝে বসে আছিস কেন ?'

আলদারের উত্তর: 'সেই নির্বোধ যে দেখেও দেখে না আর যা দেখে সে সম্বন্ধে ভাবে না। তুমিই বল বাই, আমাদের মধ্যে কে নির্বোধ। আর যদি ভালয় ভালয় বলতেই হয় তো আমি অমনি অমনি বসে নেই এখানে — এখানে বসে আমি পাহারা দিচ্ছি আমার ফসল।'

'কি বীজ পুঁতেছিস এখানে ?'

'ঐ যে চারা একটু বেরিয়েছে, লক্ষ্য করে দেখলে নিজেই বুঝবে বোধহয়,' বলে আলদার জলাভূমির দিকে দেখিয়ে দিল।

দেখল বাই, চোখ কপালে উঠল তার, চোখ রগড়ে নিল।

'গাধার কান ? গাধার কান বেরিয়ে আছে কেন কাদামাটির ভেতর থেকে ?'

'আরে বাই ! তোমার সম্বন্ধেই লোকে বলে নাকি, 'ঘোড়া থাকার চেয়ে বুদ্ধি থাকা ভাল !' গাধার কানই হল আমি যা পুঁতেছি তার ফসল। গাধার চাষ করছি আমি। কালই কেবলমাত্র গাধার বীজ পুঁতেছি, আর আজই কেমন চারা গজিয়েছে !..'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে বাই তাকাল প্রথমে আলদারের দিকে, তারপর জলাভূমির দিকে।

'চল্লিশবছর বয়স হল আমার,' বলল সে, 'জানি লোকে চাষ করে তুলো, গম, যব। কিন্তু গাধার চাষের কথা... এই প্রথম শুনছি।'

'অবাক হয়ো না বাই, সবকিছু জানা সম্ভব নয়। 'আমি সব জানি' বলা আর 'আমি মরতে বসেছি' বলা একই কথা। আমিও, সত্যি কথা বলতে কি, আগে কিছুই জানতাম না এই গাধার বীজের কথা, তারপর আল্লাহ্‌র দোয়ায় একজন ভালমানুষের সঙ্গে দেখা হল আমার। তার নাম কামাল। বাগদাদ থেকে ফিরছে সে নিজের দেশে, সেখান থেকে সে নিয়ে এসেছে এক থলি এই অদ্ভুত বীজ। অত্যন্ত পরিশ্রম ও বিপদের মধ্য দিয়ে সে সংগ্রহ করেছে সেই বীজ। কাল এখানেই আমার দেখা হয় কামালের সঙ্গে, গল্প করতে লাগলাম আমরা, সে আমাকে দেখাল সেই বীজগুলি। দেখতে অদ্ভুত সেগুলি, জান, ঠিক যেন খরগোসের বিষ্ঠা। যাক ঘোড়ার দাম তার রঙে নয়, গতিতে। এক মুঠি বীজ চেয়ে নিলাম আমি কামালের কাছে, এই কাদামাটিতে পুঁতে দিলাম। ভেবেছিলাম, কিছু হবে না, আর দেখ দিকি এক রাতের মধ্যেই কি রকম বেড়ে

উঠেছে। একসপ্তাহ বাদেই আমার এক পাল গাধা হবে। ইচ্ছে হলে — বিক্রী করে দেব, নাহলে আমারই থাকবে। একটাই কেবল দুঃখ: গোটা থলিশুদ্ধ সব বীজ কিনে নেবার মত টাকা নেই। হাজারটাকা চেয়েছিল। খুবই সস্তায় দিচ্ছিল। হাজারটাকার থেকে পরে দশহাজার টাকা হত...'

'কপাল ভাল আলদারের,' ভাবে বাই, 'কিন্তু নিজের সবটা সৌভাগ্য তো ও ধরে রাখতে পারে নি। কামালের দেখা পেলে হত!'

মুখে বলল: 'আলদার, বুঝলি রে ভাই তুই যেমন করছিস তেমনি আমারও গাধার চাষ করার ইচ্ছে হচ্ছে। কেমন করে ঐ বীজগুলো পাওয়া যায়? কোন দিকে গেছে কামাল, বল দেখি? ওর ঘোড়াটা ভাল জাতের কি?'

'ওর ঘোড়াটা মন্দ নয়, কিন্তু তোমারটা আরও ভাল,' বলে আলদার কোসে। 'সোজা যেতে থাক, দুপুর নাগাদ ওর নাগাল পাবে। তাকে আমার হয়ে সালাম জানিও আর বোলো আমি ভাল আছি, সুস্থ আছি, আর সে যে ভোজ দেবে তাতে নিশ্চয়ই আসব।'

প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছোটাল বাই।

হাসতে থাকে আলদার:

'তুই, লোভী, যেমন করে খরগোসের বিষ্ঠার জন্য দৌড়াচ্ছিস, তোর দুর্ভাগ্য তোকে যেন তেমনি করেই খুঁজে ফেরে।'

ঠিক দুপুরবেলায় বাই থলিকাঁধে ঘোড়ায় চড়া একজন লোকের দেখা পেল।

তার সামনে এগিয়ে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল:

'তুই কামাল?'

'হ্যাঁ!' ভয়ে ভয়ে বলে কামাল।

'শোন কামাল, তোর থলি আর তোর সম্বন্ধে সব কথা জানি আমি...'

ভয়ে কামালের হাত পা সেঁধিয়েছে পেটের মধ্যে।

'আবার নতুন বিপদ — গরম কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়লাম,' ভাবে সে।

'কিনব তোর থলি!' বলে বাই, 'শুনলাম তুই ওটার জন্য হাজারটাকা চেয়েছিস? দরাদরি করব না। এই নে টাকা, দে থলিটা।'

কামাল কিছু বোঝবার আগেই দেখল তার হাতে রয়েছে টাকার থলি আর খরগোসের বিষ্ঠাভরা থলিটা চলে গেছে বাইয়ের ঘোড়ার পিঠে।

'বিদায় কামাল!' খুশীমনে বাই ঘোড়ার চাবুকটা নাড়িয়ে বলল। 'যখন আলদারের সঙ্গে দেখা হবে বলবি আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জ্বলুক সে রাগে যে বীজগুলো সে পায় নি, পেয়েছি আমি।'

কয়েকদিন বাদে কামালের নতুন, বড় ইয়ুরতাতে ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। এই সেদিনও সে গরীব ছিল, কিন্তু আজ তার বন্ধুদের আপ্যায়ন জানাবার মত অবস্থা হয়েছে।

ইয়ুরতা ভরে গেছে অতিথিতে, ইয়ুরতার বাইরেও পেতে দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্ম কাজ করা সাদা চাদর।

আলদার কোসেও এসে পেঁছিল, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাল কামাল।

'কি করে তোকে ধন্যবাদ জানাই আলদার,' জল ভরা চোখে বলল কামাল, 'তুই আমার জীবন রক্ষা করেছিস আমার পরিবারে সুখ এনে দিয়েছিস।'

'আমাকে কি জন্য ধন্যবাদ দিবি?' হেসে বলল আলদার, 'তোর হাতে তো আমার টাকা পড়ে নি। আর যদিও বাইয়ের কিছু টাকা গচ্চা গেল তা ওর জন্য দুঃখ করার দরকার নেই। ওর জানা দরকার 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।'

কামালের অতিথিদের বলল আলদার কোসে কেমন করে সে বোকা বানিয়েছে বাইকে, সবাই হো-হো হা-হা করে হাসতে লাগল।

পরের দিন সারা স্তেপের লোক বলাবলি করতে লাগল সে কথা, কেবল সেই বাই যে গাধার বীজ কিনেছিল সেই কিছু জানতে পারল না। সে তখন লোকচক্ষুর আড়ালে জলাভূমির কাছে বসে অপেক্ষা করে আছে কতক্ষণে গাধার চারা বেরোবে।

বাই শিকারীদের সঙ্গে আলদার কোসে

আকবাই কারাবাইয়ের কাছে আতিথ্যগ্রহণ করল কয়েকদিনের জন্য তারপর কারাবাই আকবাইয়ের কাছে আতিথ্যগ্রহণ করল। তারপর দুই বন্ধু ভাবল পাখী শিকারে যাবে। তীরধনুক সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তারা চলল দূরে হ্রদের উদ্দেশ্যে।

যেতে যেতে দেখে সামনে গুটি গুটি হেঁটে চলেছে একজন লোক।

জোর ছোটাল তারা ঘোড়া। সারাদিন ছুটে কেবলমাত্র সন্ধ্যার মুখে তারা হেঁটেচলা লোকটির নাগাল পেল। দেখে লোকটি — আলদার।

‘খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারিস তো, আলদার!’

‘ধনীদের মানায় ধীরগতি আর দরিদ্রের দ্রুতগতি। যে তাড়াতাড়ি চলে সে বেশী পথ এগিয়ে যায়। যার পথ বেশী দীর্ঘ সে দীর্ঘজীবি।’

‘কিছু খবর আছে?’ জিজ্ঞাসা করে শিকারীরা।

‘আছে খবর।’

‘কি খবর? বল দেখি!’

‘এক শিকারী এক তীরে হরিণের কান ও খুর দুই-ই বিঁধেছে।’

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়াল বাইরা।

‘বাজে কথা! এক তীরে কোন জন্তুর কান আর খুর একসঙ্গে বেঁধা যায় না!’

‘হ্যাঁ যায়। যখন শিকারী তীর ছোঁড়ে তখন হরিণটি পিছনের পা দিয়ে কান চুলকোচ্ছিল।’

অবাক হয়ে দুই বাই বলল, ‘তাহলে, সম্ভব বটে... আর কোন খবর আছে?’

‘আছে। ঐ শিকারীই, শুনেছি, তীর দিয়ে আকাশের একটা তারা বিঁধেছে।’

‘কে এমন কথা বিশ্বাস করবে, আলদার কোসে?’

‘বিশ্বাস না হলে রাতের বেলায় তারা গুণে দেখবেন। যদি দশবারও গোণেন একটা তারা ঠিক কম পড়বেই।’

কথায় কে পারবে আলদারের সঙ্গে ?

'তুই, আলদার কোসে, তীর ছুঁড়তে পারিস ?' জিজ্ঞাসা করে শিকারীরা।

'ধারাল তীর একজনকে আঘাত করে, আর ধারাল কথা হাজারজনকে আঘাত করে,' বলল আলদার।

'ঠিক আছে, বাক্‌বীর, তুই থাক আমাদের সঙ্গে। আমরা পাখী শিকার করব আর তুই আমাদের মজা দিবি, হাসাবি। কি রাজী ?'

'রাজী।'

তাঁবু খাটিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে তারা ঘুমোতে শুল।

পরের দিন আকবাই আর কারাবাই শিকার করে নিয়ে এল একটি পেলিক্যান পাখী। পাখীটা একটা মোটাসোটা ভেড়ার সমান।

'কি করে পাখীটা ভাগ করব বল দেখি!' বলে তারা আলদারকে।

'আমার কাজ তো আপনাদের মজা দেওয়া, তাই আমার উপদেশও হবে মজার। পাখীটা পাবে সেই যে প্রথম তারাটা আকাশে ওঠা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না।'

'ফন্দীবাজ বটে তুই আলদার। ঠিক আছে তোর কথামতই কাজ হবে।'

আগুনের কাছে তিনজন বসে রইল, নীরবে, যেন মুখে বালি ভরা তাদের। দিন শেষ হতে চলেছে কেউ কিন্তু ঠোঁট নাড়াচ্ছে না। তখন আলদার কোসে নীরবে পাখিটা তুলে নিয়ে পালক ছাড়াতে আরম্ভ করে। ছাড়িয়ে, তারপর কাটতে আরম্ভ করল, কেটে মাংসটা কড়াইতে চাপিয়ে আগুনের উপর বসাল।

আকবাই আর কারাবাই অবাক হয়ে দেখছে কিন্তু টুঁ শব্দটি করছে না: প্রথম তারা উঠতে তো দেরী আছে এখনও।

মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আলদার কড়াইটা কাছে নিয়ে বসে কোন কথা না বলে খেতে আরম্ভ করে দিল।

আকবাই আর কারাবাই এমন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে যেন চোখ দিয়েই বিদ্ধ করবে তাকে। কিন্তু কোন কথা বলছে না। কেবল যখন আলদার শেষ হাড়টা চুষতে লাগল তখন তারা দু'জনে মিলে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই, কি করলি তুই ? এ যে ডাকাতি।'

আলদার কোসে আঙুল চুষতে চুষতে বলল:

'চেঁচাচ্ছেন কেন ? আমি তো শর্তভঙ্গ করি নি ? শর্ত ছিল যে প্রথম তারা উঠা পর্যন্ত কথা না বলে থাকতে পারবে তারই হবে পাখীটা। তোমরাই প্রথম কথা বলা আরম্ভ করলে। তাহলে যেভাবেই চিন্তা কর না কেন পাখীটা আমারই হয়। আর আমারই যখন তখন আমি আমার ইচ্ছেমত খেলাম ওটাকে।'

শিকারীরা দাড়ি চুলকাল, করার কিছু নেই, খালি পেটেই ঘুমোতে শুল।

পরের দিন তারা শিকার করল দুটি মোটাসোটা হাঁস আর একটা কাদাখোঁচা পাখী।

'কি করে ভাগ করা হবে ?' জিজ্ঞাসা করল তারা।

আলদারের উত্তর তৈরীই:

'মহামান্য কারাবাই আর আকবাই, আপনারা দু'জন আর আমি বেচারী একা, হাঁসও দুটি আর কাদাখোঁচা একটি। আপনারা কাদাখোঁচাটা নিন আর আমাকে হাঁসদুটি দিন। তাহলে আপনারাও তিনজন হবেন আমরাও তিনজন হব।'

'আরে ঠকালে চলবে না,' সতর্ক হয়ে গেল বাইরা, 'দাঁড়া, হাঁস আর কাদাখোঁচা পাখীর কি তুলনা চলে ?'

'কি বলছেন, কি বলছেন হুজুররা !' হাত নাড়িয়ে বলল আলদার, 'এমন মোটাসোটা হাঁসগুলোর সঙ্গে ছোট্ট ঐ পাখীটার তুলনা করার কথা ভাবিও নি। মানকুলহীন অনাথ আলদার কোসের সঙ্গে আপনাদের মত মান্যগণ্য লোকেদের তুলনা করার কথা কারুর মাথাতেই আসতে পারে না। সেইজন্যই নিজের বদলে আপনাদের দিচ্ছি কাদাখোঁচাটা আর আপনাদের দু'জনের বদলে আমি নিচ্ছি হাঁসদুটো।'

শিকারীরা চোখচাওয়াচায়ি করে পরস্পরের মধ্যে, তাকায় আলদারের দিকে, পাখীগুলোর দিকে, কিছুই আর মাথায় ঢোকে না তাদের। মাকুন্দটা তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছে একেবারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাদাখোঁচা পাখীটা তুলে নিল তারা।

আলদার ওদিকে হাঁসের মাংস খেল প্রাণভরে আবার খানিক লুকিয়ে রেখে দিল থলিতে।

পরের দিন শিকারীরা নিয়ে এল একটা রাজহাঁস। আবার প্রশ্ন — কি করে ভাগ করা হবে ? পাখী একটা, খেতে আছে তিনজন।

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' বলল আলদার, 'পাখীটাকে কড়াইতে চাপিয়ে দেওয়া হোক, সিদ্ধ হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আগুনের কাছে ঘুমিয়ে নিই। যে সবচেয়ে ভাল স্বপ্ন দেখবে ঘুমিয়ে, সেই নিজের ইচ্ছামত ভাগ করবে মাংসটা।'

শুয়ে পড়ল তারা। লম্বা হয়েই নাক ডাকাতে আরম্ভ করল আলদার। অন্য দু'জন কিন্তু ঘুমোতে চায় না। 'নাক ডাকা ভাল করে, আলদার ! যতক্ষণ তোর নাক ডাকবে ততক্ষণে আমরা ভাল ভাল স্বপ্ন বানিয়ে নেব যা এর আগে বোকা বা চালাক কারো মাথাতেই আসে নি।' মাঝরাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করল বাইরা, মাংসর গন্ধ শুঁকল। তারপর তারাও ঘুমিয়ে পড়ল, এমন ঘুমোল যে বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভেঙে দেখে — সূর্য বেশ ওপরে উঠে গেছে, আলদার কোসে খানিক দূরে বসে গুণগুণ করে গাইছে, কড়াইয়ের নীচে আগুনটা জ্বলছে মিটমিট করে।

স্বপ্ন বলা আরম্ভ হল। আকবাই বয়সে সবার বড় বলে সেই আরম্ভ করল:

'এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম আমি, যেন আমি আমি নয়, যেন এক রূপকথার ঘোড়া — তুলপার। পিঠে পাখনা, পায়ের খুরগুলি রুপোর, ঘাড়ে সোনার কেশর। হঠাৎ আমার সামনে এসে হাজির হল এক অপূর্ব বীর, দামী জিন বসিয়ে সে উঠে বসল আমার পিঠে। কেশর উঁচিয়ে, পা ঠুকে, পাখনা নাড়িয়ে আকাশে উড়ে গেলাম আমি...'

কারাবাই বলল:

'তোর স্বপ্ন আকবাই, সত্যই অদ্ভুত কিন্তু ওটা আমার স্বপ্নের শুরু। কারণ যে বীর তোর পিঠে চড়ে উড়ে গেল সে হল আমি। আকাশে উড়ে গিয়ে আমি কিন্তু একটু ভয় পেলাম না, দিশাহারা হলাম না। উড়ে চলেছি আমি — সামনে সূর্য, পিছনে চাঁদ, পায়ের নীচে তারাগুলো, আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বেহেস্তের পরীরা আমাকে পথ বলে দিচ্ছে আল্লাহ্‌র রাজ্যের দিকে...'

আলদারের গলা শোনা গেল এবার:

'আপনাদের স্বপ্নগুলো খুবই ভাল, দারুণ! হাজার ভাবলেও বলা যাবে না কারটা বেশী ভাল। কিন্তু আমার কিছু বলার নেই। আমিও স্বপ্নে ঠিক তাই দেখেছি যা আপনারা দেখেছেন: কেমন করে মহামান্য আকবাই তুলপারে পরিণত হলেন আর মহামান্য কারাবাই বীরে পরিণত হলেন। যখন আপনারা দু'জনেই আকাশে উড়ে গেলেন কেঁদে ফেললাম আমি, বললাম, 'এবার আর ওঁরা ফিরে আসবেন না ওখান থেকে, অনাথ আলদারকে ফেলে গেলেন। হাঁসে আর কোন প্রয়োজন নেই ওঁদের। আল্লাহ্‌র রাজ্যে নিশ্চয়ই ভাল খাওয়াদাওয়া হয়। তা বলে পৃথিবীর খাবারটা তো নষ্ট হতে দেওয়া যায় না...' দুঃখে আমি রাজহাঁসটা খেয়ে ফেলে আপনাদের আত্মার শান্তি কামনা করলাম...

'স্বপ্নে খেয়েছিস নাকি সত্যি সত্যি, ধূর্ত কোথাকার!' বলে বাইরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল কড়াইয়ের ওপর। কড়াইতে কেবল হাড়গুলো পড়ে আছে।

আলদার কোসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা:

'হয়েছে যথেষ্ট তোর ঠাট্টা-তামাসা! ভেগে পড়!'

'ঠিক আছে,' বলল আলদার, 'চলে যাব। ঘরহীনের আশ্রয় সর্বত্র। কিন্তু এমন জায়গা কোথায় পাব যেখানে চালাক লোকের ঠাট্টায় বোকা লোক রেগে যাবে না?' বলে নলখাগড়ার বনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কেন আলদার কোসের দাড়ি গজায় না

একবার এক ভোজসভায় কে যেন আলদার কোসেকে জিজ্ঞাসা করল:

'আলদার, তোর দাড়ি গজায় না কেন ?'

আলদার যেন এমনি প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল, একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল:

'আমার পৃথিবীতে আবির্ভাবের কিছুদিন আগে আমার বাবামা তর্ক জুড়ে দিলেন, কাকে ভাগ্য নিয়ে আসবে তাঁদের জন্য — ছেলে না মেয়ে। বাবা বলেন, 'ছেলে হবে।' মাও জোর দিয়ে বলেন, 'মেয়ে হবে !' আর জন্মের আগে থাকতেই আমি আমার বাবামাকে খুব ভালবাসতাম আর সম্মান করতাম। তাই বাবাকে খুশী করার জন্য আমি ছেলে হয়ে জন্মালাম আর মা'র মনে কষ্ট না দেওয়ার জন্য দাড়িগোঁফহীন রয়ে গেলাম। জীবনে প্রায়ই এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, বন্ধুরা, কিন্তু তখন বুদ্ধি হারালে চলে না: যদি রাখাল হলামই তো চরাবার জায়গাও খুঁজে নিতে হবে !'

হেসে উঠল সবাই, আগুনে কাঠ গুঁজে দিল আলদার।

'তা ছাড়া নিজেরাই ভেবে দেখ, দাড়িগোঁফে কাজটাই বা কি ? উপর দিকে থুতু ফেলতে চাও সেখানে গোঁফে আটকায়, নীচে ফেলতে চাও সেখানে দাড়ি। আমি যেদিকে প্রাণ চায় সেদিকেই থুতু ফেলি। এ কেমন সুবিধা নয় ? কিন্তু তার চেয়েও বড় সুবিধা হল অন্য। দিনে দিনে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু সময়ের কোন হাত নেই আমার ওপর। কথায় বলে, 'শক্তিমান উট ক্লান্তি জানে না, মাকুন্দলোক বার্ধক্য জানে না।' যাই বল না কেন, চিরতারুণ্য বার্ধক্যের চেয়ে বেশী ভাল। ঠিক কি না ?'

'এমন কথা বলিস তুই, আলদার !' হেসে বলল সবাই। 'খা প্রাণভরে কুমিস খা, বকাটে। তুই যেন আরও বেশী করে এমন লোকের দেখা পাস যাদের বুদ্ধি কম আর টাকাপয়সা অনেক।
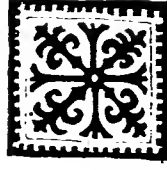
কাজীর পরামর্শ

এই কাজীর এমন স্বভাব ছিল যে যদি অপরাধী তার কাছে আসে দামী উপহার নিয়ে তো ফিরে যাবে নাচতে নাচতে, আর যার কোন দোষই নেই সে যদি খালি হাতে আসে তো ফিরে যাবে কাঁদতে কাঁদতে। সেই কারণেই তার জ্ঞানের প্রশংসা করত বাইরা আর গরীবরা তাকে যথেচ্ছ গালিগালাজ করত।

'দাঁড়াও, লোভীবুড়ো,' নিজের মনে মনে কাজীকে হুমকি দেয় আলদার, 'যদিও তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে তাহলেও তোমাকে ভাল করে শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

কাজীর ইয়ুরতার কাছে ঘোড়া থেকে নামল সে।

আলদারকে চেনাই যায় না একেবারে। তার গায়ে এমন পোশাক যা বোধহয় খানও পরতে চাইবে। প্রভাতসূর্যের মত উজ্জ্বল রেশম, ফুলেভরা জমির মত তার অলঙ্করণগুলি। ধনীলোক যদি এমন পোশাক পরে তো সবাই প্রশংসা করে আর দরিদ্র যদি পরে তো সবাই জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করবে, 'কার থেকে চুরি করলি?'

'আরে বাপ রে! কি চমৎকার পোশাক!' আলদারকে দেখে দু'হাত ছড়িয়ে বলল কাজী 'কার গায়ের থেকে এটা খুলে নিয়েছিস রে, জোচ্চোর? তোর গায়ে এমনি পোশাক যেন বারোহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি। কোন মান্যগণ্য লোক, এই যেমন আমার মত কেউ, ওটা পরলে মানায়, তাও রোজ না, কোন উৎসব পার্বণে...'

কোন কথা না বলে আলদার পোশাকটা নিজের গায়ের থেকে খুলে নিয়ে কাজীর গায়ে পরিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল কাজী, একমুখ হাসি নিয়ে হাতগুলো ঢোকাতে চেষ্টা করতে লাগল হাতার মধ্যে তাড়াহুড়ো করে।

'আঃ কি দারুণ পোশাক! অপূর্ব!' এক জায়গাতেই ঘুরপাক খেতে থাকে আর নিজের দিকে দেখতে থাকে একবার এপাশ দিয়ে একবার ওপাশ দিয়ে। 'একখানা জিনিস দিলি বটে আলদার কোসে! এখন দেখছি লোকে শুধু শুধুই বাজে কথা বলেছে আমায় তোর

নামে। হয়ত তুই সত্যিই কোন বোকাকে শিক্ষা দিয়েছিস, তো সেজন্য নিজেকেই দোষ দিক: মুখ হাঁ করলে মাছি গিলতেই হবে।'

মুখেচোখে বেশ গুরুগম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলে কাজী নরম বালিশে হেলান দিয়ে বসল।

'কি কাজে এসেছিস বল, বাবা,' মিষ্টিস্বরে বলল পোশাকের প্রান্তে অনবরত হাত বুলোতে বুলোতে।

'এসেছি হুজুরের কাছে কিছু পরামর্শ নিতে, জানি না কোথা থেকে আরম্ভ করব...'

'বল, লজ্জা করিস না,' উৎসাহ দিল কাজী, 'কথায় বলে নাচতে নেমে ঘোমটা টানা, এসেছিস যখন বলেই ফেল... রেশমের এই পোশাকে আমি খুব খুশী তাই আগে থাকতেই বলে রাখি যে ব্যাপারেই সাহায্য চাইতে এসে থাকিস না কেন আমার সিদ্ধান্ত তোর পক্ষেই যাবে।'

'কৃতজ্ঞ হলাম। কৃতজ্ঞ হলাম।' মাথা নীচু করে বলল আলদার, 'কাজীসাহেবের যখন আমার প্রতি এতই দয়া তখন সব কথা খুলেই বলি। এক দাস ছিল আমার, কম দাম দিতে হয় নি তার জন্যে, কিন্তু কি ভালই যে বেসে ফেললাম তাকে। এমন যত্নে তাকে আগলে রাখতাম আমি যা কোন পাখীও তার ছানাকে রাখে না। সে আমার নয় — আমিই তার দাস হলাম। এমন হয়েছে যে আমি খেটে মরছি আর সে বিশ্রাম করছে, স্তেপে এটা ওটা নিয়ে ব্যস্ত আমি আর সে ঘরে শুয়ে আছে। তার গায়ে একটু ধুলো পড়লে ঝেড়ে দিই, এক ফোঁটা শিশির পড়লে শুকিয়ে দিই। কখনও কোথাও লোকজনের মাঝে একসঙ্গে যেতে হলে, কল্পনা করে দেখুন, আমি তাকে বয়ে নিয়ে যাই নিজের কাঁধে করে। আর তাতে হলটা কি?'

'কি হল?' ঔৎসুক্যে গলা বাড়িয়ে বলল কাজী।

'আজ আমি হারালাম তাকে,' বিষণ্নস্বরে বলল আলদার।

'কি করে হারালি?'

'আজই আমাদের দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে। ঐ স্বার্থপর লোকটার চোখ পড়ল আমার দাসের ওপর। আমার উপস্থিতিতেই সে আমার দাসের প্রশংসা করতে আরম্ভ করে দিল, আমার সমালোচনা আর নিজের স্তুতি গাইতে আরম্ভ করে দিল, এমন কি আমি আশা করেছিলাম নাকি? — লোভ দেখিয়ে নিজের কাছে ডেকে নিল তাকে। আমার অকৃতজ্ঞ দাস সোজাসুজি আমার সামনেই অন্য মালিকের কাছে চলে গেল। এখন কি করি আমি? পরামর্শ দিন।'

'কি করবি?' মুখে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে ভ্রূ উঁচিয়ে কাজী বলল 'খুবই সহজ। অবিলম্বে খুঁজে বার কর তোর দাসকে, মায়াদয়া না করে চাবুক দিয়ে খুব ভাল করে শিক্ষা দিয়ে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যা নিজের ইয়ুরতাতে। জানুক নিজের জায়গা!'

'দীর্ঘজীবি হোন আপনি, মহাজ্ঞানী কাজী। এর আগে আর কখনও এমন ন্যায়বিচার করেন নি আপনি। আপনার আদেশ এখনই পালন করব। দোষীকে খুঁজতে তো আর কোথাও যেতে হবে না। সে এখানেই আছে, আপনার বুদ্ধির ওপর ভরসা করে দাস বলতে আমি কোন মানুষকে বোঝাই নি, বলেছি এই পোশাকটার কথা। ঐ পোশাকটার বিরুদ্ধেই

আমার অভিযোগ, মহামান্য কাজী। আমিই কি দাম দিই নি ওর, যত্ন করি নি ? আর আপনি কয়েকটি কথা বলামাত্রই ও আপনার কাঁধে গিয়ে উঠল... এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতেই হবে ওকে !'

বলে চাবুকটা হাতে তুলে নেয় আলদার।

কাজী মুহূর্তে বুঝতে পারল কথাবার্তা কোনদিকে ঘুরছে, পালাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আলদার তার পিঠে এমন জোরে বসিয়ে দিল চাবুকটা যে লাফিয়ে উঠল সে আর সারা এলাকা কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল:

'বাঁচাও ! মেরে ফেললে !'

'শেয়ালের মত ধুয়ো টানছ কেন, কাজী ? আর পাহাড়ী ছাগলের মত লাফাচ্ছই বা কেন ?' চাবুক চালাতে চালাতেই বলল আলদার, 'তোমাকে তো কিছু করছি না, আমার পোশাকটাকে শাস্তি দিচ্ছি তোমার বিধান অনুসারেই।'

'তোর পোশাকটা তোর গায়ে সাপের চামড়া হয়ে যাক, বদমাশ !' পোশাকটা ছেড়ে ফেলে বলল কাজী, তারপর পালিয়ে গিয়ে সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আলদার চাবুকটা রেখে দিল। পোশাকটার গলার কাছটা ধরে যেন কাজীর বিধান মেনে টানতে টানতে নিয়ে চলল দরজার দিকে। একেবারে দরজার কাছে গিয়ে বলল সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে:

'তোমার মুখে যদি মাছি পড়ে থাকে তো রাগ কোরো না কাজী। কেবল তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে যখন পোশাকের ওপর মারা হয় তখন পোশাক যে পরে থাকে তারও লাগে। বুঝতে পারলে আমার কথা ?'

শোনা যায় কাজী বুঝেছিল আলদারের কথা তাই সেদিন থেকেই সে লোকেদের বিচার করতে আরম্ভ করে ন্যায় ও সত্য অনুযায়ী।

কেমন করে আলদার কোসে অত্যাচারীকে শিক্ষা দিল

গুণ্ডা, অত্যাচারী এই বাইয়ের ভয়ে কাঁপত সারা এলাকা, সারা গ্রাম। শক্তি ছিল তার প্রচণ্ড আর লোকের প্রতি তার মায়াদয়া ছিল বন্যজন্তুর যা থাকে তার চেয়েও কম। বড়, ছোট কেউ তার পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না: কাউকে ধাক্কা দেবে, মারবে কাউকে, কাউকে বিকলাঙ্গ করে দেবে। এই অত্যাচারীকে শিক্ষা দেবার মত কোন সাহসী লোক ছিল না। একটাই পথ খোলা ছিল: খানের কাছে গিয়ে নালিশ জানান। কিন্তু সবাই জানে: রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। কথায় বলে: শিংহীন ছাগল সিংহের কাছে গেল শিং চাইতে, ফিরে এল কান হারিয়ে।

তাই সবাই তার অত্যাচার সহ্য করত। আর তার বন্ধুরা তাকে আরও উৎসাহ দিত।

একদিন অত্যাচারী বাই শুনল যে সামান্য দূরেই রাখালদের কাছে আলদার কোসে এসে আতিথ্য নিয়েছে, বলল হাত নাড়িয়ে:

‘আরে ঐ বজ্জাত মাকুন্দটা আমার ধারেকাছে আসার সাহস পায় কি করে! বড় বেড়েছে দেখি! একটু ঢিলে দিলেই কালই আমার গাঁটে হাত ঢোকাবে... তা হতে দেব না আমি! ঘোড়া তৈরী কর! আলদার কোসেকে ধরতে যাব। তার চামড়ার সঙ্গে পোশাকও ছাড়িয়ে নেব! উলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দেব!’

ভৃত্যরা ঘোড়া নিয়ে এল। চাবুকের শিস শোনা গেল — রওনা দিল বাই।

সময় যায়, কিন্তু গ্রামের লোক চলে যায় না, ভীড় করেই থাকে, কি হয় তা জানার আগ্রহ সবারই, গরীব লোকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হা-হুতাশ করে, আমুদে-হাসিখুশী আলদারের জন্য মায়া হয় তাদের। আর বাইয়ের চাটুকাররা আনন্দ করতে থাকে:

‘হয়ে গেছে ব্যাটা মাকুন্দর! ধরে নাও, ওর কবর তৈরী!’

ওদিকে ততক্ষণে বাই রাখালদলের কাছে পেঁছে গেছে।

‘আলদার কোসে কোথায়?’

'ছিল, চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'কে জানে। ঘুঘু-বটের কি আর পথ বেছে নিয়ে যায়? যেদিকে প্রাণ চায়, সেদিকেই যায়...'

'ধরবই শয়তানটাকে।' দাঁত কিড়মিড় করে বলল বাই। 'মাটির নীচে লুকালেও টেনে বার করব। উলঙ্গ হয়ে সবার মাঝে নাচতে বাধ্য করব ওকে!'

আবার ঘোড়া চালিয়ে দেয় সে।

ঐ যে সামনে এক নদী। নদীর তীরে এক কুঁজো বুড়ী বসে সুতো কাটছে। চার পাশে জনমানিষ্যি নেই।

'এই বুড়ী!' ঘোড়া থেকে চীৎকার করে বলল বাই, 'একটু আগে এখান দিয়ে কি মাকুন্দটা গেছে নাকি?'

কাশল বুড়ী, নড়েচড়ে, মাথা ন্যাড়িয়ে ন্যাড়িয়ে কিঁচমিচ করে বলল:

'কানে শুনি না বাছা, কি বলছ কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কাছে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বল।'

বিরক্ত হয়ে ঘোড়া থেকে নামল বাই, নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করে বলল:

'বলি এখান দিয়ে কেউ!..' শেষ করতে পারল না কথাটা।

বুড়ী অদ্ভুত দ্রুতগতিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মাথায় নিজের মাথায় বাঁধা কাপড়ের টুকরোটা চাপা দিয়ে দিল। তখনি বাই শুনতে পেল অট্টহাসি, ঘোড়ার খুরের আর জলের ছলছল আওয়াজ।

'বাঁচাও!' কেঁদে ফেলল বাই। 'ডাইনী মেরে ফেলল!'

কাঁপা কাঁপা হাতে শেষ পর্যন্ত সে নিজের মাথা থেকে খুলে ফেলল কাপড়টা, খুলেই যা দেখল তা না দেখাই বোধহয় ভাল ছিল!

তার দামী ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে অন্য পারে আর তার ওপর বসে হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে... আলদার কোসে।

'কেমন, বীরপুঙ্গব, লড়াই ছাড়াই কাবু করলাম তোমায়। স্বীকার করছ তো যে হারলে?' হাসতে হাসতেই বলে আলদার কোসে।

'স্বীকার করছি,' রাগে লাল হয়ে বলে বাই। 'কেবল আমার ঘোড়াটা ফিরিয়ে দে, আলদার কোসে!'

'তোমার ঘোড়ায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। সাঁতার দিয়ে না হয় হাঁটুজলের জায়গা পেরিয়ে যেমন করে হোক এপারে এসে নিয়ে নাও তোমার ঘোড়া।'

কি আর করে বাই? জুতো-জামা খুলে উলঙ্গ হয়ে বেচারী নামল নদীতে। বেশ খানিক হাবুডুবু খেয়ে তীরের কাছে পেঁছিল।

আলদার অপেক্ষায় ছিল যেই বাই তীরে পেঁছিল অমনি সে প্রচণ্ড জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীতে গিয়ে নামল।

চারদিকে জল ছিটাতে লাগল সে, জল বাইয়ের চোখে লাগল, যখন সে চোখ রগড়ে তাকাল, হতাশ হয়ে বসে পড়ল বালির ওপর, আলদার কোসে নদী পেরিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ধীরেসুস্থে বাইয়ের পোশাকআশাক জড় করে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় উঠে তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে স্তেপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল...

এ হল সকালবেলার ঘটনা, আর বিকালবেলায় বাইয়ের ঘোড়াটা আরোহীহীন অবস্থায় গ্রামে এসে পেঁছিল, মুখে ফেনা উঠছে, ঘোড়ার মালিকের পোশাক পুঁটলি করে বাঁধা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে। হৈচৈ পড়ে গেল। বাইয়ের বন্ধুরা যে যা পারল হাতে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল তার খোঁজে। খানিকবাদেই স্তেপের মাঝে তারা দেখতে পেল একজনকে। খালিগা, খালিপা লোকটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে গ্রামের দিকে, মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে কাঁটাঝোপে পা পড়ায়। দূর থেকেই তাকে চিনতে পারল বন্ধুরা। তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সবাই:

'কি হয়েছে ? কে তোর এমনি অবস্থা করেছে ? আলদার কোসে নাকি ?'

কিন্তু বাই মুখ নীচু করে চুপ করে রইল।

সেই দিন থেকেই একেবারে পাল্টে গেল বাই। শান্তশিষ্ট হয়ে গেল। যদি কখনও লোকের ওপর অত্যাচার করার ইচ্ছা হয়েছেও তার তো 'আলদার কোসের' নাম উচ্চারণ করলেই সে আবার গুটিয়ে শান্ত হয়ে যায়।

কেমন করে আলদার কোসে গানের মান বাঁচাল

দোমরা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নিজের ঘোড়ায় চড়ে ধীরেসুস্থে আলদার এগিয়ে চলেছে এক বড় গ্রামের দিকে। গ্রামের লোকেরা ছুটে বেরিয়ে এসে হাত নাড়াতে লাগল।

'চুপ কর, চুপ কর আলদার! আমাদের গ্রামে গান গাওয়া নিষেধ।'

'গান গাওয়া নিষেধ?' সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল আলদার, 'কেন? গৃহকর্তাহীন গৃহের দৃশ্য বিষাদময়, গানহীন বসতি আরও বিষাদময়। নাকি কোনো বিপদ ঘটেছে তোমাদের?'

'দারুণ বিপদ রে ভাই, আমাদের গ্রামে আস্তানা গেড়েছে এক মোল্লা; একবছর হল এসেছে, চলে যাবার কোন লক্ষণই নেই। এখানে একজন ধার্মিক লোক আছে, খোজা ইয়ুসুফ, তারই অতিথি হয়ে আছে। তার কাছে আছে কিন্তু খাওয়াদাওয়া চলছে আমাদের ঘাড় ভেঙে: শীগগিরই একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে গ্রামটা। গান তামাসা হাসি নিষেধ করে দিয়েছে। বাস করছি যেন মসজিদের ভিতরে: বাচ্চাদের খেলার উপায় নেই, ছেলেপিলেদের কোন আনন্দ নেই। গান তো দূরের কথা মুখে একটু সামান্য হাসি ফুটলেও মোল্লা হুমকি দেয় পয়গম্বরের সাজা ও চিরযন্ত্রণার...'

'খুবই খারাপ আছ দেখছি,' মুখ অন্ধকার হয়ে গেল আলদারের। 'গানের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার মত অন্যায় কাজ আর হয় না দুনিয়ায়। যদি আমি চেষ্টা করি মোল্লাকে গ্রাম থেকে তাড়াবার, তাহলে কেমন হয়?'

'এমন কথা বলার জন্য মুখে ফুলচন্দন পড়ুক তোর। মোল্লাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে তুই আমাদের জীবনে আলো বাতাস ফিরিয়ে আনবি।'

'তাহলে দেখিয়ে দাও কোথায় আছে মোল্লা।'

খোজা ইয়ুসুফের ইয়ুরতার কাছে এসে আলদার একটু কাশল।

ইয়্রতা থেকে মুখ বাড়াল গাঁট্টাগোট্টা চেহারার, কুৎসিত, মাথায় পাগড়ীবাঁধা একটা লোক রাগরাগভাবে জিজ্ঞাসা করল:

'কি চাস, পথিক?'

'জানতে চাই,' নীচু হয়ে সম্মান জানাতে লাগল আলদার, 'আপনিই কি সেই মহাসম্মানিত, মুসলমানদের গর্ব খোজা ইয়ুসুফ?'

'হ্যাঁ, আমিই,' একটু নরম হয়ে বলল খোজা।

'মহামান্য খোজা, আপনার কাছেই কি অতিথি হয়েছেন পয়গম্বরের অনুগত দাস মহাসম্মানিত মোল্লা?'

'হ্যাঁ, আছেন। কি দরকার তোর তাঁকে?'

'আল্লাহ্‌র রহমত,' চোখে গদগদভাব ফুটল আলদারের, 'খুঁজে পেলাম শেষে মহাসম্মানিত মোল্লাকে। মহান পিতার জন্য উপহার এনেছি আমি,' ইয়্রতার মধ্য থেকে যাতে শুনতে পাওয়া যায় এমনভাবে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'অপূর্ব উপহার, যা তিনি এর আগে আর কারো কাছে পান নি। আপনার কাছে আমার অনুরোধ তাকে দিয়ে দেবেন এই এটা...'

বলে আলদার কোসে ঘোড়া থেকে ঝুঁকে পড়ে খোজার গালে এমন এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল যে সে টলে গেল প্রায়।

বিস্ময়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল সে, ওদিকে আলদার চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

গালে হাত দিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে খোজা ইয়ুসুফ ইয়্রতাতে ফিরে এল, মোল্লার দিকে তাকাচ্ছে না। মোল্লাও ওদিকে চোখ সরাচ্ছে না তার থেকে। সে ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করেছে মোল্লা যে তার হাতে কিছু নেই, ভাবল: 'ব্যাটা, উপহারটা লুকিয়েছে জামার নীচে...'

'কে এসেছিল?' সতর্ক প্রশ্ন করল মোল্লা।

'একটা বদমাস লোক এসেছিল,' গোমড়ামুখে বলল খোজা।

'বদমাস লোক আল্লাহ্‌র গুণগান করে না,' বিরক্তভাবে বলল মোল্লা। 'কি বলল সে তোমায়?'

'কোথাকার কোন পাপী কি বলল না বলল তা পুনরাবৃত্তি করার কি কোন মানে হয়!'

মোল্লার স্থির বিশ্বাস হল যে খোজা তাকে ঠকাচ্ছে।

'তুই ভাবছিস যে মোল্লাকে সম্মান জানায় আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার জন্য উপহার নিয়ে আসে সে পাপী? চালাকি করিস না! সব কথা শুনেছি আমি, দে আমার উপহার!'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল খোজার কিন্তু সংযত করল নিজেকে।

'তা আমি পারব না, পবিত্র পিতা। অসম্ভব দাবী কোরো না আমার কাছে।'

'কি?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মোল্লা। 'তুই নিজের অতিথি, দরিদ্র মোল্লার জিনিস হস্তগত করতে চাচ্ছিস? আর যাকেই ঠকাস, আমাকে ঠকাতে পারবি না। বার কর, যা লুকিয়েছিস! তা নাহলে শাপ দেব এমন যে নরকের আগুনে জ্বলবি!..'

খোজার মাথার মধ্যে তখনও ঝনঝন করছে থাপ্পড়ের চোটে, তার ওপর মোল্লার গালাগালিতে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলল সে।

'ঐ লোকটি তোমায় যে উপহার দিয়েছে তা পেতে চাও নির্বোধ মোল্লা?' কাছে এগিয়ে এল ইয়ুসুফ, 'এই নাও তবে!..'

বলে দারুণ জোরে থাপ্পড় কষিয়ে দিল মোল্লার গালে।

মোল্লাও সবকিছু ভুলে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলাটা টিপে ধরল।

'অবিশ্বাসী কুত্তা! শয়তানের চর! ডাকাত!' বলতে লাগল। 'আমার জিনিস হাত করেছিস আবার নিজের মোল্লার গায়ে হাত তোলা হচ্ছে!..'

মাটিতে গালিচার ওপর পড়ে তারা হুটোপুটি করতে লাগল। তাদের হুটোপুটিতে ইয়ুরতা টলমল করতে লাগল, তারপর পড়ে গেল হুড়মুড় করে। ইয়ুরতার নীচ থেকে লোকে টেনে বার করল জড়াজড়ি করে থাকা দুই ধার্মিককে।

সেই দিনই মোল্লা চলে গেল সেই এলাকা ছেড়ে, আর কোন দিনই সেখানে মুখ দেখায় নি সে। খোজাও লোকের ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে বাঁচার জন্য অন্য জায়গায় গিয়ে বাস করতে লাগল।

গ্রামে আবার আনন্দের দিন ফিরে এল। সকাল সন্ধ্যা সেখানে গান চলতে থাকে সারাদিন যেন কোন উৎসব লেগেছে সেখানে।

এরপর বহুদিন পর্যন্ত বৃদ্ধরা বলত কেমন করে আলদার কোসে গানের মান বাঁচায় আর গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় বদমাস মোল্লাকে।
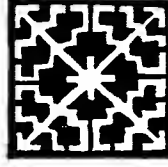
কেমন করে আলদার কোসে অহংকারীর অহংকার ভাঙল

রঙীন চাঁদোয়া খাটান সাদা উটের পিঠে বসে, দাসদাসী, প্রহরী পরিবৃত হয়ে সুলতানের ছেলে ফিরে চলেছে পিতার রাজ্যে হজ সেরে।

রাস্তায় তাদের দেখা হল ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা মাকুন্দ একজন লোকের সঙ্গে। ঘোড়ায় চড়ে চলেছে লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসি নিয়ে।

সুলতানের ছেলে ডাক দিল তাকে, 'এই তুই আলদার কোসে নাকি?'

'ঠিকই ধরেছেন হুজুর, আমি আপনার দাস আলদার কোসে।'

সুলতানের ছেলের ইঙ্গিতে থেমে গেল গোটা দলটা।

'বল দেখি আলদার কোসে, একথা কি সত্যি যে তুই সবাইকে ঠকাস?'

বিনীতভাবে মাথা নীচু করল আলদার।

'হুজুর, এমন অনেক মিথ্যা হয় যা সত্যির মতন আবার অনেক সত্যিও হয় মিথ্যার মত। নিজেই ভেবে দেখুন: একজন লোকের পক্ষে, সে যত জ্ঞানীই হোক না কেন, সবাইকে ঠকান কি সম্ভব? সবাই — মানে হল জনগণ তাই না কি?'

'কি বকবক করছিস?' থামিয়ে দিল তাকে সুলতানের ছেলে, 'জনগণের কথা উঠছে কোথা থেকে? ভাল লাগে না আমার ঐ কথাটা।'

'ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, কথায় বলে: 'জনগণের গায়ে থুতু ফেলতে যেও না — থুতুতে কুলাবে না; আর জনগণ যদি তোমার গায়ে থুতু ফেলে তো থুতুর সাগরে হাবুডুবু খেতে হবে তোমায়...'

ভ্রূ কোঁচকাল সুলতানের ছেলে।

'এই সাবধান! বড় বেশী ঢিলে দিয়েছিস জিভে। বেশ! বুদ্ধি না দেখিয়ে সোজাসুজি বল দেখি এই আমাকে তুই ঠকাতে পারবি?'

'আপনাকে হুজুর?' চিন্তায় পড়ে গেল আলদার। 'না — আপনাকে ঠকাতে পারব না। আসলে ঠিক ঠিকভাবে বলতে গেলে আপনার পায়ের গোড়ালিটা দেখতে হবে আমায়...'

'তাই নাকি ?' বিরক্ত হল সুলতানের ছেলে, 'ঠিক আছে, দেখ...'

বলে দাসদের আদেশ দিল উটটাকে নীচু করতে, উটের থেকে নেমে মাটিতে বসে পড়ে হাঁসফাঁস করতে করতে জুতোগুলো টেনে টেনে খুলতে লাগল:

'এই দেখ, আমার গোড়ালিগুলো !'

'আর একটু উঁচু করুন, হুজুর, আর একটু উঁচু করুন, দয়া করে !'

সুলতানের ছেলে মাটিতে হাতের ভর দিয়ে পা উঁচু করে তুলে ধরল।

আলদার অনেকক্ষণ ধরে দেখল তার পায়ের গোড়ালিগুলো আর মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগল, তারপর কাঁপা কাঁপাস্বরে বলতে লাগল:

'না, হুজুর। না, কিছুতেই না। বেচারী আলদার কোসেকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় করুন, ছাল ছাড়িয়ে নিন, জ্বলন্ত কয়লার ওপর বসিয়ে দিন, আপনাকে ঠকাবার ক্ষমতা আমার নেই...'

সুলতানের ছেলে খুশী হয়ে বলল:

'তাই বল ! আমায় ঠকাবে যে তার এখনও জন্ম হয় নি। তোর কপাল ভাল রে যে তুই আমায় মিথ্যাকথা বলিস নি !'

শীঘ্রই সুলতানের ছেলে দলবল নিয়ে তার দেশে পেঁৗছে গেল, সেই উপলক্ষে সুলতান এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করল। ভোজসভায় সুলতানের ছেলে পথে যা যা দেখেছে সব বলল, শেষে বলল ধূর্ত আলদার কোসেকে কেমন করে বোকা বনতে হয়েছে তার কাছে।

'দাঁড়া ! দাঁড়া !' চীৎকার করে উঠল সুলতান, 'কিন্তু তুই তো মাকুন্দর ইচ্ছামত উট থেকে নামলি ! তার খেয়ালমত স্তেপের মাঝে তার সামনে জুতো খুললি। গাধার মত তার খেয়াল মেটাতে দাসদাসীদের সামনে পা মাথার ওপর তুলেছিস ! অর্থাৎ আলদার কোসে তোকে তিনবার ঠকিয়েছে !'

সুলতান রাগে পাগল হয়ে লোকের মাঝ থেকে উঠে চলে গেল, আর ছেলে বোকার মত চোখ পিটপিট করতে লাগল।

ভোজসভার অতিথিরা এমনি কাণ্ড দেখে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হাসি চাপতে লাগল, জোরে হাসবার সাহস হল না। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল: 'সুপুত্র বাপের মুখ উজ্জ্বল করে, আর কুপুত্র বাপের নাম ডোবায়।'

আলাশাখান ও আলদার কোসে

স্তেপের খান তখন আলাশাখান, বদরাগী ও স্বেচ্ছাচারী শাসক। কেউ কখনো বুঝতে পারত না তার মাথায় কি খেয়াল জাগবে, তার দয়া বা রাগের পরিণাম কি হবে।

যখন খান তার অনুচরদের নিয়ে স্তেপ দিয়ে যেত লোকেরা ভয়ে যে যেদিকে পারত পালাত, লুকিয়ে পড়ত। তার চোখে পড়া মানেই হল দুর্ভোগ, এই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু খানের হাত থেকে তো লুকোবার উপায় নেই।

একবার খান আদেশ জারী করল: 'সবাই, যার এমনকি একটা ভেড়াও আছে শীতকালের আগে পর্যন্ত খানের কোষাগারে একটা করে সোনার মোহর জমা দিতে হবে তাদের।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল স্তেপের লোকেরা। গরীব লোকগুলো জন্মে কখনও একটা ঘষা পয়সাও হাতে করে নি আর সোনার মোহর পাবে কোথায় ?

ভাবনায় পড়ল আলদার কোসেও:

'বেচারীদের এই দুর্ভোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চাই অনেক মোহর। কার আছে তত ধন ? কেবল খানেরই। যাই দেখি, কথা বলে আসি তার সঙ্গে। তার কাছে দু' এক থলি মোহরের বন্দোবস্ত করা যাবে না কি ? যা হয় হবে — 'মরব তো একবারই...'

বসন্ত কাল। ফুলে ফুলে ভরে গেছে স্তেপ। বেশ খুশী মনে চলেছে আলদার।

পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদের কাছে তাঁবু পড়েছে খানের। সুন্দর সাদা তাঁবুগুলোকে খাটান হয়েছে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, কিন্তু মাঝখানেরটি সবচেয়ে বড় আর সুন্দর। ওটি হল খানের তাঁবু।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে ঢুকল না আলদার কোসে, একটু দূরে পায়চারী করতে লাগল শিস দিতে দিতে।

তার দিকে ছুটে এল খানের দেহরক্ষীরা।

'এই, কে তুই ? কি চাই ?'

'আমি আলদার কোসে। খানকে জানাতে চাই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা।'

তাকে নিয়ে যাওয়া হল খানের কাছে।

'তুই তাহলে সেই মাকুন্দ ঠক!' বলল আলাশাখান, 'তোর কীর্তিকাণ্ড অনেক শুনেছি, অনেক সম্মানিত লোক তোর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে আমার কাছে। কি জন্যে এসেছিস?'

'হুজুর,' নতজানু হয়ে বসে পড়ল আলদার, 'লোকের কথায় বিশ্বাস করবেন না। লোকের মন রাখতে পারবে কে? কিছু বললে বলে বাচাল, আর চুপ করে থাকলে বলবে নির্বোধ। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আমার আন্তরিকতা আর নিঃস্বার্থতার কথা, কেবল যা বলতে এসেছি তা বলতে অনুমতি দিন।'

খান ইঙ্গিতে অনুমতি দিল তাকে বলতে।

'হুজুর,' উদ্দীপিত হয়ে বলে চলল আলদার, 'আপনার অর্থভাণ্ডার গুণি নি আমি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গোনা সম্ভব নয় আপনার ভাণ্ডার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়াতে এমন কোন অধিপতি নেই অতিরিক্ত সোনা যাঁর কোন কাজে লাগবে না। আমি এক উপায় জানি যার মাধ্যমে ধনসম্পত্তি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এখন বসন্তকাল — বীজবপনের সময়। এক থলি মোহর দিন আমায়, সে মোহর পুঁতে দেব আমার নিজের জমিতে আর শরৎকালে ফসল তুলে গোটাগুটিই আপনাকে এনে দেব। আমি জানি, গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া যদি ভাল হয় তো একটা মোহর পুঁতে হাজারটা মোহর পাওয়া যায়।'

'আর যদি লোপাট হয়ে যায় মোহর?' কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করল খান।

আলদার হাত ছড়িয়ে বিনীত উত্তর দিল:

'আপনার হাতেই তো থাকবে আমার জীবনটা, জাঁহাপনা।'

সেখানে উপস্থিত উজীররা নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষায় রইল খান কি বলে তা শোনার জন্য। কিন্তু খান নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আলদারের দিকে যেন দৃষ্টি দিয়েই টুকরো টুকরো করে ফেলবে আলদারকে। শেষে মুখ খুলল সে:

'একে একথলি মোহর দাও, পুঁতুক!' উজীরদের হতবাক অবস্থা দেখে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল আবার: 'আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে পিঠ বাঁচাতে পারবে না ও!'

তক্ষুণি পালিত হল খানের আদেশ আর আলদার কোসে দারুণ খুশীমনে ভরা থলি কাঁধে ফেলে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল। লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছু নিল খানের চরেরা মোহরগুলি নিয়ে সে কি করে তা দেখার জন্য।

খানিকবাদে চরেরা ফিরে এসে খানকে জানাল: বাড়ীতে ফিরে আলদার দুটো বলদ লাঙলে যুতে খেতে যায়, একটুকরো জমিতে লাঙল চালিয়ে কি যেন ছড়াতে লাগল তার ওপর আর বলতে লাগল, 'এক থেকে হাজার হও! এক থেকে হাজার হও!' তারপর সেই জমির কাছে একটা চালা তৈরী করে বসল সেখানে, বীজ যাতে পাখীতে খেয়ে না যায় সেজন্যে পাহারা দিতে, তাই চরেরা দেখে আসতে পারে নি মোহর ছড়িয়েছে আলদার জমিতে নাকি অন্য কিছু...

শরৎকাল এসে গেল। হ্রদের থেকে হাঁসগুলি দক্ষিণে উড়ে চলে গেল, উপত্যকার ঘাস শুকিয়ে গেল, কিন্তু আলদারের কোন নামগন্ধ নেই।

আলাশা খান একদল সৈন্য পাঠাল তাকে ধরে আনতে: 'ঠগটাকে ধরে নিয়ে এস! এমনি ঠকানর জন্য জবাব দিতে হবে তাকে।'

দারুণ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা দিল সৈন্যদল কিন্তু খানিক বাদেই ফিরে এল শূন্যহাতে:

'হুজুর,' ফিরে এসে জানাল তারা, 'আলদার কোসের তাঁবুতে ঢুকে আমরা তাঁবুর মালিককে দেখতে পেলাম না। নিভে যাওয়া চুলার কাছে দেখি এক সুন্দরী যুবতী বসে আছে, যুবতীটি জানাল সে আলদার কোসের বোন। হাউহাউ করে কাঁদছে মেয়েটি। 'তোমার ভাই কোথায় ?' জিজ্ঞাসা করলাম আমরা। 'সে নেই ঘরে, আর হয়ত এতক্ষণে আর বেঁচেও নেই !' উত্তর দিল মেয়েটি। এমন দুঃখের দৃশ্য দেখলে যে কোন লোকেরই বুক ভেঙে যাবে ! 'কি ঘটেছে ?' জিজ্ঞাসা করলাম আমরা। 'এ বছর আমাদের এখানে সেই বসন্তকাল থেকেই মোটেই বৃষ্টি হয় নি। খানের যে মোহরগুলি পুঁতেছিল বেচারী ভাইটি আমার, কোন ফসল দেয় নি, তাই খানের রাগের ভয়ে গেছে অর্থযোগাড় করতে যাতে খানের সোনা ফিরিয়ে দিতে পারে পুরোপুরি। যদি খানের সোনা ফিরিয়ে দিতে না পারে তো জীবন রাখবে না সে আর...' এই আমরা কেবল জানতে পেরেছি। এবার কি আদেশ হয়, হুজুর ?'

খান খানিক ভেবে বলল:

'আমার মনে হয় আলদার কোসে আর তার বোন দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে। ঐ ছলনাময়ীর চোখের জলে বিশ্বাস করেছ বৃথাই। ওর ভাইয়ের বদলে ওকেই নিয়ে এস আমার কাছে ভাইয়ের জামিন হবে সে।'

কিন্তু যখন মেয়েটিকে আনা হল তখন তার শ্রী আর আচারব্যবহার দেখে সবার এমন ভাল লাগল যে তার কান্নাও সবার কাছে আন্তরিক বলে মনে হল, খান অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। তাকে রাখা হল আলাদা তাঁবুতে, তার জন্য পাঠান হল খাদ্যদ্রব্য, উপহারাদি।

ঠিক ঐ সময়েই এক যুবক সুলতান খানের এক মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেই লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাবার ইচ্ছে নেই খানের, তার মাথায় এল আলদার কোসের বোনের বিয়ে দেবার ঐ সুলতানের সঙ্গে। আর দেরী না করে মেয়েটিকে বিয়ের দামী পোশাকে সাজিয়ে, গান গাইতে গাইতে নিয়ে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সুলতানের কাছে।

'প্রিয়তম,' পথে যেতে যেতে কনেবউ সুলতানকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গের ঐ থলিগুলোয় কি আছে ?'

'তোমার জন্য যৌতুক হিসাবে খানের দেওয়া মোহর আছে এগুলিতে।'

পথে রাত কাটাবার জন্য থামল তারা। তাঁবু খাটান হল নবদম্পতির জন্য। সুলতান পেটভরে খেয়েদেয়ে কষে ঘুম লাগাল। ওদিকে কনেবউ চটপট পোশাক-আশাক ছেড়ে পুরুষের পোশাক পরে হঠাৎ... আলদার কোসেতে পরিণত হল।

সুলতানের ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে মোহরভরা থলিগুলো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভোরবেলায় এসে হাজির হল খানের আস্তানায় — ঘোড়া থেকে নেমেই গেল খানের কাছে:

'হুজুর, মাফ করুন ! আপনার মোহর যে ফসল দেয় নি তাতে তো আমার কোন দোষ

নেই: অনাবৃষ্টিতে সর্বনাশ হল। এতে যদিও আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি কিন্তু আমি তো আপনার কাছে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হতাম? প্রাণের চেয়েও সম্মানের মূল্য বেশী। মোহর আসলে কি বলুন দেখি? পাথর। কিন্তু গরীবের পক্ষে সে পাথর যোগাড় করা সহজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র সহায়তায় আমি এখন আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারছি আপনার মোহর। এখন বিবেক আমার, পরিষ্কার। কিন্তু হুজুর, দেখছি যে দেশে সত্য বলতে কিছু নেই সেখানে একজন সাধারণ মানুষকে ছোট করা, অপমান করা কত সহজ! আমার অনুপস্থিতিতে আপনার লোকেরা হানা দিয়েছে আমার বাড়ীতে। আমার অরক্ষিতা বোনটিকে নিয়ে এসে জোর করে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরদেশে। আর আমি তার একমাত্র ভাই, তার ভাগ্যে কি ঘটল কিছুই জানলাম না। কি অত্যাচার! কি লজ্জা।' বলে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল আলদার।

বিব্রত খান তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল:

'অমন করে কাঁদিস না, আলদার কোসে! তোর বোনকে ভাল যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়েছি সুলতানের সঙ্গে। তোর মতে সুলতানও কি তার উপযুক্ত পাত্র নয়? অনর্থকই দুঃখ করছিস। আর মোহরগুলির কথাই যদি বলিস তো যত মোহর তুই এনেছিস সেসব তুই-ই নে বোনের জন্য কলিম হিসাবে।'

খান এ কথা বলামাত্রই সুলতানের দূত ঘোড়ায় ছুটে এসে জানাল যে কনেবধূ অদৃশ্য হয়েছে আর তার সঙ্গেই উধাও হয়েছে সুলতানের দ্রুতগতি ঘোড়া আর মোহরের থলিগুলি।

'হায়, হায় হুজুর!' খানকে চিন্তা করার অবকাশ না দিয়েই মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল আলদার, 'হুজুর, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে! সুলতান নিজেই আমার বোনকে মেরে ফেলে এখন দূত পাঠিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর পাপ ঢাকা দেবার জন্য। এর বিচার করুন, হুজুর!'

একেবারে দিশাহারা ভ্রান্ত হয়ে পড়ল আলাশাখান। শেষে নিজের জায়গা থেকে উঠে খান সংজ্ঞাহীন আলদারকে তুলে বলল:

'শোন্ আলদার কোসে, আমি খান হিসাবে বলছি, যদি তিনদিনের মধ্যে তোর বোনের কোন খোঁজ না পাওয়া যায় তো আমি সুলতানকে এমন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করব যা কেউ কখনও পায় নি। আর আপাতত তুই আমার এখানেই থাক্।'

তিনদিন কেন, তিনমাস বাদেও তার বোনের খোঁজ মিলল না, তার জন্য ক্ষতিপূরণ পেল আলদার কোসে আর অপ্রত্যাশিতভাবে খান তাকে নিজের পারিষদ করে নিল।

কিছুদিন বাদে শীতকালে খানের মনে হল তার দেওয়া আদেশের কথা। একটা গোটা সৈন্যদল স্তেপময় ঘুরে ঘুরে মোহর আদায় করতে গেল।

কিন্তু তাদের পেঁছবার আগেই প্রতিটি আস্তানা ঘুরে আসতে পারল আলদার কোসে।

অবাক কাণ্ড ঘটল! খানের কর আদায় হল পুরোপুরি! কাউকেই খানের ক্রীতদাস হতে হল না কারণ দরিদ্রতম লোকটিও ঠিক সময়ে যোগাড় করে রেখেছে একটি মোহর খানকে দেবার জন্য।

খান খুশী, গরীব লোকেরাও খুশী। আর খুশী আলদারও।

কেমন করে আলদার কোসে আলাশাখানকে হারিয়ে দিল

একদিন আলাশাখান আলদার কোসেকে কাছে ডেকে বলল, 'বড় একঘেঁয়ে লাগছে আমার, বুঝলি রে আলদার?'

'বুঝলাম, মহামহিম খান। যখন খানের মনে খুশী তখন তাঁর অধীনস্থদের চোখে জল গড়ায় আর যখন তিনি অখুশী তখন গড়ায় রক্ত। কি করে আপনার মনে খুশী আনা যায়? আমি আপনাকে কবিজ বাজিয়ে শোনাব, গান গাইব নাকি কোন মজার গল্প বলব?'

'না না,' অধৈর্য হয়ে হাত ঝাঁকাল খান, 'তোমাদের ঐ গল্প, ভাঁড়ামিতে ঘেন্না ধরে গেছে। তার থেকে আয় একটা খেলা আরম্ভ করি, নিজে ভেবে বার করেছি এ খেলাটা।'

'কি খেলা সেটা, হুজুর?' অমঙ্গলআশংকায় বলে আলদার।

'খেলাটা হল এমনি। আমরা দু'জন মুখোমুখী বসব, মাঝখানে রাখব আমার প্রিয় বিড়ালটিকে, তার লেজের ওপর রাখা হবে একটি জ্বলন্ত বাতি, আমরা দু'জনেই বিড়ালটিকে ডাকতে থাকব নিজের দিকে, বিড়ালটি যার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই জিতবে আর যার দিকে বাতিটা পড়ে যাবে সে হারবে। প্রথমে আমি বাজী রাখছি একশ' মোহর।'

'ব্যাপার ভাল নয়,' ভাবল আলদার, 'মনিবের ডাকেই নিশ্চয় সাড়া দেবে বিড়াল... এ যেন বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দেওয়া!'

কিন্তু প্রতিবাদ করার তো উপায় নেই!

'চমৎকার খেলা!' খুশী খুশীভাব দেখিয়ে বলল আলদার, 'কেবল একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না হুজুর, আমার সঙ্গে খেলে আপনার লাভ কি? আমার তো একটা ঘষা পয়সাও নেই।'

'তোর আলখাল্লাটা বাজী রাখ!' বলল খান।

খানের তাঁবুর মাঝখানে গালিচার ওপর বিড়ালটিকে বসাল আলদার, তার ফোলান লেজের ওপর রাখল একটা জ্বলন্ত বাতি তারপর খানের উল্টোদিকে বসল উবু হয়ে — আরম্ভ হল খেলা।

'তু-তু-তু !' ডাকতে থাকে খান।

'তু-তু-তু !' ডাকতে থাকে আলদার।

বিড়ালটা মাথা ঘুরিয়ে, কান নাড়িয়ে অলসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল খানের কোলে। বাতিটা পড়ে গেল আলদারের দিকে।

'আমার জিত হল !' হাততালি দিয়ে বলল খান।

তারপর আবার, আবার, আবার বিড়ালটা খানের দিকেই গেল। আলখাল্লার পরে আলদার একে একে হারাল মাথার টুপিটা, কোমরবন্ধ, জুতোজোড়া... গায়ে রইল কেবল একটি জামা। খান কিন্তু থামে না কিছুতেই।

'কি হবে এবার ? বোঝা যাচ্ছে খান আমাকে শেষ করতে চান !' জামাটা খুলতে খুলতে ভাবে আলদার।

'পাঁচশো মোহর বাজী !' উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে খান। 'খেলা শেষ হয় নি এখনও ! যখন আর কিছুই নেই তোর, তখন নিজের মাথাটাই বাজী রাখ !'

'ঠিক আছে !' ধীরস্থিরভাবে বলল আলদার, 'মাথা বাজী রাখছি ! আগে থেকেই জানি মাথাটা খোয়ালাম। তাই আমার একটা অনুরোধ রাখুন, খান, শেষবারের মত একবার স্তেপের দিকে দেখে আসতে দিন।'

'আচ্ছা !' বলল খান, 'যা দেখে আয়। দেখিস দেরী করিস না যেন !'

আলদার কোসে বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এক মিনিট বাদেই ফিরে এল সে।

'আমি প্রস্তুত !' মুখে হাসি নিয়ে বলল সে, 'খেলা যাক !'

আবার বিড়ালটিকে বসিয়ে বাতি জ্বালিয়ে তার লেজের ওপর রাখা হল, আগেভাগেই খান আদর করে ডাকল বিড়ালকে:

'আঃ তু-তু-তু !'

কিন্তু এমন এক ঘটনা ঘটল যা খান স্বপ্নেও ভাবে নি। চোখে আগুন ঝরিয়ে, লোম ফুলিয়ে বিড়াল আলদারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর বাতিটা গিয়ে পড়ল খানের দিকে।

'আমি জিতলাম !' ঠাণ্ডাস্বরে বলল আলদার।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল খান।

'এক হাজার বাজী ! তিন হাজার ! পাঁচ হাজার !' রাগে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে চীৎকার করতে লাগল সে। মুখ রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে, টুপিটা মাথা থেকে খুলে মাটিতে পড়ে গেছে। 'চল্লিশ হাজার বাজী !'

কিন্তু এবার প্রতিবারই বিড়াল আলদারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন আলদার তাকে জাদু করেছে।

শেষে আলদার বলল:

'আজ খেলা বন্ধ করলে হয় না কি, হুজুর ? দেখছি আপনি ভাল বোধ করছেন না আর

আপনার প্রিয় বিড়ালও একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাল আবার খেলা আরম্ভ করব, আপনি যদি না থামেন তো শেষে আপনার মাথাও বাজী রাখতে হতে পারে।'

ঘেমে নেয়ে কোনরকমে খান উচ্চারণ করল:

'আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে রে! তোর সঙ্গে খেলা আরম্ভ করে নিজের সর্বনাশই করেছি রে শয়তান! তোরই জিত হল, আলদার কোসে! যা জিতেছিস, সবকিছু নে, কেবল বল দেখি কোন জাদুবলে আমায় হারালি তুই?'

'জাদু দিয়ে না, হুজুর বুদ্ধিতে হারিয়েছি আমি আপনাকে। স্তেপ শেষ বারের মত দেখতে বেরিয়ে ঘাসের মধ্যে একটা ছোট্ট জীবকে ধরি আমি যা বিড়ালের কাছে খানের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়। খেলার সময় বিড়ালকে আমি সেটি দেখাই মুঠো ফাঁক করে — এই হল আমার জাদু, হুজুর।'

হাতের মুঠো খুলল আলদার: দেখা গেল তার হাতে বসে ভয়ে কাঁপছে ছোট্ট একটা ইঁদুরছানা।

'ইঁদুর! বাবা রে!' ভয়ে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে খান সরে গেল এক পাশে, ইঁদুরে প্রচণ্ড ভয় তার।

সে চীৎকার শুনে ইঁদুরটা গালিচার ওপর পড়ে গেল। বিড়ালটা বাতিদানগুলি উল্টিয়ে ফেলে ছুটে গেল ইঁদুরটাকে তাড়া করার জন্য।

এই ঠিক উপযুক্ত সময় ভালয় ভালয় পালানর। আলদার চটপট নিজের পোশাকআশাক উঠিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে।

কেমন করে আলদার কোসে মৃত্যুর হাত এড়াল

আলদারকে ধরে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে আদেশ দিল খান।

'গোঁয়ার মূর্খকে চাবুক দিয়ে বশ মানাতে হয়, আর গোঁয়ার বুদ্ধিমানের জন্য লাগে তরবারি! অনেক সহ্য করেছি ওর বদমাসি! দেখা যাবে এবার কি করে ঠাট্টা তামাসা দিয়ে আমার জল্লাদের হাত এড়ায় সে!..' বলে আবার আদেশ দিল, 'মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য লোক জমায়েত কর!'

চারদিকে ঘোষণা করা হল এ খবর, শীঘ্রই খানের তাঁবুর কাছে এসে হাজির হল দলে দলে লোক, কেউ খুশীমনে, কেউ দুঃখিতমনে, কেমন করে আলদার কোসের মাথা কাটা পড়ে দেখতে।

ওদিকে বেচারী আলদার একটা ফাঁকা তাঁবুতে বন্দী হয়ে বসে অপেক্ষা করে আছে তার নিয়তির।

চারদিক থেকে তাঁবুকে ঘিরে প্রহরায় নিযুক্ত বারোজন সশস্ত্র প্রহরী। তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে গল্প না করতে, পরস্পরের দিকে না তাকাতে, নড়াচড়া না করতে, তাঁবুর দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে আর মৃত্যুর আগে বন্দী কিছু বলে নাকি তা শুনতে।

কিন্তু আলদার কোসে তাঁবুর মাঝে মাটিতে চুপ করে বসে আছে। ভাবছে নীরবে।

'যদি আমি পাখী হতাম,' ভাবে সে, 'তবে ধোঁয়া বেরোবার ঐ গর্তটা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে পালিয়ে যেতাম, যদি ছুঁচো হতাম তো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে গিয়ে বেরোতাম ফাঁকা জায়গায়। যদি আমি সিংহ হতাম তো ঐ প্রহরীগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম ওদের। কিন্তু কি করে এমন অবস্থায় মৃত্যুর হাত এড়ান যায়?'

হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে একটা পুরান তামার বোতাম পেল। বহুদিন আগে সেটি সে কুড়িয়ে পায় বাজারে: হয়ত কখন কোন কাজে লাগবে ভেবে কুড়িয়ে নেয় সেটি। সেই সময় আজ এসেছে।

'এই যে আমার রক্ষাকবচ!' আনন্দিত হল আলদার কোসে, কালো হয়ে যাওয়া বোতামটা বালিতে ঘষতে লাগল মন দিয়ে।

রাত হল। ধোঁয়া বেরোবার গর্ত দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। সেই আলোয় বোতামটা ধরল আলদার, ঝকঝক করে উঠল সেটি, যেন সোনা। তখন প্রহরীরা শুনতে পেল বন্দীর গলা:

'কি বোকা আমাদের খান!' যেন চিন্তা করছে সে নিজের মনে এমনিভাবে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'এত মানুষকে মেরে ফেলে ভাবছে নিজে অমর হবে। কিন্তু সবাই জানে: আজ অথবা কাল মরণ এসে ধরবেই সবাইকে। তার মানে, খানেরও একদিন মৃত্যুদণ্ড হবে। তাহলে আমার চেয়ে বেশী সুখী তিনি কিসে? তাহলে আমার মত এমন সাধারণ লোকের আর ভয় কি মরতে!'

খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল:

'নাঃ মরণকে ভয় নেই, কেবল এক দুঃখ আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার যত ঐশ্বর্য আমার সঙ্গে কবরে যাবে...'

নিঃশ্বাসবন্ধ করে শুনতে লাগল প্রহরীরা।

'ঐশ্বর্য? কোন ঐশ্বর্য?'

'হায় আল্লাহ্!' করুণস্বরে বলল আলদার, 'আমার হাতে ধরা ইরানের বাদশাহের এই আংটিটা পেতে তো তুমিই আমাকে সাহায্য করেছিল। এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম এটি পোশাকের মধ্যে সেলাই করে। বাপ-মা, ভাই-বন্ধু-শত্রু কেউ জানত না এটির কথা। কিন্তু এ যে অমূল্য আংটি। ইরানে পৌঁছে বাদশাহ্‌কে এ আংটি দেখালেই হল, অমনি পেয়ে যাব বাদশাহের অর্থভাণ্ডারের অর্ধেক, সুন্দরী শাহজাদী হবে আমার স্ত্রী...'

প্রহরী যেন পাথর হয়ে গেছে, গলার মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রতিটি প্রহরীই ভাবে মনে মনে, 'সত্যি সত্যিই কি ওর বাদশাহের আংটি আছে নাকি? অমন একটা জিনিস মাঠে মারা যাবে। হয়ত মেরে ফেলার আগে ওর দেহ তল্লাস করা হবে তখন খানের হাতে পড়বে আংটিটা? খানের কি নিজেরই কম ধনসম্পত্তি নাকি? আমার হাতে এলে হয় ওটা! ওটাকে আমি লুকিয়ে রাখতাম না পোশাকের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে ইরানের পথ ধরতাম!..'

আবার আলদারের গলা শোনা গেল:

'জানি আমি কি করব এটাকে নিয়ে। আল্লাহ্ পথ বাতলে দিয়েছেন। আংটিটাকে ছুঁড়ে দেব ঐ গর্ত দিয়ে স্তেপের মধ্যে। কেউ যেন ওটাকে খুঁজে না পায়, খুনী খানও না। কোনো গরীব লোক হয়ত সেটাকে খুঁজে পাবে!'

এ কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই তাঁবুর ওপর বিদ্যুতের মত একটা ঝলক দেখা গেল আর কি একটা যেন বাঁকা হয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল গাছগাছড়ার ঝোপের মধ্যে।

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন প্রহরী খানের আদেশ ভুলে গিয়ে ছুটে গেল ঝোপের দিকে।

'আমার!' হিসহিস করে বলল একজন।

'আমার!' হিসহিস করে বলল অপরজনও।

তক্ষুণি বাকী দশজনও জায়গা ছেড়ে সেদিকে দৌড় দিল, একজায়গায় জড় হয়ে তারা কাড়াকাড়ি করতে লাগল চকচকে জিনিসটা পাবার জন্য। শেষে সবচেয়ে যে শক্তিশালী তার হাতেই গেল সেটা।

‘গাধার দল!’ অস্ফুটে গালাগালি দিল সে, ‘দাঁড়াও! আলদার কোসে ঠকিয়েছে আমাদের: আংটি নয়, এ হল একটা তামার বোতাম! যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড় যাতে এই ফাঁকে বন্দী পালাতে না পারে।’

যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল প্রহরীরা আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছুই ঘটে নি।

সকালবেলায় খানের ছাউনির কাছে লোকে লোকারণ্য, ছুঁচটি পড়বার জায়গা নেই।

ভৃত্যেরা বিছিয়ে দিল সাদা গালিচা। তার ওপর বেশ জাঁক দেখিয়ে বসল খান আর তার উজীররা। খানের ইঙ্গিতে জল্লাদরা এগিয়ে গেল বন্দীর তাঁবুর দিকে, তাঁবুর চারদিক ঘিরে সশস্ত্র প্রহরীরা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে।

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভীড়ের লোকেরা। জল্লাদরা তাঁবুর পর্দাটা তুলেই পিছিয়ে এল।

‘কি হল?’ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল খান। ‘নিয়ে এস অপরাধীকে!’

‘হুজুর!’ বলল জল্লাদরা, ‘অপরাধী নেই তাঁবুতে! কেবল তার ছেঁড়া আলখাল্লাটা পড়ে আছে!’

খান হাত ঝাঁকানি দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গালিচার ওপর।

কেমন করে আলদার কোসে অনুধাবনকারীদের ঠকাল

খান বলল, 'আমার পাল থেকে পঞ্চাশটি দ্রুতগতি ঘোড়া নাও আর অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের নাও সঙ্গে আলদার কোসেকে খোঁজার জন্য। জীবিত অথবা মৃত যেমনভাবেই হোক তাকে ধরে আনা চাই।..'

প্রধান উজীর নতজানু হয়ে সে আদেশ গ্রহণ করল।

সাতমাস, তারপর আরও সাতমাস ধরে উজীর দলবল নিয়ে স্তেপে স্তেপে ঘুরে বেড়াল, শেষে আলদারের চিহ্ন খুঁজে পেল।

আলদার ওদিকে খানের সৈন্যদলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কখনও দৌড়ে, কখনও গুঁড়ি মেরে, গর্ত, ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে। মুখচোখ কালো হয়ে গেছে, দেহ রোগা হয়ে গেছে, জামাকাপড় জুতো ছিঁড়েকুটে একশা। এইরকম চেহারা নিয়েই সে এসে হাজির হল নলখাগড়া গজিয়ে যাওয়া হ্রদের কাছে পুরান, প্রায় পরিত্যক্ত সরাইখানার কাছে।

সেই সরাইখানায় খুব কচিৎ-কখনো আসে কোনো পথিক তাই সরাইখানার মালিক মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনে ছুটে বেরিয়ে এল ফটকের বাইরে। 'আল্লাহ্ কোন খদ্দেরকে পাঠিয়েছেন নাকি?' কিন্তু ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা অপরিচিত লোকটিকে দেখে হতাশ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, রেগেমেগে বলল, 'যদি তুই ছুটে এসে থাকিস ভিক্ষা পাবার আশায় বা সরাইখানায় রাত কাটাবার আশায় তো বলি তোকে, চাঁদ, কেটে পড় এখান থেকে।'

তিরস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নাড়াল আলদার:

'না না, মহামান্য বাই, তোমার কাছে কিছুই চাই না আমি। নিজের জন্য নয়, তোমাকে বাঁচাবার জন্যই ছুটে এসেছি, নিজের শরীরের কথা ভাবি নি। খুলে বল দেখি কি দোষ করেছ খানের কাছে, এত রেগে গেছেন কেন খান তোমার ওপর?'

বিস্ময়ে হতবাক লোকটি।

'খান রেগে গেছেন আমার ওপর? কি বাজে বকছিস। জন্মে কখনও চোখেই দেখি নি খানকে। আমার কাছে তাঁর কি দরকার?'

'সময় থাকলে সব কথাই গুছিয়ে বলতাম, বন্ধু,' উৎকণ্ঠিতস্বরে বলে আলদার, তারপর সরাইখানার মালিকের কানে মুখ ঠেকিয়ে বলে: 'বিশ্বস্ত লোকদের কাছে যে কথা শুনেছি সে কথাই বলব কেবল: খান নিজের জল্লাদদের একটি দলকে পাঠিয়েছেন তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে দণ্ড দেবার জন্য। বিপদ কাছে এসে পড়েছে! স্তেপের দিকে তাকিয়ে দেখ দিকি!..'

আলদার যেদিকে দেখাল সেদিকে তাকিয়ে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সরাইখানার মালিক: একদল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে সরাইখানার দিকে, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তাদের বর্মগুলো জ্বলছে। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে তাদের ভয়ঙ্কর গলার স্বর, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, চিঁহি ডাক।

সরাইখানার মালিকের ঝোলা ঝোলা গালদুটি ছানার মত সাদা হয়ে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে আলদারের ছেঁড়া পোশাক আঁকড়ে ধরল।

'উপকারী বন্ধু আমার, নিরপরাধীকে এমনভাবে ফেলে যাস না বিপদে! দয়া কর, যদি এই বিপদের খবর জানলিই আগে থাকে তো এর হাত থেকে বাঁচার পথও বলে দে। যা চাস দেব, কেবল প্রাণটা আমার বাঁচা!'

আলদার ভ্রূ কুঁচকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন কোন কিছু চিন্তা করছে নিবিষ্ট মনে।

'বল, বল্, চুপ করে থাকিস না!' তাগাদা দিতে লাগল লোকটি।

'এসেছে একটা মতলব!' কপালে একটা টোকা দিয়ে বলল আলদার, 'আমাকে তোমার আলখাল্লাটা দাও — নগ্নতা ঢাকার জন্য, আর তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকাও ঐ শরবনের মধ্যে। দু' একদিন থাক বসে ওখানে... যা হয় হবে — ঝুঁকিই নিতে হবে দেখছি তোমার জন্য, তোমার বদলে আমিই অভ্যর্থনা জানাব খানের অনুচরদের। তাদের বলব, 'একটু দেরী করে ফেলেছ, বাছারা, মরেছে সে যাকে তোমরা খুঁজছ... তিনদিন হল তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। এমন ঠেসে খেয়েছিল যে পেটের ব্যামো হল, আর তাতেই চোখ বুজল।' মরা লোককে আর কি করবে ওরা? খালি হাতে ফিরে যেতে হবে... কথায় বলে 'অতি চালাকের গলায় দড়ি...'

'আল্লাহ্ তোর মঙ্গল করুন, আল্লাহ্ তোর মঙ্গল করুন!' বলতে বলতে সরাইখানার মালিক অদৃশ্য হয়ে গেল শরবনের মধ্যে।

আলদার সে দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে বলল, 'শুয়োরের মত খানিক নোংরা ঘাঁট, চাঁদ, মশাকে খাওয়াও খানিক, তোর মত লোকেদের জন্য মায়াদয়া হয় না মোটেই!..'

তারপর তাড়াতাড়ি সরাইখানার মালিকের ছেড়ে যাওয়া আলখাল্লাটা পরে নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথাটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে গালে হাত দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য এগোল।

'আসতে আজ্ঞা হোক, মহামান্য অতিথিরা, আসুন আমার সরাইখানায়!'

দারুণ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ঠিক তার নাকের সামনে এসে রাশ টানল উজীর।

'আরে, এই গোবরভরা মাথাটায় ওটা কি জড়িয়েছিস? ভেড়ার পালের কাছ থেকে নেকড়ে তাড়ানর কাজই তোকে বেশী মানায় সরাইখানা চালানর চেয়ে। যাক তুই যখন নিজের পরিচয় দিয়েছিস সরাইখানার মালিক বলে, বল দেখি, যে লোককে খুঁজছি আমরা সে তোর এখানে

লুকিয়ে আছে নাকি? অত্যন্ত বিপজ্জনক অপরাধী, খানের ভয়ঙ্কর শত্রু। মাকুন্দ, রোগা চেহারা... কিংবা হয়ত এখান দিয়ে যেতে দেখেছিস তাকে?'

'ওঃ খুনী, অত্যাচারীর দল! মানুষকে কেবল কষ্টই দাও তোমরা... আগুনে পুড়িয়ে মারতে হয় তোমাদের।'

এমন কথা শুনে তো চোখ লাল হয়ে উঠল রাগে উজীরের।

'এই আহাম্মক, চুপ কর। খানের কর্মচারীদের অপমান করার সাহস হয় তোর? দেখতে পাচ্ছিস না তোর সামনে কে দাঁড়িয়ে? নাকি তোরও ষড়্ আছে আলদার কোসের সঙ্গে?'

'দোষ হয়েছে, হুজুর, মাফ করবেন...' কাঁদো কাঁদোসুরে বলল আলদার, 'যন্ত্রণায় মাথার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে... আলদার কোসে আবার কে? জানি না তো এ নামের কাউকে... দাঁতগুলো! ওঃ দাঁতগুলো শেষ করে দিল আমাকে। যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গেলাম, দেখছি কাল সকাল পর্যন্তও বাঁচব না...'

'নাকেকান্না না কেঁদে, চটপট উত্তর না দিলে তোকে রাত পর্যন্তও বাঁচতে হবে না!' তরোয়াল উঁচিয়ে বলল উজীর, 'শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি: তুই কোন মাকুন্দ লোককে দেখেছিস কিনা এখানে?'

'দেখেছি, হুজুর... রাগারাগি করার কি আছে? বেশী রাগ করলে পেটের নাড়ীভুঁড়ি শুকিয়ে যাবে যে... আর মাকুন্দ... হ্যাঁ, এসেছিল। রাত কাটাতে দিই নি ওকে এখানে। সে নেই এখানে তালাস করে দেখুন।'

'কোথায় সে? কোথায়?' ঘোড়া দিয়ে আলদারের বুকে ধাক্কা দিল উজীর। 'বল শীগগির।'

'ঐ শরবনে... জলাভূমিতে লুকিয়েছে গর্দভ! (ওঃ দাঁতগুলো!) ও জলাভূমিতে যাওয়া সম্ভব নয়... এখন এই অন্ধকারে তাকে খুঁজতে যাবেন না যেন। আল্লাহ্‌র দিব্যি! ডুবে মরবেন! নিজেও ডুববেন ঘোড়াও ডুবে যাবে!.. তার চেয়ে আমার এখানে রাত কাটান — বেশী চাইব না। মাথাপিছু এক পয়সা করে... (রক্তপিপাসুর দল!) থাকুন ভোর হওয়া পর্যন্ত... লোকেরা বিশ্রাম নেবে, ঘোড়ারও বিশ্রাম দরকার... ভোর হবার আগে আমি জাগিয়ে দেব আপনাদের... সকাল বেলায় লোকটাকে ধরতে পারবেন খুব সহজেই... যাবে কোথায়? পাখীর ছানাকে ধরার মত করে ধরবেন খপ্ করে,' আবার গাল চেপে ধরল আলদার।

'ঘোড়া থেকে নাম!' সৈন্যদের আদেশ দিল উজীর, 'এই গর্দভটা ঠিক কথাই বলেছে। কখনও কখনও মূর্খও কাজের কথা বলে ফেলে। এখানে বিশ্রাম নেব আমরা। আর অতিচালাক আলদার কোসে রাতটুকু বসে ভিজুক জলায়, সকালবেলায় চাবুক মেরে শুকিয়ে দেব। শোবার বন্দোবস্ত কর গিয়ে সবাই!' বলে "সরাইখানার মালিকের" দিকে একটা পয়সার থলি ছুঁড়ে দিল উজীর।

আলদার লুফে নিল থলিটা তারপর ছুটে গেল ভিতরে অতিথিদের জন্য বিছানা পাততে।

'নিশ্চিন্তে ঘুমান অতিথিরা! শুভ রাত্রি!'

সৈন্যরা ঘোড়াগুলোর লাগাম খুলল, আস্তাবলে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে তাদের খেতে দিয়ে

গিয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়, সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে উঠল পঞ্চাশটা নাক একসঙ্গে। উজীর কিন্তু তার জন্য বিশেষভাবে পাতা বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কঠোরস্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'দেখিস, ভোর হবার আগে জাগিয়ে দিস কিন্তু! যদি আলদার কোসে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায় তো তোর মাথা কেটে ফেলব!..'

বলে সেও নাক ডাকাতে আরম্ভ করল।

যতক্ষণে অতিথিরা শোবার যোগাড়যন্ত্র করছিল আলদার এক কোণায় উবু হয়ে বসে আঃ উঃ করছে আর বাপান্ত করছে দাঁতের না খানের যোদ্ধাদের কে জানে। ব্যাস এবার সবাই ঘুমিয়েছে।

'প্রথম রাতের ঘুম গভীর হয়,' ভাবল আলদার কোসে, 'এবার কাজ আরম্ভ করতে হয়...'

সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নিল কি করতে হবে। প্রথমেই কোন আওয়াজ না করে সরাইখানার বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করল একটা কাঁচি যা দিয়ে ভেড়ার লোম ছাঁটা হয়। পরখ করে দেখল দারুণ ধার তাতে। কাঁচিটা হাতে নিয়ে আলদার গুঁড়ি মেরে মেরে এক সৈন্যর থেকে আর এক সৈন্যের দিকে এগোতে লাগল। যার কাছে সে এগিয়ে যায় তার দাড়ি উধাও হয়ে যায়। প্রথমেই কাটা পড়ল উজীরের ফোলানফাঁপান দাড়ির গোছা, তার পরে সেই একই অবস্থা হল বাকী সবারও... সব শত্রুর দাড়ি পরিষ্কার করে ছেঁটে দিল। কি সব দাড়ি! লম্বা-খাট, খরখরে-মসৃণ, ঘন-পাতলা, সাদা কাল, লালচে!.. এমন নিপুণ হাতে কাজ সারা হল যে যোদ্ধারা কেউ একটু নড়ল না পর্যন্ত।

দাড়ির পালা শেষ হলে আলদার কোসে পড়ল জিন লাগাম, ঘোড়ার পিঠের পটি যতরকম ঘোড়ার সাজ নিয়ে — সব কেটে ফেলল কুচিকুচি করে। কেবল সবচেয়ে দামী যে ঘোড়ার সাজটা ছিল সেটা ছুঁল না। তারপর সবচেয়ে ভাল ঘোড়ার পিঠে উঠে রাতশেষের আধঅন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙল উজীরের, চারপাশে তাকিয়ে দেখে: সকাল হচ্ছে।

'এই মালিক!' উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাক দেয়, 'এই তুই আমাদের জাগিয়ে দিস নি কেন ঠিক সময়ে? আরে এই কর্তা? কোথায় গেলি রে তুই নচ্ছার!'

কেউ সাড়া দিল না।

কাঁপুনি ধরল উজীরের।

'ঠকাল নাকি আমাদের বদমাসটা?' হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল। 'যোদ্ধাদের তৈরী করতে হবে এখুনি!'

কিন্তু যোদ্ধারা এমন গভীর ঘুমে অচেতন যে লাঠি দিয়ে মারলেও ঘুম ভাঙে না। শেষে একজনের ঘুম ভাঙাতে পারল উজীর।

যোদ্ধাটি লাফিয়ে উঠে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল উজীরের দিকে।

উজীরও চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল তার থেকে, 'এ কি দাড়ি নেই কেন? আরে এ যে স্বয়ং আলদার কোসে! যোদ্ধার পোশাক পরে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে ব্যাটা...'

ওদিকে যোদ্ধাটাও বারবার চোখ রগড়ায় আবার তাকিয়ে থাকে উজীরের দিকে।

'স্বপ্ন দেখছি নাকি ? নাঃ এই তো আলদার কোসে। শয়তান, উজীরের পোশাক পরেছে...'

দু'জন দু'জনের গলা টিপে ধরল তারা।

'এস সবাই ! আলদার কোসে লুকিয়েছে আমাদের মাঝে ! ধরেছি আলদারকে !' দু'জনে মিলে চীৎকার করতে লাগল তারা।

এমন চীৎকার শুনে মড়াও কবর থেকে উঠে আসবে। সব যোদ্ধারা ছুটে এল সেদিকে।

'কে চেঁচাল ? কোথায় আলদার কোসে ?'

যেই তারা পরস্পরের দিকে তাকাল অমনি আরম্ভ হল মারপিট: প্রত্যেকে তো নিজের সামনে দেখছে একটা দাড়িহীন মুখ।

'এই যে, আলদার কোসে !'

'তুই আলদার কোসে !'

'ধর ! ধর ! মার !'

'মারবি তুই ! তবে আয় দেখি !'

সবাই এক জায়গায় জড় হয়ে মারপিট, জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে, সবাই চেঁচাচ্ছে আর অন্যকে মারছে। স্তেপের মধ্যে এমন গোলমাল আরম্ভ হল যেন যুদ্ধ চলছে, কতক্ষণ এমনিধারা চলত কে জানে কিন্তু এমন সময় পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এল।

সূর্যের আলোয় চেতনা পেল তারা, বুঝল যে এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে তারা যার চেয়ে খারাপ আর লজ্জাজনক কোন কিছু স্বয়ং শয়তানের মাথাতেও আসতে পারে না।

'খুঁজে বার কর মালিককে !'

সারা সরাইখানাটা চুঁড়ে ফেলেও কোথাও পাওয়া গেল না মালিককে।

'ঘোড়া গুণে দেখ !'

সব ঘোড়াই আছে কেবল উজীরেরটি ছাড়া।

মার খেয়ে আধমরা উজীর কেঁউ কেঁউ করে বলল:

'তাড়া কর ! সরাইখানার ঐ মালিকই আলদার কোসে ! ঐ নচ্ছার গুণ্ডাই এমনি অবস্থা করেছে আমাদের ! তাড়া কর।'

ঘোড়ার সাজ পরাতে গেল সৈন্যরা কিন্তু যেখানে ঘোড়ার সাজ ছিল সেখানে পড়ে আছে কেবল একগাদা কাটা চামড়ার টুকরো। কি করে তাড়া করবে ! মুখেচোখে কালসিটের দাগ নিয়ে সৈন্যরা লাগামহীন ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে গিয়ে পেঁছাল খানের কাছে। সবার শেষে হেঁটে হেঁটে এসে পেঁছাল দাড়িহীন উজীর। কেউ তাকে দিতে চাইল না নিজের ঘোড়াটা কারণ তাকে আর কারুর ভয় নেই এখন।

ওদিকে আলদার কোসে ততক্ষণে অনেক দূরে পেঁছে গিয়েছে... কোথায় সে চলেছে, কোথায় সে থামবে তা কেই বা বলতে পারে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
বাড়ি নম্বর ৩৩, সী—১৪
তাশখন্দ-৭০০০১১
সোভিয়েত ইউনিয়ন

'RADUGA' PUBLISHERS
HOUSE No. 33, C-14
TASHKENT-700011
SOVIET UNION